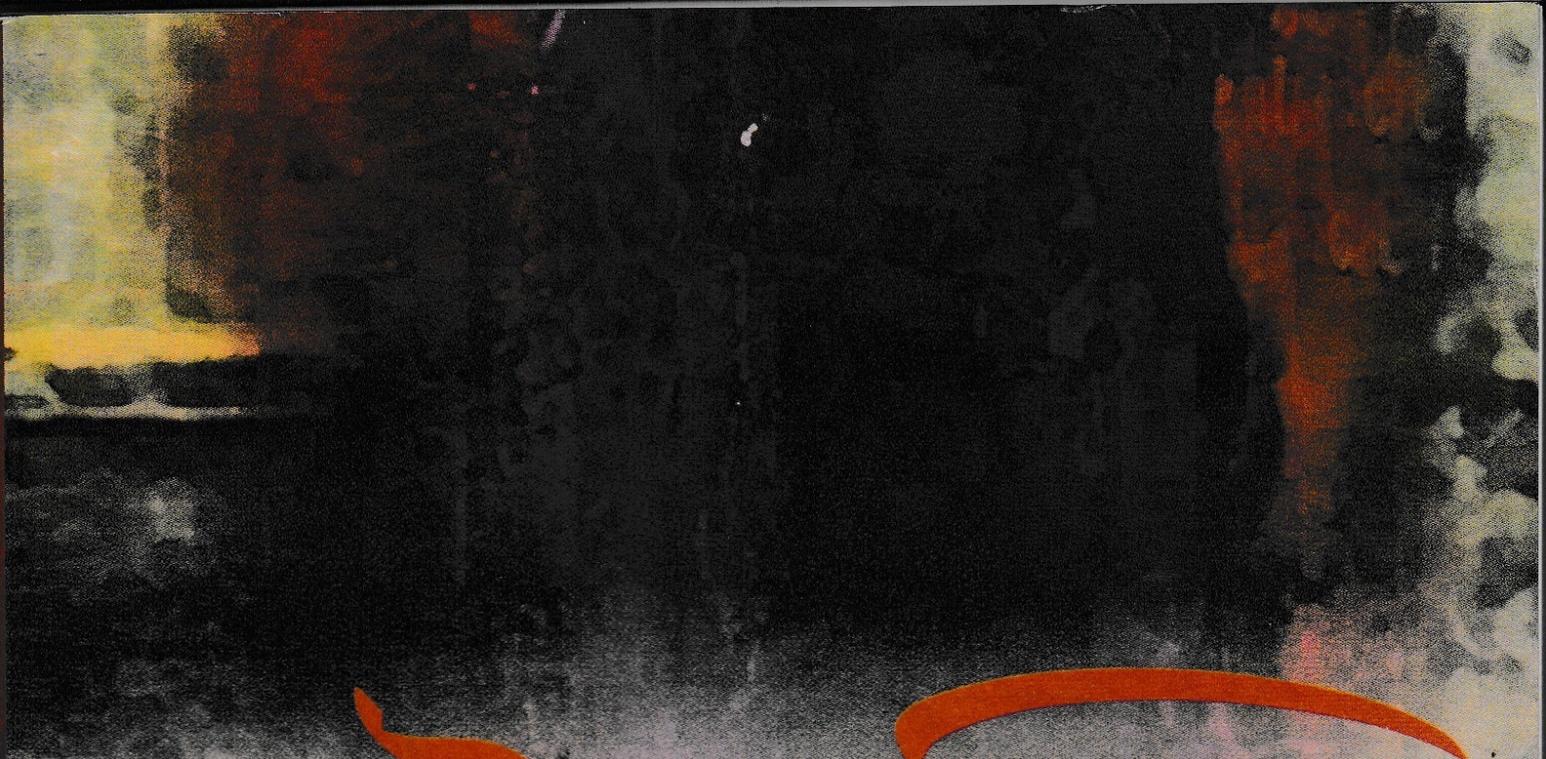


ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

ক্ষেত্র গুপ্ত

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

ক্ষেত্র গুপ্ত

বিশ্বসাহিত্য ভবন
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ • ২০১১

প্রকাশক • তোফাজ্জল হোসেন, বিশ্বসাহিত্য ভবন ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
অক্ষরবিন্যাস • প্রগতি কম্পিউটার্স, ৫৯/৩/৪ পুরানা পল্টন, ঢাকা
মুদ্রণ • প্রগতি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স ৫৯/৩/৪ ঢাকা-১০০০
প্রচ্ছদ • নাসিম আহমেদ
গ্রন্থস্বত্ব • প্রকাশক

দাম • ২৫০ টাকা মাত্র

ISBN - 984-8309-512-7

বিবেশক • সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য
মুক্তধারা, জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক, যুক্তরাস্ট্র

চিন্ময় মজুমদার
বন্ধুবরেষু

নিবেদন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান ড. সফিকুন্নবী সামাদী স্বীয় গুরু খ্যাতিমান গবেষক ড. ক্ষেত্র গুপ্তের দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তার উদ্যোগের সাথে সামান্য সম্পৃক্তি আমার ছিল। আমাদের সাথে যুক্ত হলেন বিশ্বসাহিত্য ভবনের স্বত্ত্বাধিকারী তোফাজ্জল হোসেন। তিনি কলকাতা গিয়ে স্যারের সাথে কথা বলে চুক্তিবদ্ধ হলেন। তারপর গ্রন্থ প্রকাশের কাজ শুরু হলো। মনে হলো স্যারের সাথে বিগত দুই দশকের যে পরিচয় ও প্রণয় তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আনন্দ পেলাম।

মাঝখানে নানা বিপত্তি এসে উপস্থিত হলো। ফলে প্রকাশনার কাজটি বিলম্বিত হয়ে গেল। ক্ষেত্র স্যার খানিকটা অধৈর্য হলেন। আমি তাঁর সাথে কথা বলে তাঁকে আশ্বস্থ করলাম।

ইতোমধ্যে ড. ক্ষেত্র গুপ্ত লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যু আমাকে অপরাধী করে দিল। মনে হলো প্রচেষ্টায় নিষ্ঠার অভাব ছিল। তাই পাপমোচনের জন্য এই দ্রুততর উদ্যোগ।

অবশেষে প্রকাশ হলো ড. সফিকুন্নবী সামাদী ও আমার গুরুদক্ষিণা।

রতন সিদ্দিকী
১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১১
ঢাকা

সূচিপত্র

১. পরীক্ষা নিজেকে নিয়ে : রাজমোহনস্ ওয়াইফ – এবং সিদ্ধি ৯
২. মন, মনের বিবর্তন এবং ইতিহাসের ভূমি ১৩
৩. দুর্গেশনন্দিনী : তৈরি হবার পালা শেষ ৩৬
৪. কপালকুণ্ডলা : চিত্তের গভীরে ভাগ্যের রহস্যে ৪৭
৫. মৃণালিনী : অনভিপ্রেত প্রাপ্তি ৬৮
৬. বিষবৃক্ষ : কে ভালবাসিতে চায়, কে বাঁচিতে চায় ৮৫
৭. চন্দ্রশেখর : ইতিহাসের পাত্রে সমাজ-সমস্যা ১০৬
৮. রজনী : বিপর্যয়– মানুষে এবং রচনায় ১২১
৯. কৃষ্ণকান্তের উইল : 'দুইটা ব্যাঘ্রী, মৃত গাভী' ১২৯
১০. মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত : একটি খসড়া ১৪৬
১১. আনন্দমঠ : 'সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদকরালে' ১৪৮
১২. দেবীচৌধুরাণী : অপুষ্ট তত্ত্ব-রাজনীতি-মানুষ ১৬৪
১৩. সীতারাম : তত্ত্ব নয়, জীবন প্রেম মৃত্যু ১৭৭
১৪. ইন্দিরা : ছুটি– লঘু হাস্যে ১৯৩
১৫. রাজসিংহ : ইতিহাস না হৃদয়? ১৯৯

১ পরীক্ষা নিজেকে নিয়ে :
রাজমোহন্‌স ওয়াইফ্‌ – এবং সিদ্ধি

এক

বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-৯৪) ইংরেজিতে লেখা 'রাজমোহন্‌স ওয়াইফ্‌'[১] আমাদের প্রত্যক্ষ আলোচনার বিষয় নয়। বঙ্কিমকে বোঝবার জন্য এদিকে তাকানো হচ্ছে, এবং বাংলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠাকালীন সমস্যাটি বোঝবার জন্যও বটে।

বঙ্কিম ছাত্রজীবনে বাংলায় কবিতা লিখতেন। মধুসূদন প্রভৃতির মতো ইংরেজি ভাষায় সাহিত্যচর্চা করেননি। তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধ সবই পরে লেখা। কেন তিনি প্রথম উপন্যাস ইংরেজিতে লিখলেন?– প্রথম প্রশ্ন। ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স নিয়ে তাঁর বাংলা উপন্যাসের আরম্ভ। কেন এই ইংরেজি বইটি সমকালীন জীবনভূমিতে স্থাপিত?– দ্বিতীয় প্রশ্ন। প্যারীচাঁদকে বাংলার প্রথম নভেলিস্ট বলে উল্লেখ করলেও কেন তিনি এই সামাজিক উপন্যাস লিখলেন যা জাতে একেবারে আলাদা?– তৃতীয় প্রশ্ন। এইসব প্রশ্নের সমাধান করার জন্য উপন্যাসটির বিষয় ও রচনারীতির পরিচয় নেওয়া যাক।

দুই

রাজমোহন উপন্যাসটি উনিশের শতকে স্থাপিত। সমকালীন সমাজ ও পরিবার জীবনের নানা চিত্র এখানে আছে।–

> গরিব গৃহস্থের ঘরবাড়ি – নারীর সজ্জা – নারীর অপমানিত জীবন। কলকাতায় শিক্ষিত ধনী যুবকের সাজ-পোশাক, অন্দরমহল। গ্রাম্য অশিক্ষিত ধনাঢ্যের বেশবাস, গৃহোপকরণের রুচিহীন প্রাচুর্য। আদালতী ব্যাপারের কিছু বিবরণ, জমিদার-পরিবারের উদ্ভবের ইতিহাস প্রসঙ্গে সামাজিক রীতিনীতির কিছু পরিচয়।

সামাজিক উপন্যাসে ঘটনানিরপেক্ষ এ জাতীয় বিবরণের বাহুল্য প্যারীচাঁদে-লালবিহারীর রচনায়, তার তুলনায় এখানে আয়োজন খুব সংক্ষিপ্ত। বরং লেখক একটি কামনাকেন্দ্রিক

---

১. ১৮৬৪ সালে কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইন্ডিয়ান ফীল্ড' নামক সাপ্তাহিক এই লেখাটি বেরোয়। উপন্যাসটি ২/১ বছর আগে লেখা হতে পারে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম তিন অধ্যায় ছাড়া বাকিটা খুঁজে পান। বঙ্কিমচন্দ্র লেখাটির প্রথম সাত অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন অনেক পরে। ব্রজেন্দ্রনাথ ঐ বঙ্গানুবাদের প্রথম তিন অধ্যায়ের ইংরেজী অনুবাদ করে 'রাজমোহনস্‌ ওয়াইফ্‌'– বইটিকে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ সংস্করণে প্রকাশ করেন। ইংরেজী বইয়ের প্রথম তিন অধ্যায়ের ভাষা কিন্তু বঙ্কিমের নয়।

কাহিনী বলতে চেয়েছেন। যা ঘটনার উত্তেজনায় এবং আবর্তনে আকৃষ্ট করে। উল্লিখিত সমাজ ও পরিবার-চিত্রগুলি এই কাহিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, কোথাও পৃথক বা স্বাধীন হয়ে ওঠেনি। এই বইয়ে যে সব চাঞ্চল্যকর প্রসঙ্গের সমাবেশ ঘটেছে তার হিসেব–

দলবদ্ধ ডাকাতির চেষ্টা। সেপাই-দারোয়ান নিয়ে মাধবের প্রতিরোধ। রাজমোহনের স্ত্রী হত্যার উদ্যোগ এবং মাতঙ্গিনীর গৃহত্যাগ। রাজমোহনের সঙ্গে ডাকাত-সর্দারের যুদ্ধ। মথুর ঘোষের কৌশলে মাতঙ্গিনীর বন্দীত্ব। মাধব-মাতঙ্গিনীর মুক্তি এবং মথুরের আত্মহত্যা। রাজমোহনের দ্বীপান্তর।

আগের বা পরের কোনো মধ্যম স্তরের সামাজিক উপন্যাসেও এরকম ঘটনার বাড়াবাড়ি দেখা যাবে না। অবশ্য এগুলো স্থূল, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার নয়। অনেকগুলিই মূল পাত্র-পাত্রীর হৃদয়-আবেগের প্রকাশ। মথুর ঘোষ উইল পাবার জন্য ডাকাতদলকে লাগিয়েছে। এই সূত্রে ঘটনা-ধারার মধ্যে রাজমোহনের প্রবেশ। কিন্তু এর সঙ্গে তীব্র ঈর্ষাও তাকে প্ররোচিত করেছে, কারণ স্ত্রী মাতঙ্গিনী গোপনে মাধবের প্রতি আসক্ত। মাধবকে খবর দিয়ে ডাকাতি ব্যর্থ করল মাতঙ্গিনী, কারণ মাধবকে সে ভালোবাসত। স্ত্রীর গুপ্ত প্রেমের এই তীব্রতা রাজমোহনকে ব্যর্থ কামনায় ও ঈর্ষার জ্বালায় পাগল করে তুলল, স্ত্রীকে সে হত্যা করতে গেল। পালিয়ে গিয়ে নায়িকা মথুরের আশ্রয়ে উঠল এবং তার লালসার ফলে আটক হলো। মাধবকে ধরে আনা হয়েছিল মথুরের সম্পত্তির লোভে। তাদের দুজনের মুক্তিতে মথুরের স্ত্রী তারার ভূমিকাও তার হৃদয়বৃত্তির ফল। মোটকথা কিছু কিছু ঘটনা আকস্মিকভাবে এসে পড়লেও মূলত এগুলি প্রবৃত্তি-সংঘাতের পথ ধরে বিকশিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন বড় মাপের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপ দিতে গেলে প্রবল ক্রিয়ার মধ্যেই তাকে ধরতে হয়। তীব্র ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির ঢেউ উদ্বেল ঘটনার সাহায্য না পেলে বিশ্বাস্য হয়ে উঠবে না। মনের মধ্যে যখন ঝড় উঠছে তখন তার কাজ-কর্ম, তার চারপাশের ব্যাপার মৃদু-মন্দ ছন্দে চলবে – বাস্তবে এ রকমটা অসম্ভব নাও হতে পারে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মনের আর ঘটনার সঙ্গতি বিধান করতে চেয়েছিলেন। স্তিমিত জীবন এবং বিস্ফোরিত হৃদয়ের মধ্যে যে অভ্যন্তর আত্মীয়তা থাকতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র তা আবিষ্কার করতে পারেননি। এজন্য তাঁর এই লেখা প্যারীচাঁদ-লালবিহারীর আদর্শে গড়ে ওঠেনি। সেগুলি মানবপ্রবৃত্তির কাহিনী নয়। তাই সামাজিক-পারিবারিক চিত্রাঙ্কনেই ওদের দায়িত্ব ফুরিয়েছে। যাঁরাই সেকালে প্রবৃত্তিকেন্দ্রিক গল্প লিখেছেন তাঁরাই ঘটনাবহুল ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন ভূদেব-কৃষ্ণকমল।

পারিবারিক জীবনের দৈনন্দিন আচার-বিশ্বাসের ছবি মঙ্গলকাব্যেও ছিল। তার বাস্তবতাও অস্বীকার্য নয়। কিন্তু সচেতন সামাজিক দৃষ্টি, পুরাতন ও নবীন আদর্শের সংযোগ ও সংঘাতের ফল উনিশের শতকে ইংরেজি শিক্ষা ও ইংরেজ শাসনের মধ্য দিয়ে পাওয়া গিয়েছিল। যাঁরা এই বাস্তব জীবনকে অঙ্গীকার করে গল্পের সূত্রে বাঁধলেন তাঁরা নবযুগের দাবিই মেনেছিলেন।

কিন্তু বঙ্কিম হৃদয়ে ও চরিত্রের গভীরে কামনাবাসনা-উচ্চাকাঙ্ক্ষা-ঈর্ষাদির আলোড়নকে দেখে জীবনকে নতুনভাবে চিনতে চাইলেন, ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যে পাপ-পুণ্যে নিরপেক্ষ নিয়তির খোঁজ পেলেন – এখানে তিনিও ইংরেজ প্রভাবিত নতুন সংস্কৃতির কাছে ঋণী। তাঁর উপলব্ধিতে জীবনের ও সমাজের ছবির চেয়ে গভীরতর বাস্তব এই ব্যক্তিত্বের মানস-সত্য। বর্তমানের অভিজ্ঞতায় এদের দেখা মেলে না, কারণ বাঙালির গতি ও শক্তিহীন তুচ্ছ প্রাত্যহিকে সে সুযোগ ছিল না। উনিশ শতকের বাঙালি শিক্ষিত শ্রেণী রাষ্ট্র গড়াভাঙার খেলা থেকে নির্বাসিত, জাহাজ গড়তে কল চালাতে জানে না, লড়তে শেখেনি, সামুদ্রিক বাণিজ্য অনেক দূরে। বড় জোর বিধবাবিবাহ উচিত কিনা তা নিয়ে তর্ক করেছে। জাতীয়তাবোধ তখনও অস্ফুট, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের কথা স্বপ্নেও ভাবা হয়নি, কিন্তু ইংরেজদের সংস্কৃতির যোগাযোগে ওদের সাহিত্যে প্রবেশ করে যে ভাবের উদ্দামতা, ব্যক্তিত্বের মুক্তি, উল্লসিত আত্মপ্রসারণ শিক্ষিত বাঙালি অনুভব করেছে তাকে ধরবার মতো বাস্তব সামাজিক-পারিবারিক বিষয়ের অভাব শিল্পী হিসেবে বঙ্কিমকে পীড়িত করেছে। তিনি বর্তমানের মধ্যে খুঁজেছেন এমন ঘটনাবর্ত যাতে সংগতির সঙ্গে প্রকাশ করা যায় আধুনিক বাঙালির এই আবেগতপ্ত চিত্তবৃত্তিকে। তাঁর মনে প্রবল সংশয় ছিল এ কাজ আদৌ সম্ভব কিনা। সে কারণেই বাংলা উপন্যাসের মধ্যে ঢুকে পড়বার আগে তিনি ইরেজি ভাষায় রাজমোহন্‌স ওয়াইফ লিখলেন। ভাষা ইংরেজি, কিন্তু বাঙালির বর্তমান সামাজিক জীবনের যে মানস-সত্য তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে তাকেই সামঞ্জস্যে বাঁধতে চাইলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। এমন অনেক প্রসঙ্গের সমাবেশ ঘটাতে হলো তাঁকে যা অস্বাভাবিক, যেখানে স্থূল কল্পনা বিশ্বাসকে জোরে ধাক্কা দেয়। নিস্তরঙ্গ বাঙালির গ্রাম-জীবনে ঘটনাপ্রাবল্য সৃষ্টির জন্য তাঁকে ডাকাতি-নারীহরণের মতো সস্তা অ্যাডভেঞ্চারধর্মী বিষয় আমদানি করতে হয়েছে। ব্যক্তিত্বে ও ভঙ্গিতে দস্যু সর্দার প্রায় সেনানায়ক হয়ে উঠেছে। মাধবের ডাকাতি-প্রতিরোধ একটা ছোটখাটো দুর্গরক্ষার শামিল। মথুরের গোপন কারাগার মধ্যযুগের রাজকীয় ব্যবস্থার কথা মনে করায়। এই সব কৃত্রিম কাণ্ডকারখানা বাস্তব সামাজিকতাকে প্রকাশ করে না, নষ্ট করে।

বঙ্কিম এই অভিজ্ঞতা থেকে বুঝলেন, সমকালীন জীবনের বাতাবরণ যদি রাখতে হয়, সরল সমাজচিত্র, পারিবারিক প্রাত্যহিক বিবরণে আশ্রয় নিতে হবে। প্রবৃত্তিমুখী মানবচিত্তকে প্রকাশ করতে গেলে ঘটনাবহুল কাহিনী বলতে হবে। বর্তমান বাঙালি-জীবনে তার সুযোগ নেই। অতীত ইতিহাসের ভূমিতে দাঁড় করালেই তার বিশ্বাসযোগ্যতা রক্ষা করা সম্ভব। ভূদেব-কৃষ্ণকমল অতীতের বর্ণবহুল উত্তেজনাপূর্ণ গল্প বলতে চেয়েছেন। তাতে আধুনিক চিত্তবৃত্তি ঢুকে পড়েছিল – কোনো সচেতন শিল্পসাধনার ফল তা নয়; নবযুগের বোধে উদ্বুদ্ধ তাঁদের মন এই কার্যটি সাধন করেছিল। তাঁরা দুজন এই সমস্যা নিয়ে ভাবেননি, বর্তমান বাস্তব জীবনের মধ্যে এর উত্তর খোঁজেননি। একটি করে মাত্র গল্পে তাহলে ওঁদের চেষ্টা শেষ হতো না। বঙ্কিম তাই ওঁদের দেখে নিশ্চিন্তভাবে ঐতিহাসিক রোমান্স লিখতে লাগলেন এমন নয় তাঁকে নতুন করে ওই পথ চিনে নিতে হলো। সামাজিক জীবনের মধ্যে কৃত্রিমতা ঘুচিয়ে কিভাবে এ প্রশ্নের মীমাংসা করা যায় তা জানতে বঙ্কিমের অনেক সময় লেগেছে,

ইতিহাসকল্পনায় মন পাকাতে হয়েছে এবং ঐ সাফল্যও কিছুকাল মাত্র স্থায়ী হয়েছিল – রোমান্স থেকে সামাজিক বাস্তবতায় ক্রমোত্তরণ ঘটেনি।

রাজমোহন্‌স ওয়াইফ বিশ্লেষণ করেই মাত্র বঙ্কিমের উপন্যাসের রূপ ও আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা ও পথ খোঁজার খবর পাওয়া সম্ভব।

তিন

এই ইংরেজি বই থেকেই ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব এবং রচনারীতির বিশিষ্ট কতকগুলি ঝোঁক চোখে পড়তে থাকে। অনেকগুলিরই হয়তো মাত্র উন্মেষ, কতকগুলি নেহাত অপটু আরম্ভ। কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাস-ধারায় একে বাদ দিয়ে এগোনো ঠিক নয়। বঙ্কিম-প্রতিভার সেই পূর্বসূত্রগুলি সংক্ষেপে নির্দেশ করা হলো।

১. মানুষের সমাজ-অস্বীকৃত প্রেমকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া – রচনার কেন্দ্রীয় সমস্যারূপে তাকে স্থাপন করা। এ গল্পের নায়িকা মাতঙ্গিনীর ভালোবাসা তার ভগ্নীপতি মাধবের প্রতি। চরিত্রাঙ্কন নিপুণ না হলেও প্যাসন অতি তীব্র। তার আত্মপ্রকাশের কিছু নিদর্শন–

'Ah, hate me not, despise not.' cried she with an intensity of felling which shook her delicate frame. 'Spurn me not for this last weakness; this Madhav, this may be our last meeting; it must be so, and too, too deeply have I loved you for ever without a struggle.'

২. প্রেম মানুষের স্বভাবে যে বিচিত্র জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে সে বিষয়ে তখন থেকেই বঙ্কিমের আগ্রহ জন্মেছিল। লালসার ক্লিন্নরূপ (যেমন মথুর চরিত্রে) বরং সহজবোধ্য, কিন্তু দুর্বৃত্ত রাজমোহনের অন্যাসক্ত পত্নীর সম্পর্কে ঈর্ষাজ্বালাময় অন্ধপ্রায় ভালোবাসা দুরূহ মানবরহস্য। স্ত্রীর প্রতি রাজমোহনের একটি উক্তি স্মরণ করা চলে–

'Thou little knowest how I have watched thee, how from the earlist day that thy beauty became thy curse, I have followed every footstep to thine – caught every look that from thine eyes. Brute though I be, ...I was proud of my beautiful wife and as the tigress watches over her whelp. I watched over thee.'

৩. এই উপন্যাসের কাহিনীবৃত্ত নাটকের আদর্শে তৈরি। ব্যক্তিতে-প্রবৃত্তিতে-ভাবাদর্শে নানামুখী দ্বন্দ্ব এ রচনার অবলম্বন। পরের সব লেখায় বিচিত্র বৈপরীত্যের সংঘাত ঘটিয়ে, অপ্রত্যাশিতের বিস্ময়দীর্ণ আবির্ভাবে, চকিত বাঁক ফেরায়, গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটনে নাট্যরসদোহন করে নিয়েছেন লেখক। রাজমোহনের কাঁচা হাতে সে সিদ্ধি আসেনি, কিন্তু সমস্যার আরম্ভ-শীর্ষ-সমাপ্তি জড়িয়ে নাটকের ঢঙে বিষয় সাজানোয় দ্বিধা নেই।

রাজমোহনস্‌ ওয়াইফে নিজের অভিপ্রায় ও রচনা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষা চালিয়েছেন নিষ্ঠার সঙ্গে, ব্যাকুলতা নিয়েও এবং জেনেছেন সিদ্ধি কোথায় – পৌঁছেছেন তার দরজায়।

২ মন, মনের বিবর্তন এবং ইতিহাসের ভূমি

এক

সেক্সপিয়র। ইংরেজি সাহিত্য। আলিফ লায়লা। রেস্থাম-মিল। মুসলমান যুগের ইতিহাস। বিধবা বিবাহ আইন। বহুবিবাহ নিরোধ আন্দোলন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্র। বাঙালিয়ানা। জাতীয়তাবোধ ও ইংরেজ-বিরোধিতা। নব্য হিন্দুধর্ম। মহাভারত ও গীতা। এবং সেক্সপিয়র।

প্রধানত এই উপাদানগুলিতে নানাভাব ও বিচিত্র অনুপাতের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল বঙ্কিমের, মন যা উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নব্য ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একজন প্রধান। চাকরি করতেন উঁচু সরকারী পদে। পড়েছিলেন বিস্তর। দেশ-বিদেশের দর্শন, ইতিহাস সাহিত্যে তাঁর গভীর প্রবেশ ছিল। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিষয়েও। পাঠ্যবস্তু নিয়মের শৃঙ্খলে বদ্ধ করে আত্মসাৎ করাই তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা। যুক্তিবিদ্ধ মননে তাঁর সিদ্ধি ঘটেছিল। কর্মে তৎপরতা ছিল, চাকরির রেকর্ড তাই প্রমাণ করে, আর বঙ্গদর্শন। তবে অতবড় চিন্তানায়ক, সমকালীন মুখ্য বুদ্ধিজীবীদের অবিসংবাদী নেতার পক্ষে এই কর্মপরিধির নেহাত সীমাবদ্ধতা ঔপনিবেশিক সমাজের নিয়তি। সম্পন্ন চাকুরে পরিবারের সন্তান, বনেদীয়ানা জন্মসূত্রে জোটেনি, – বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রজ্ঞায়, চরিত্রবৈশিষ্ট্যে আভিজাত্য আয়ত্ত করেছিলেন বঙ্কিম। স্বভাবতই তাঁর লেখা উপন্যাসে এই ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন ঘটেছে, – ঠিক যে ধরনের জটিল প্রতিবিম্বন বড় শিল্পীর লেখায় ঘটতে পারে।

যে সমস্ত বিষয় ও ভাবনা, ভাবাদর্শ ও মনীষা বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমন গড়ে তুলেছিল তা সবই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নবজাগরণের সম্পদ।[১] ক্লাসিক সাহিত্য ও বিরাট ঐতিহ্য থেকে যা এসেছিল তাও এই কালের পাত্রেই পান করেছিলেন তিনি।

তাঁর উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণ করার আগে যে কথাগুলি ভাবার মতো–

ক. উপন্যাসগুলি কালানুক্রমিক তালিকা, পর্ব বিভাগ।

খ. বিষয়বস্তুর ঐক্য : বর্গীকরণ।

১. সাম্প্রতিক নানা বিতর্কে এই নবজাগরণকে নস্যাৎ করায় যে-প্রবণতা দেখা দিয়েছে আমি তা স্বীকার করি না।

গ. শিল্পরীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য।
ঘ. পর্বগুলির প্রসঙ্গ ও প্রযুক্তি নিয়ে তুলনা।
ঙ. কয়েকটি সামাজিক-তাত্ত্বিক সমস্যা।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্রে উপন্যাসগুলির তালিকা ও কালানুক্রমিক পর্ব বিভাগ–

প্রথম পর্ব	তৃতীয় পর্ব
১. দুর্গেশনন্দিনী ১৮৬৫	৯. আনন্দমঠ ১৮৮২
২. কপালকুণ্ডলা ১৮৬৬	১০. দেবীচৌধুরানী ১৮৮৪
৩. মৃণালিনী ১৮৬৯	১১. সীতারাম ১৮৮৭
দ্বিতীয় পর্ব	**চতুর্থ পর্ব**
৪. বিষবৃক্ষ ১৮৭৩	১২. ইন্দিরা ১৮৯৩
৫. চন্দ্রশেখর ১৮৭৫	১৩. রাজসিংহ ১৮৯৩
৬. রজনী ১৮৭৭	
৭. কৃষ্ণকান্তের উইল ১৮৭৮	
৮. মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত ১৮৮০ (বঙ্গদর্শন)[২]	

প্রথম সংস্করণ 'ইন্দিরা' ১৮৭৩, 'যুগলাঙ্গুরীয়' ১৮৭৪, 'রাধারাণী' ১৮৭৭, প্রথম সংস্করণ 'রাজসিংহ' ১৮৮২ সালে বই হয়ে বেরোয়। উপন্যাস নামে বিজ্ঞাপিত না হলেও 'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত' (১৮৮০ সালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) এবং 'লোকরহস্যে'র অন্তর্গত 'সুবর্ণ গোলক' (১৮৭৩, বঙ্গদর্শন) কথা সাহিত্য শ্রেণীতে পড়বে। এর কয়েকটি লেখাকে বঙ্কিমচন্দ্র 'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস' বলে একসময়ে গ্রন্থবদ্ধ করেছিলেন। বোধ হয় য়ুরোপে প্রচলিত শর্ট নভেল বা নভেলেটের বঙ্গীয় রূপ গড়বার কথা তাঁর মনে এসে থাকবে। কিন্তু সে-সম্পর্কে তিনি গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি। এই কথাগুলি তাই হয়ে রইল ছোটগল্পের প্রাক-রূপ, কখনো বা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের খসড়া ধরনের। ছোট ইন্দিরা, রাধারানী, যুগলাঙ্গুরীয় বা সুবর্ণগোলক বাংলা ছোটগল্পের আদি রূপ, কতকটা শিল্পসম্মতও বটে। রাজসিংহ বড় উপন্যাসের অপুষ্টিজনিত বামনরূপ, মুচিরাম ব্যঙ্গোপন্যাসের খসড়া।[৩]

ইন্দিরা যখন বড় হলো, রাজসিংহ পূর্ণ বিস্তৃত চেহারা নিল, সেই হিসেবে তাদের চতুর্থ পর্বে রাখলাম। মুচিরামগুড়কে গৌণবিষয়রূপে তৃতীয় পর্বের মধ্যে আলোচনা করা হবে। অন্য লেখাগুলি উপন্যাস জাতীয় নয় বলে পরিত্যক্ত হলো।

২. উপন্যাস তালিকায় এ বইকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। করা উচিত। তাই তালিকার রাখলাম। পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস না হলেও এটি উপন্যাসেরই খসড়া

৩. আমার লেখা বঙ্কিমচন্দ্র, বাস্তবতা এবং বইটি দ্রষ্টব্য

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে চারটি পর্বে বিন্যস্ত করা হয়েছে প্রত্যক্ষত কালের মাপে। প্রথম দুই পর্বের মধ্যে চার বছর, দ্বিতীয়-তৃতীয় পর্বের মধ্যে আবার চার বছর এবং তৃতীয়-চতুর্থ পর্বের মধ্যে চার বছরের ফাঁক। তা ছাড়া লেখাগুলির মধ্যে এমন বিবিধ ঐক্য প্রাথমিক পাঠকেরও চোখে পড়বে যাতে গোষ্ঠীবদ্ধ করা সহজ কাজ। জাতীয় ইতিহাস এবং বঙ্কিমের জীবন ও মনের বিকাশও পিছনে যোগ্য ভূমিকা তৈরি করেছে।

এই উপন্যাসগুলিকে কালানুক্রমে ভেঙ্গে দুটি বর্গে সাজানো যায়–

ক. ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স	খ. সামাজিক উপন্যাস
১. দুর্গেশনন্দিনী	১. বিষবৃক্ষ
২. কপালকুণ্ডলা	২. চন্দ্রশেখর
৩. মৃণালিনী	৩. রজনী
৪. চন্দ্রশেখর	৪. কৃষ্ণকান্তের উইল
৫. আনন্দমঠ	৫. মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত
৬. দেবীচৌধুরানী	৬. ইন্দিরা
৭. সীতারাম	
৮. রাজসিংহ	

চন্দ্রশেখরকে দুটি বর্গেই রাখলাম – কারণ এর মূল কাহিনী (চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপ বিষয়ক) নেহাত সামাজিক, ঐতিহাসিক অংশের সঙ্গে তার বন্ধন কিছু অচ্ছেদ্য নয়।[৪] যদিও বঙ্কিম এটিকে ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স হিসেবেই লিখেছেন।

তালিকা অনুযায়ী এদের অনুপাত ৮ ঃ ৬। কিন্তু ওটা আপাত হিসেবে। মুচিরাম উপন্যাসের খসড়ামাত্র, এবং চন্দ্রশেখরের পূর্ব বর্গেই প্রথাসিদ্ধস্থান। তাই ঐ অনুপাত ৮ ঃ ৪।

আরও লক্ষ্য করবার, চারটি পর্বেই তিনি প্রথম বর্গের বই লিখেছেন, দ্বিতীয় বর্গের গুলি সবই দ্বিতীয় পর্বে লেখা, ইন্দিরাও। তবে সেটিকে গল্পের আকার থেকে উপন্যাস বদলে নেওয়া হলো চতুর্থ পর্বে।

তিন

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে যেসব বিষয়-ভাব-আদর্শ-স্বাদ বারবার এসেছে তার শ্রেণী-বিন্যস্ত একটি তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।[৫] লেখকের মনের অনেকটা পরিচয় এতেই ধরা আছে।

১. প্রেমের বিচিত্র রূপ ২. পাত্র-পাত্রীর চরিত্র, ৩. জাতীয়তাবাদ ৪. ইতিহাস-সমাজ-পারিবারিক জীবন।

৪. এ বিষয়ে যথাস্থানে যুক্তি দেওয়া হবে।

৫. উপন্যাসের নাম নির্দেশ করতে আদ্য অক্ষর (যেমন মৃ = মৃণালিনী) বন্ধনীমধ্যে দেওয়া হল।

এই বিষয়গুলি প্রধান, আলোচনায় এগুলিই অবলম্বিত হলো।

১. প্রেম

নরনারীর যৌনসম্পর্ক ও আকর্ষণ ভিত্তিক সব রকম মনোভাব, ভাবাবেগ ও বন্ধনকে ঐ শব্দটি দিয়ে বোঝাতে চাইছি। বঙ্কিমে এর কয়েকটি বিশেষ রূপের দিকে ঝোঁক পড়ে। সেই ভাবে উপশাখা তৈরি করে আশ্রয়ী পাত্রপাত্রীর তালিকা দেওয়া হলো।

ক. সমাজ কর্তৃক অস্বীকৃত, নীতিভ্রষ্ট, গুপ্ত–
মতিবিবি (ক)। নগেন্দ্র-কুন্দ, হীরা-দেবেন্দ্র, কুন্দের প্রতি দেবেন্দ্র (বি)। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনী (চ)। লবঙ্গলতার প্রতি অমরনাথ (র)। গোবিন্দলাল-রোহিণী (কৃ)। কল্যাণীর প্রতি ভবানন্দ (আ)। রমার প্রতি গঙ্গারাম (সী)। জেবুন্নিসা-মবারক, নির্মলের প্রতি ঔরংজীব (রা)।

খ. দাম্পত্য-সম্বন্ধ : গুপ্ত বা নব্য রোমান্টিক প্রেমের সাদৃশ্যে– বীরেন্দ্র-বিমলা (দু)। পশুপতি-মনোরমা (মৃ)। জীবানন্দ-শান্তি (আ)। ব্রজেশ্বর-প্রফুল্ল (দে)। সীতারাম-শ্রী (সী)। উপেন্দ্র-ইন্দিরা (ই)। দরিয়া-মবারক (রা)।

গ. বিবাহিত দম্পতির সরল অক্ষুব্ধ বা চঞ্চল ভালোবাসা–
নগেন্দ্র-সূর্যমুখী, শ্রীশ-কমল (বি)। গোবিন্দলাল-ভ্রমর (কৃ)। মীরকাশিম-দলনী (চ)। লবঙ্গলতা (র)। ব্রজেশ্বর-সাগর (দে)। সীতারাম-নন্দা (সী)। রমণবাবু-সুভাষিণী (ই)। নির্মল-মানিকলাল (রা)।

ঘ. বিবাহপূর্ব রোম্যান্টিক প্রেম (সফল বা ব্যর্থ)–
জগৎসিংহের প্রতি আয়েষা, আয়েষার প্রতি ওসমান, তিলোত্তমা-জগৎসিংহ (দু)। হেমচন্দ্র-মৃণালিনী (মৃ)। শচীশ-রজনী (র)। রাজসিংহের প্রতি চঞ্চল কুমারী (রা)।

ঙ. বহুপত্নীক পুরুষ – পত্নী বিশেষের সঙ্গে ছিন্ন বা বাধাগ্রস্ত সম্পর্কের তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহার। (খণ্ডিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে চিহ্ন × দেওয়া হলো।

নবকুমার-মতিবিবি × – কপালকুণ্ডলা (ক)। নগেন্দ্র – সূর্যমুখী × – কুন্দ (বি)। ব্রজেশ্বর – প্রফুল্ল × – সাগর-নয়ন (দে)। সীতারাম – শ্রী × – নন্দা-রমা (সী)।

প্রণয়মূলক এই সব বিচিত্র সম্পর্কের মধ্যে কোনো বর্গে যা ফেলা যায় না, সেখানে প্রশ্ন ঔরংজীবের প্রতি নির্মলকুমারীর (রা) মনোভাব কী?

কয়েকটি ছক ও নকসার সাহায্যে পূর্বোক্ত বিচিত্র প্রেম-সম্পর্কগুলির মধ্যের জটিলতার পরিচয় নিতে চাইছি। এক নারী দুই পুরুষ বা এক পুরুষ দুই রমণীর ক্ষেত্রে প্রধানত দু-ধরনের টানা-পোড়েন দেখা গিয়েছে।

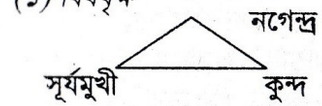
চ. যেখানে ক কামনা করেছে খ-কে, কিন্তু খ-এর চিত্ত গ-কে চাইছে।

(১) ওসমান – – → আয়েষা – – → জগৎসিংহ (দু)।
(২) ভবানন্দ – – → কল্যাণী – – → মহেন্দ্র (আ)।
(৩) মতিবিবি – – → নবকুমার – – → কপালকুণ্ডলা (ক)।
(৪) গঙ্গারাম – – → রমা – – → সীতারাম (সী)।
(৫) হীরা – – → দেবেন্দ্রনাথ – – → কুন্দ (বি)।

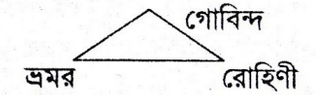
দেখা যায় তৃতীয় পাত্রটি হয় অন্য কারুর প্রতি আসক্ত (যেমন জগৎসিংহ তিলোত্তমার প্রতি, সীতারাম শ্রীর প্রতি, কুন্দ নগেন্দ্রের প্রতি) অথবা দ্বিতীয়-তৃতীয় ব্যক্তির প্রেম পারস্পরিক (যেমন কল্যাণী-মহেন্দ্র), অথবা শেষ জনের আকর্ষণ কারুর প্রতি নয় (যেমন কপালকুণ্ডলা)।

ছ. তিন পাত্র-পাত্রীর আরও জটিল বন্ধন, অর্থাৎ আকর্ষণ যেখানে একমুখী নয়, পারস্পরিক বন্ধনে এরা জড়িয়ে–

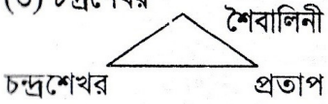
(১) বিষবৃক্ষ



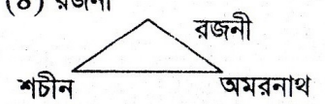
(২) কৃষ্ণকান্তের উইল



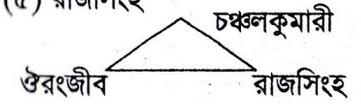
(৩) চন্দ্রশেখর

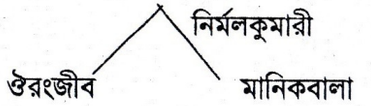


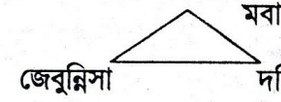
(৪) রজনী



(৫) রাজসিংহ







উপরের নকসায় শীর্ষবিন্দুর সঙ্গে অপর দুই চরিত্রের সম্বন্ধই মুখ্য, সেই সূত্রেই দুই ভূমি-বিন্দু সম্পর্কিত। শেষ ছবিতে তিন বিন্দু পুরো ত্রিভুজ নয়, কারণ নির্মলকুমারীর সঙ্গে সম্বন্ধের সূত্রে ঔরংজীব ও মানিকলাল পরস্পর কোনো বিশেষ ভাবাবেগে বদ্ধ হয়নি।

প্রেমের বিচিত্ররূপ লক্ষণীয়। কোথাও প্রেম নয়, অধিকারের ইচ্ছাই বড় (যেমন চঞ্চলকুমারীর প্রতি ঔরংজীব)। তবে সর্বত্র শীর্ষবিন্দুর প্রতি ভূমিবিন্দু দুটির আকর্ষণ – আকর্ষণের রূপ ও প্রকৃতি যেমনই হোক – উভয় ভূমিবিন্দুর প্রতি শীর্ষবিন্দুর প্রণয় নাও থাকতে পারে (যেমন অমরনাথকে রজনী বা চন্দ্রশেখরকে শৈবলিনী ভালোবাসত না, অন্য যেভাবেই শ্রদ্ধা করুক)।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মুখ্য বিষয় প্রেম। যেখানে অন্য সমস্যা, যেমন নবরাজ্যগঠন, জাতির স্বাধীনতারক্ষা প্রভৃতি, সেখানেও প্রেমই কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ হয়ে উঠেছে। ব্যতিক্রম রাজসিংহের জীবন। তাঁর কাহিনীতে চঞ্চল কুমারী প্রত্যক্ষ কারণ হলেও তার কার্যাদি ও চিত্তভাবে প্রণয় প্রধান শক্তি নয়।

প্রেমেই লেখক মানুষের মুক্তি খুঁজেছেন। নব্য বাঙালি ভাবের দুনিয়ায় আত্মবিস্তার লাভ করেছিল, সে তুলনায় কর্মের পৃথিবী ছিল একান্ত সঙ্কীর্ণ। ইতিহাস দিয়ে তাকে খানিক ঢাকা গিয়েছে। তবুও সত্য – এই মুক্তি হৃদয়ের মনের বুদ্ধির – জীবন বড় গণ্ডীবদ্ধ; আর এই মুক্তি প্রেম। সামাজিক পটভূমির কার্যকারণ যোগ এই পর্যন্ত। বঙ্কিম এর পরে চিত্তরহস্যে ধাপে ধাপে ঢুকে পড়েছেন, প্রেমাশ্রয়ী বিচিত্রতায় বিস্মিত হয়েছেন, বুঝেছেন প্রেমেই মানব-আত্মার বিস্তার এবং বন্ধনও। প্রেমই তার নিয়তি।

২. পাত্রপাত্রী

প্রধান নরনারীর চরিত্রের প্যাটার্ন অনুযায়ী নিচের এই বর্গীকরণ। ঠিক কি ধরনের চরিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমের আসক্তি তার পরিচয় এখানে মিলবে।

পুরুষ		নারী		
পাপদষ্ট/ নীতিভ্রষ্ট/ আদর্শচ্যুত/ প্রবৃত্তি-ক্ষুব্ধ বা দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ/ পত্নীঘাতী	অপাপবিদ্ধ	পাপদষ্ট/ নীতিভ্রষ্ট/ প্রবৃত্তিক্ষুব্ধ/ পতিঘাতিনী	অপাপবিদ্ধ	প্রায় অপার্থিব বা রহস্যময়
দু/ বীরেন্দ্র	জগৎসিংহ ওসমান +	বিমলা	তিলোত্তমা আয়েশা +	
ক/ নবকুমার কাপালিক		মতিবিবি		কপালকুণ্ডলা
মৃ/ পশুপতি	হেমচন্দ্র +		মৃণালিনী	মনোরমা
বি/ নগেন্দ্র দেবেন্দ্র		হীরা	সূর্যমুখী + কুন্দ +	

চ/ প্রতাপ মীরকাশিম	চন্দ্রশেখর +	শৈবলিনী	দলনী	
র/ অমরনাথ	শচীশ		রজনী লবঙ্গ +	
কৃ/ গোবিন্দলাল		রোহিণী	ভ্রমর +	
আ/ ভবানন্দ জীবানন্দ	সত্যানন্দ + মহেন্দ্র		শান্তি + কল্যাণী	
দে/ ভবানীপাঠক	ব্রজেশ্বর		প্রফুল্ল + সাগর	
সী/ সীতারাম গঙ্গারাম			রমা নন্দা	শ্রী
ই/	উপেন্দ্র		ইন্দিরা +	
রা/ ঔরংজীব মবারক	রাজসিংহ মানিকলাল +	জেবুন্নিসা দরিয়া	চঞ্চলকুমারী + নির্মলকুমারী +	

ক. নীতি আদর্শ পাপ পুণ্য প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের দিক থেকে অপাপবিদ্ধ নরনারীর মধ্যে যাদের + চিহ্নে কিছু পৃথক করা হয়েছে তাদের স্বভাবে বাড়তি গুণ (চাতুর্য উগ্রতা কর্মতৎপরতা অতিদর্প তীক্ষ্ণআত্মগৌরববোধ ব্যক্তি – এর এক বা একাধিক লক্ষণ) আছে। ফলে তারা ভালোমানুষীর সীমা অল্পাধিক ডিঙিয়েছে।

খ. সন্ন্যাসী-মহাপুরুষ মহাজ্ঞানী চরিত্র –

অভিরামস্বামী (দু)। কাপালিক (ক)। মাধবাচার্য (মৃ)। হরদেব ঘোষাল (বি)। রমানন্দ স্বামী (চ)। সন্ন্যাসী (র)। মহাপুরুষ, সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ (আ)। ভবানীপাঠক (দে)। গঙ্গাধর স্বামী, জয়ন্তী (সী)।

সন্ন্যাসীদের কেউ পাপক্ষত, আদর্শচ্যুত, কেউ-বা উগ্র স্বদেশপ্রেমিক ও যোদ্ধা, কেউ দস্যু – অনেকে আদর্শবাদে স্থিত, কেউ-বা অস্পষ্ট। একজন মাত্র সন্ন্যাসিনী, একজন আছেন আধুনিক কালের জ্ঞানীপুরুষ।

গ. খল চরিত্র –

কতলু খাঁ (দু)। কাপালিক (ক)। পশুপতি (মৃ)। দেবেন্দ্রনাথ, হীরা (বি)। গুরগণ খাঁ, ফস্টর (চ)। হীরালাল (র)। হরলাল (কৃ)। হরবল্লভ (দে)। গঙ্গারাম (সী)।

এদের মধ্যে পশুপতি অবশ্যই খলস্বভাব, কিন্তু সমগ্রত নায়কোচিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

ঘ. চতুর কৌশলী বা কর্মতৎপর নারী

বিমলা (দু)। মতিবিবি (ক)। গিরিজায়া (মৃ)। হীরা (বি)। দলনী, শৈবলিনী (চ)। লবঙ্গ (র)। রোহিনী (কৃ)। শান্তি (আ)। প্রফুল্ল (দে)। জয়ন্তী, শ্রী (সী)। ইন্দিরা (ই)। নির্মলকুমারী, দরিয়া (রা)।

সোজা পথে যারা চলেছে সামাজিক বিচারে তারা সম্মান পায়, নিরেট আদর্শবাদীর ভাগ্যে অনেক শ্রদ্ধা ও গৌরব জোটে। বঙ্কিমের হাতে এ জাতীয় নরনারী উচ্চ শিল্পসার্থকতার স্থিত নয়। যাদের পথ বেঁকে গেছে, ভেঙে পড়েছে, যে আদর্শ হারিয়েছে, পাপে লিপ্ত এমন পাত্রপাত্রীই বঙ্কিম-উপন্যাসের সম্পদ।

৩. জাতীয়তাবাদ

ছয়টি উপন্যাসে জাতীয়তাবাদ তথা স্বদেশপ্রেমের নানা ধরনের প্রকাশ দেখা যায়।

ক. মৃণালিনী। মাধবাচার্যের আদর্শবাদ, হেমচন্দ্রের কার্য, পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতা।

খ. চন্দ্রশেখর। ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে নবাব ও প্রতাপের যুদ্ধ।

গ. আনন্দমঠ। সন্তানদলের স্বাধীন ও আদর্শ রাজা গঠনের চেষ্টা, ইংরেজ কোম্পানির বিরুদ্ধ লড়াই। বন্দেমাতরম গানের ব্যবহার।

ঘ. দেবীচৌধুরানী। দেশভক্ত আদর্শবাদী দস্যুদলের সঙ্গে কোম্পানি-ফৌজের সংঘর্ষ।

ঙ. সীতারাম। অত্যাচারী মুসলমান নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীন আদর্শ হিন্দুরাজ্য স্থাপন।

চ. রাজসিংহ। মোগলদের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে রাজপুতদের স্বাধীনতা রক্ষা।

দেখা যায়, সরাসরি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হয়েছে তিনটি উপন্যাসে (চ. আ. দে.)। তিনটি উপন্যাসে মুসলমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে হিন্দুর যুদ্ধ (মৃ. সী. রা.)। একটিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতারক্ষার সংগ্রাম মুসলমান নবাবের নেতৃত্বে (চ)। প্রজাবিদ্রোহ আছে তিনটি উপন্যাসে (আ. দে. সী.)। একটিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভর্ৎসনা থাকলেও সরাসরি যুদ্ধ ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে (আ)।

লক্ষণীয়, সমকালীন জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির একটিতেও জাতীয়তাবাদ স্থান পেল না, অথচ ওঁর উপন্যাসের একটি বড় বিষয় এটি। এর দুটি কারণ– ১. দ্বিতীয় পর্বে যখন তিনি সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন তখন সাধারণ বাঙালির কাছে ও-বস্তু প্রায় অজ্ঞাত ছিল। এই বিষয় মুষ্টিমেয় কলকাতাবাসী বুদ্ধিজীবীর ভাবনায় মাত্র যাতায়াত করছে। কিন্তু অমরনাথ এরকম এক বুদ্ধিজীবী – সেও দেশের জাতির কথা ভাবল না। ২. বঙ্কিম নিজে সরকারী চাকুরে। তাছাড়াও সরাসরি জাতীয়তাবাদ (বঙ্কিমের লেখায় যা

প্রায়ই বিদ্রোহের রূপ নিয়ে আসে) উপন্যাসে প্রকাশ করার বিপদ তিনি বুঝতেন। ইতিহাসের আড়াল সেজন্যই। তাতেও তিনি সর্বদা রেহাই পাননি।

ইতিহাস	সংসারচিত্র	সমাজচিত্র সমাজসমস্যা (একালের
দু ক —————— মৃ —————— চ ——————	——————— বি ——————— র ——————— কৃ ——————— মু	
আ —————— দে —————— সী রা	——————— ই	

সব কটি সামাজিক উপন্যাসেই সংসারজীবনের ছবি আছে, ব্যতিক্রম মুচিরামগুড়। সেটি নেহাত খসড়া, পূর্ণ রূপ পায়নি। ৮টির মধ্যে ৫টি ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাসেও ঐ রকমের ছবি অল্প বিস্তর আছে। এভাবে যে ৯টি উপন্যাসে বাঙালি পরিবারের রূপ ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে মিল আছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রাম্যসংসারের বড় রকমের পার্থক্য ঘটল না কেন, তার জন্য লেখকের কালচেতনার অভাব দায়ী নয়। আসলে এ দেশের গ্রামের মানুষের প্রাত্যহিক জীবন শত শত বছরেও খুব বদলায়নি। লক্ষ্মণসেনের সময়ের আর মীরকাশিমের কালের গৃহজীবন তাই সহজে সদৃশ। অবশ্য ঊনবিংশ শতকে সমাজের বৃহৎ সমস্যা ধীরে ধীরে পরিবারের মধ্যে ঢুকে পড়তে থাকে, সেখানে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করল। তবুও তার ভিত্তিটা রইল অটল হয়ে। এই ছবিগুলোর একটি তালিকা –

ননদ (কুলীনের পিতৃগৃহবাসিনী কন্যা) -নববধূ-স্বামী নিয়ে সম্পন্ন ব্রাহ্মণ গৃহ (ক)। অন্যেব গৃহে আশ্রিতা অভিজাতবংশের যুবতী (মৃ)। জমিদারবাড়ির বিপুল আয়োজন, শ্রী-কমলের সরল-মধুর দাম্পত্যচিত্র (বি)। সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত

চন্দ্রশেখরের সংসার (চ)। ধনী গৃহস্থ-বাড়ি শচীশদের; রজনীদের গরিবের সংসার (র)। গরিব রোহিণীর আবাস (কৃ)। সাধারণ অবস্থার ব্রাহ্মণ পরিবার–শান্তির আবাস (আ)। জমিদার—পরিবার—ব্রজেশ্বর এবং সাগরের পিত্রালয়, প্রফুল্লের মায়ের গরিবের সংসার (দে)। সম্পন্ন গৃহস্থের অন্তঃপুর (ই)।

দেখা যাচ্ছে, ইতিহাস নিয়ে লিখলেও বঙ্কিম পল্লীর সংসার-জীবনের পৃষ্ঠভূমি স্থাপন করে অনেক মানুষকেই নিজকালের কাছে এনেছেন। প্রধানত ধনী ও সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারের দিকেই ঝোঁক, জমিদারের জীবনযাত্রার এলাহি কারবারের বর্ণনায় আগ্রহ। প্রফুল্লের মায়ের দারিদ্র্যের ছবিটুকু বিশ্বাসযোগ্য, কিন্তু সহজ মোটা দাগে আঁকা। মৃণালিনী-আনন্দমঠের গার্হস্থ্য চিত্রটুকু নেহাত প্রাসঙ্গিক। সামাজিক উপন্যাস কৃষ্ণকান্তের উইলের চিত্র দুটি নায়িকার পটভূমি মাত্র, ঔপন্যাসিক ওগুলির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেননি। পারিবারিক সম্পর্কগুলি স্বাভাবিক বাঙালির – স্বামীস্ত্রী, ভাইবোন, ননদভাজ, সপত্নী, জামাই, মা-মেয়ে, বিমাতা-সপত্নীপুত্র, দাসদাসী, পালিকা কন্যা। শিশুর স্থান সঙ্কীর্ণ, আছে মাত্র দুটি ক্ষেত্রে (বি, আ)। অপারিবারিক আবাস – গোবিন্দ-রোহিনীর প্রসাদপুরের বাড়ি– খুব সংক্ষেপে কাজ সারার চেষ্টা লক্ষ্য করার মতো।

সবচেয়ে সরাসরি উনিশ শতকের সমাজ-চিত্র রয়েছে মুচিরামগুড়ে, সেটি কিন্তু নকসাধর্মী লেখা। খাঁটি উপন্যাসে সামাজিক সমস্যা যা আছে তা প্রধানত ব্যক্তিগত চরিত্র-জটিলতার সঙ্গে ওতপ্রোত। চন্দ্রশেখর নামক রোমান্সও এদিক থেকে সামাজিক গোত্রের।

বিষবৃক্ষ। বহিরঙ্গে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন-নব্যবঙ্গ সম্প্রদায়ের উৎকেন্দ্রিকতার প্রতি-কটাক্ষ।

বহুবিবাহ-নিরোধ ভাবনা নায়কের বিবেকের অংশ। নূতন কালের সামাজিক চৈতন্য কাহিনীর ট্র্যাজেডির ভিত্তি।

চন্দ্রশেখর। বিবাহিত নারীর প্রণয়-স্বাতন্ত্র্য; তার গৃহত্যাগকে মধ্যযুগ-সুলভ দুশ্চরিত্রতা-রূপে না দেখে। সেখানে ব্যক্তি-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের সন্ধান এবং এই হলো নূতন সমাজ-মানসিকতা।

রজনী। নব্যপন্থী বিকারকে ব্যঙ্গ, গৌণচরিত্র অবলম্বন করে। অমরনাথে ঘটেছে হিতবাদী সমাজবোধের প্রতিফলন এবং দার্শনিক আত্মজিজ্ঞাসা তথা সাহিত্যভাবনা যা আধুনিক যুগোচিত মননের ফল।

কৃষ্ণকান্তের উইল। জমিদার-পুত্রের সুন্দরী রমণীতে আসক্ত হয়ে তাকে রক্ষিতারূপে গ্রহণ– অতি পরিচিত পুরনো বিষয়কে নব্যযুগের সামাজিক-মানবিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করা, আধুনিক নীতিবোধ থেকে দেখা।

ইন্দিরা। কলকাতার সমাজ-জীবনের ছিঁটেফোঁটা যা উপেন্দ্রে বা সুভাষিণীদের সংসারে ছায়া ফেলেছে। দস্যু-লুণ্ঠিত পত্নীকে সমাজে প্রতিষ্ঠা–যদিও তা করা হয়েছে খুবই হাল্কা মেজাজে।

বঙ্কিমের উপন্যাসে সমাজ প্রবেশ করেছে মানব-প্রকৃতির গভীরে–ব্যঙ্গের প্রয়োজন ছাড়া তার বহিরঙ্গ চিত্রে শিল্পীর আকর্ষণ নেই।

তেরটি রচনার মধ্যে একটির ঘটনাস্থল রাজপুতানা-দিল্লী-আগ্রায়, বাকি সবগুলি মুখ্যত বঙ্গদেশে। চন্দ্রশেখরের কিছু অংশ বিহারে, সীতারামের অল্প একটু ওড়িশায়, কপালকুণ্ডলার নামমাত্র অংশ আগ্রায় ঘটেছিল। গ্রামের কথাই বেশি – যেখানে ঐতিহাসিক যুগের সঙ্গে আধুনিককালের পার্থক্য কম। পুরনো দিনের নগর এসেছে ইতিহাসের ও ঐশ্বর্যের প্রয়োজনে, আধুনিক নগর কলকাতা দু-একবার উঁকি দিলেও বিশিষ্ট ভূমিকায় নয়।

কপালকুণ্ডলায় সমুদ্র, ঘন কুয়াশা, মোহনায় জোয়ার, নির্জন অরণ্য, গঙ্গা, জঙ্গল-ঘেরা গ্রাম আছে। বিষবৃক্ষে নদীপথে যাত্রার ও ঝড়বৃষ্টির বিবরণ, চন্দ্রশেখরে গঙ্গা, টিলাপাহাড়ে ঘেরা ভূমি। রজনীতে নদীতে নৌকায় কিছু ঘটনা আছে। আনন্দমঠ পাহাড়-জঙ্গলের কাহিনী। দেবী চৌধুরানীতে বন ও নদীর ভূমিকা আছে – কালবৈশাখীর ব্যবহারও লক্ষ্য করার মতো। সীতারামে নদী-পাহাড়ের গুহা অল্প আছে। ইন্দিরায় জঙ্গল, গঙ্গানদী। রাজসিংহে রাজস্থানের পর্বতশ্রেণী।

প্রকৃতি পটভূমি তৈরি করেছে, প্রয়োজনীয় আশ্রয় হয়ে উঠেছে রাজবিদ্রোহীর। বর্ণনায় লেখক কখনও কিছু উৎসাহ বোধ করেছেন – এই পর্যন্ত। চন্দ্রশেখরে গঙ্গার ভূমিকা, কাহিনী ও চরিত্রের অন্দরে ঢুকেছে। কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি সংসার-জীবনকে অনন্তের মুখোমুখি করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পুরনো ইতিহাসের কালনির্দেশ এবং তার আনুপাতিক গুরুত্ব –

১. দুর্গেশনন্দিনী। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশক। আকবর তখন বাদশাহ। বাংলায় মোগল-পাঠানের প্রাধান্যের লড়াই। মূল কাহিনীই ইতিহাসাশ্রয়ী।
২. কপালকুণ্ডলা। ১৬০৫ সাল জাহাঙ্গীরের সিংহাসন প্রাপ্তির বছর। দূর থেকে বাদশাহী ঐশ্বর্য উপনায়িকার পটভূমিতে আলো ফেলেছে।
৩. মৃণালিনী। ১২০১ সাল। লক্ষ্মণসেনের নবদ্বীপ থেকে পলায়ন ও মুসলমান-বিজয়। মুখ্য কল্পকাহিনী ইতিহাস জড়িয়ে।
৪. চন্দ্রশেখর। ১৭৬৩-৬৪ সাল। কোম্পানি-ফৌজের হাতে মীরকাশিমের পরাজয়। গৌণ-কাহিনীর অঙ্গ।
৫. আনন্দমঠ। ১৭৭০-৭১ সাল। কোম্পানির কর্তৃত্বে দ্বৈত শাসনকালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে প্রজা-বিদ্রোহ। মূল কাহিনী এই গৌণ-ইতিহাস নিয়ে।
৬. দেবীচৌধুরানী। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশক। হেস্টিংসের আমল। গণঅভ্যুত্থানের কল্প-কাহিনী।
৭. সীতারাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিক। মুর্শিদকুলী খাঁ বাংলার নবাব। সীতারামের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও ধ্বংসের কথা।

৮. রাজসিংহ । সপ্তদশ শতকের শেষ – অষ্টাদশ শতকের শুরু। ঔরংজীব বাদশাহ। ঐতিহাসিক কাহিনী।

রাজশক্তির বা অভ্যুত্থানের পতন (মৃ–চ–দে–সী), জয়ের পরেও আত্মসংহরণ-পতনের মতোই ঘটনা (আ)– এর দিকেই ঔপন্যাসিকের আগ্রহ বেশি। শেষ বইয়ে রাজসিংহের জয় অভিপ্রায় হলেও ঔরংজীবের আসন্ন বিপর্যয় অনেক রঙিন। একটিতে ইতিহাস বহুদূরে (ক), অন্য একটিতে গৌণ কাহিনীর বিষয় (চ), একটিতে ইতিহাস-কাহিনী সবই বাংলার বাইরে (রা), একটির ইতিহাস আগ্রায় হলেও তার বিচ্ছুরিত অংশ বাংলার এসে পড়েছে (ক)। বাকি সবগুলো বঙ্গদেশের জীবন-কথা। একটিতে হিন্দু আমলের শেষ পর্যায়, পাঁচটির ইতিহাস মুসলমানযুগের (দু–ক–চ–সী–রা), তার মধ্যে একটি কোম্পানির আমলেরও (চ)। দুটি পুরো কোম্পানির আমলের (আ-দে)। চারটির কালই অষ্টাদশ শতক (সী–চ–আ–দে), তিনটি তো লেখকেরা নিজের কালের মাত্র শ-খানেক বছর আগের ব্যাপার (চ–আ–দে)।

ইতিহাসকে অবলম্বন করার আগ্রহ খুবই গভীর। এর মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্টতা আছে–

১. ইতিহাসের প্রবল ঘটনাবেগ, হৃদয় ও প্রবৃত্তির আবেগ, পটভূমির ঐশ্বর্য লেখক কাজে লাগিয়েছেন। সুনির্দিষ্ট তথ্যচয়নে তাঁর আসক্তি নেই। সাধারণ ভাবে পুরনো কালের অনুষঙ্গ বজায় রাখাই লক্ষ্য।
২. ইতিহাসকে কল্পনার সঙ্গে মেশানো – যেখানে ঐতিহাসিকতার মাত্রা বেশি, সেখানেও কল্পনা অকৃপণ। প্রায়ই এদের মিলন ঘটে, মধ্যের সীমারেখা মুছে যায়।
৩. ক্রমে নিকট অতীতের দিকে ঝোঁক বেড়েছে, বর্তমানের মানব-সত্য থেকে যার দূরত্ব বেশি নয়।
৪. ইতিহাসের ছায়ায় পরিবার-জীবনের যে রূপ এসেছে–তা যেন একালেরও।
৫. জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতার লড়াই, গণবিদ্রোহের রূপ দিতে ইতিহাসের আড়াল অপরিহার্য বলে মেনেছেন।
৬. জাতির অতীত সম্বন্ধে একটা ভালোবাসাও এ জাতীয় প্রসঙ্গ নির্বাচনের উৎসে ছিল।

চার

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে শিল্পরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করা যাক।[৬]

উপন্যাসের প্লট তৈরির ব্যাপারে তিনি প্রায়ই 'পিরামিডে'র মতো আকৃতি গড়ে তুলতে চাইতেন। তাঁর গল্পের জীবনসমস্যা ঘটনা ও চরিত্রের দুই পায়ে সমান তাল রেখে চলতে চায়, অর্থাৎ ভেতরের মন আর বাইরের ঘটনা ঘনিষ্ঠ ও সাপেক্ষ হয়ে ওঠে।

৬. এ-বিষয়ে বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করেছি 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে : শিল্পীরিতি বইয়ে।

লেখকের একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় অভিপ্রায় থাকে এবং প্রায়ই তা দ্বন্দ্বমূল। সংঘাত ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, ব্যক্তিচিত্তের ভিতরে নিজের সঙ্গে, মানুষে ও ভাগ্যে, এবং সংঘাত ঘটনায়-ঘটনায়। ঘটনা-চরিত্রে অচ্ছেদ্য ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক। চরিত্র সর্বদাই ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে বা করতে চায়। নিয়ন্ত্রিত ঘটনার গতি চরিত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মানবপ্রবৃত্তি অনেকাংশে হলেও সর্বত্র অবশ্য মূল শক্তি নয়। অজ্ঞাত নিয়তি, অজানা কারণ, ঐতিহাসিক প্রয়োজন পরিণামের জন্য কখনো দায়ী হয়ে ওঠে।

এই পিরামিড-গঠন ঘটনা-প্রবৃত্তির ওঠানামায় অনেক ভাঙচুর থাকে, শীর্ষ মাঝখানে সুস্থির না-ও থাকতে পারে; দুই ধারের ঢাল একই রকম না-ও হতে পারে। কাহিনী, মানুষ ও শিল্পীর লক্ষ্য অনুযায়ী এইসব বৈচিত্র্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে আরও স্বাদু করে তোলে। বহুক্ষেত্রে কোনো তল নির্দিষ্ট আকৃতির বাইরে প্রসারিত হয়, কখনও তা উপকাহিনী হয়ে ওঠে, কখনও উপকাহিনী একটি স্বতন্ত্র পিরামিডের চেহারা নেয়।

দুর্গেশনন্দিনী। তিলোত্তমার প্রতি জগৎসিংহের আকর্ষণকে কেন্দ্র করে মূল প্লট তৈরি। আয়েষার বাসনা তার উপপ্রসঙ্গ এবং আয়েষার প্রতি ওসমানের প্রেম।

কপালকুণ্ডলা। কপালকুণ্ডলাকে কামনা করেছে নবকুমার–তারই ভিত্তিতে প্লট তৈরি, এই কামনার পর্যাবসানে উপন্যাস শেষ। মতি এই প্লটে জটিলতা এনেছে–তাকে আশ্রয় করে একটি ঐতিহাসিক উপপ্রসঙ্গে প্লট প্রসারিত।

মৃণালিনী। মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের প্রণয় কাহিনীর পিরামিড রচনা করেছে। পশুপতি-মনোরমা সম্বন্ধ একটি প্রায়-স্বাধীন উপকাহিনী – পৃথক পূর্ণাঙ্গ আকার তার।

বিষবৃক্ষ। নগেন্দ্র-কুন্দ–সূর্যমুখীর মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত চিত্ত, এখানে প্লটের বীজ-এর বিকাশই কাহিনী-বিস্তার। হীরা-দেবান্দ্রাদির কামনা-বিক্ষোভ উপবস্তু, পুরো কাহিনীর রূপ নেয়নি।

চন্দ্রশেখর। প্রতাপের প্রতি শৈবলিনীর প্রেম– মুখ্য বিষয়, তার অগ্রগতি ও সমাপ্তি নিয়ে গল্প গড়ে উঠল। দলনী-মীরকাশিম ইতিহাসের পটভূমি শুধু আনেনি একটি পৃথক পূর্ণ পিরামিড আকার নিয়েছে।

রজনী। শচীশের প্রতি অন্ধবালিকার ভালোবাসা উপন্যাসের গঠনভিত্তি। লবঙ্গ-অমরনাথের পূর্বকাহিনী উপপ্রসঙ্গ।

কৃষ্ণকান্তের উইল। গোবিন্দলালের বাসনা ও বিবেক ভ্রমর-কাহিনীতে বিভক্ত। এই উৎসে কাহিনী সংগঠন।

আনন্দমঠ। সন্তানদল ও সরকারের দ্বন্দ্বে তার কেন্দ্র। এর আরম্ভ শীর্ষ ও পরিণতিতে যে পিরামিড গড়ে উঠেছে তারই অভ্যন্তরে আরও দুটি স্বতন্ত্র আকার দেখা যায়। ভবানন্দের বাসনা ও কল্যাণীর প্রতিরোধের সংঘাতে একটি এবং শান্তি-জীবানন্দের সম্বন্ধ নিয়ে আর একটি। অথচ এদের উপকাহিনী বলা চলে না।

দেবীচৌধুরাণী। প্রফুল্লের দেবীরানীতে রূপান্তর এবং নিজের পূর্বরূপে ফিরে আসা নিয়ে গড়া এই উপন্যাসের ভিত্তিতেও প্রণয়ই নিয়ন্ত্রণী শক্তি – ব্রজেশ্বরের প্রতি প্রফুল্লের ভালোবাসা। কাহিনীর বিস্তার কাহিনীদেহে সংশ্লিষ্ট ভূমিখণ্ডমাত্র – স্বতন্ত্র আকার নেয়নি।

সীতারাম। শ্রীর প্রতি বাসনা নায়কের উত্থানে-পতনে ক্রিয়াশীল। গঙ্গারামের লালসা মূল কাহিনীগঠনের ভিতরের একটি ক্ষুদ্র আকার – পৃথক চেহারা নিয়েছে।

ইন্দিরা। লঘু সুরে-বাঁধা ইন্দিরার স্বামী-সমাগমে যাত্রা কিছু দুঃখ-সুখের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চরিতার্থ হয়েছে। এর বাধা বাইরে থেকে এসেছিল। আকৃতিটিও নানা প্রসঙ্গের সংযোগে গড়া।

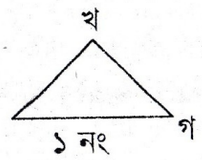
রাজসিংহ। রাজনৈতিক সংঘাত বিশেষ ঘটনার আশ্রয়ে বাসনা (চঞ্চলের দিক থেকে) ও ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়ে পিরামিডের মতো রূপ নিয়েছে – যদিও ইতিহাসাশ্রয়ী যুদ্ধাদি চারধারে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ। জেবুন্নিসা গঠনও স্বাধীন ও সম্পূর্ণ।

বঙ্কিমের উপন্যাস-দেহকে পিরামিড বলেছি, আসলে সেগুলি প্যাসন-পিরামিড। শেক্সপিয়রের নাটক থেকে এর আদর্শ তিনি আত্মসাৎ করেছিলেন এবং ঔপন্যাসিকের স্বাধীনতায় তাকে ব্যবহার করেছেন।

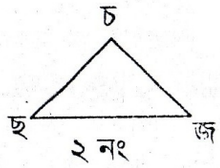
অনেকে প্লট গঠনের এই ভঙ্গিকে বৃত্ত বলেন। না বলাই ভালো। বৃত্তে উঁচুনিচুর ক্রম নির্দেশ করা যায় না, আরম্ভের বিন্দু ঘুরে এসে সেখানেই শেষ হয়। পিরামিডের চেহারায় দেখা যায়, সমস্যা বেড়ে গিয়ে চূড়ায় উঠেছে, নেমে পরিণতিতে মাটি ছুঁয়েছে, – যে ভূমিতে আরম্ভ সেই ভূমিই বটে, তবে অন্যত্র। শুরু যেখান থেকে, শেষ সেখানে এসে নয় – নিয়ে যায় অন্য কোথাও–অভাবিত কোনো স্থানে।

অঙ্গিক-পিরামিড এবং প্রণয়-ত্রিভুজ (আগে 'তিন'-এর আলোচনায় '১' এর 'ছ' দ্রষ্টব্য) নক্শা আঁকলে দেখতে একরকম হলেও একেবারেই পৃথক ধারণা। প্রথমটি শিল্পরূপের অন্তর্গত, দ্বিতীয়টি বিষয়বোধের। তিন নরনারীর পারস্পরিক প্রণয়ভিত্তিক সম্পর্ক উপন্যাসে পিরামিডের আকার নাও নিতে পারে। নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে')। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার প্রণয়-ত্রিভুজ নেই, কিন্তু এর প্লটের চেহারা পিরামিডের। অথবা সীতারামে।

স্ট্রাকচারাল পিরামিড



প্রণয় - ত্রিভূজ



একটি উদাহরণ নিয়ে পার্থক্যটি বুঝতে চেষ্টা করি।

উপন্যাস : বিষবৃক্ষ।

২ নং চিত্র। চ = নগেন্দ্রনাথ। ছ = সূর্যমুখী। জ = কুন্দ। চ এবং ছ, চ এবং জ, অর্থাৎ নগেন্দ্র সূর্যমুখী, নগেন্দ্র কুন্দ এদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ। এবং মুখ্যত ঐ আকর্ষণের জন্যই ছ এবং জ অর্থাৎ সূর্যমুখী-কুন্দ এদের দুজনেরও পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা ক্রোধ বিরক্তি ভয় প্রভৃতি মনোভাব। ত্রিভুজটি শুয়ে আছে সমতলে। এর শীর্ষ বিন্দুও একই তলে স্থিত।

১ নং চিত্র। ক – নগেন্দ্রের হৃদয়-সমস্যার এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনার সূত্রপাত। খ – সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ অর্থাৎ নগেন্দ্রের হৃদয়-সমস্যার ক্লাইম্যাক্স। গ – কুন্দের মৃত্যু-নগেন্দ্রের সমস্যার সমাপ্তি। ক—খ—গ। হৃদয়াবেগ ও ঘটনাধারা আরম্ভ থেকে ক্লাইম্যাক্সে উপরে উঠেছে, ক্লাইম্যাক্স থেকে সমাপ্তিতে নেমে আসছে। খ-এর উঁচুতে – এই আকৃতির চূড়ায়। কারণ পিরামিড দাঁড়িয়ে আছে, এমন কল্পনা করে নিতে হবে।

বঙ্কিমের শিল্পরীতির অন্যান্য প্রসঙ্গে আসা যাক।

তাঁর রোমান্সগুলি তো বটেই, সামাজিক উপন্যাসও ঘটনাবহুল – তীব্র প্রবল ও বর্ণবন্ত। দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ বিষয়ে তাঁর রুচি নেই। তাঁর বিশ্বাস – প্রবৃত্তির গাঢ় তরঙ্গ অনুরূপ। ঘটনার আধারেই যথাযথ প্রকাশিত হতে পারে। রোমান্সে ঐতিহাসিক চঞ্চলতা যুদ্ধবিগ্রহের প্রাচুর্য। সামাজিক উপন্যাসেও পিস্তলে বা বিষপ্রয়োগে মৃত্যু ইত্যাদির মতো ঘটনা রয়েছে। তবুও প্রথম শ্রেণীর তুলনায় উত্তালতার মাত্রা ণ।

উপন্যাস ঘটনাধারাকে বিন্যস্ত করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিয়মনিষ্ঠ। খণ্ডে, খণ্ডার্গত পরিচ্ছেদ – কখনও শুধুই পরিচ্ছেদে বিভক্ত, ক্রমবিকশমান, গূঢ় তাৎপর্যপূর্ণ সুশৃঙ্খল সজ্জা তিনি পছন্দ করেছেন। প্রায় নাট্যদৃশ্যের মতো স্থানিক নির্দিষ্টতা পরিচ্ছেদগুলিতে লভ্য। অবশ্য প্রয়োজনবোধে একই পরিচ্ছেদে একাধিক স্থান বা চলমানতা উপস্থাপনে সঙ্কোচ নেই। অর্থাৎ নাট্যরীতি তাঁর সহায়ক, নিয়ামক নয়। কখনও তৈরি হয়েছে কালগত ঘনিষ্ঠ নৈকট্য। ফলে এসেছে তীব্র অখণ্ড একাগ্রতা। বিশালতার প্রয়োজনে কালের সংহতির দিকে তাকানো হয়নি অনেক সময়ে। কাহিনী-বিন্যাসে আরও কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ হলো–

ক. সাদৃশ্যে বৈপরীত্য। আপাত সমান্তরাল ঘটনা ও চরিত্রের আভ্যন্তর বিসদৃশ ভাবসৃষ্টি।

খ. পশ্চাৎদৃষ্টি বা ফ্লাসব্যাক রীতিতে আগের ঘটনা পরে বলা। আবার ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গের ছায়াপাত (কিছুটা অতিলৌকিকতা-আশ্রয়ী, কখনও আধা মনস্তাত্ত্বিক। কখনও জ্যোতিষীর উক্তি অবলম্বনে)। গ. গুপ্ত পরিচয় নিয়ে কৌতূহল সৃষ্টি ও রহস্যোদ্ভেদ। ঘ. মুখ্য পাত্রপাত্রীদের দীর্ঘ অনুপস্থিতি। ঙ. মাঝেমাঝে গূঢ় ইঙ্গিত ও দ্যোতনা। চ. গম্ভীর গল্পে কৌতুকের উপাদান।

এই সব কৌশল প্রয়োগের বৈচিত্র্য এবং নিপুণতা রচনাগুলির শিল্পোপভোগের মাত্রা বাড়িয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে একটি বড় সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে রোমান্সগুলির ক্ষেত্রে। এর দুটি দিক। এক. ইতিহাস ও কাল্পনিক প্রসঙ্গের একটা আনুপাতিক সম্পর্ক রক্ষা।

দুই. ইতিহাসের ঘটনাবর্তকে ব্যক্তিগত-মানবিক কাহিনীতে রূপান্তরিত করা। প্রথম ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি ইতিহাসকে কখনও পিছনে কখনও দূরে, আবার সামনেও এনেছেন। কল্পনার সঙ্গে তার অনুপাতের বদলও ঘটেছে। কিন্তু সর্বদা সে-অনুপাত পূর্বোক্ত দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে।

বিবৃতি বর্ণনা ও সংলাপের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানে তাঁর শৈলী উচ্চাঙ্গ নিপুণতা দেখিয়েছে। সংলাপে সংক্ষিপ্ত বাক্যাংশের দ্রুতগতি এবং সোজাসুজি পাত্রপাত্রীকে পাঠকের সামনে ধরে দেওয়া তাঁর একটি বিশিষ্টতা। নাট্যরীতি প্রত্যক্ষত আত্মস্থ করা হয়েছে এখানে।

তাঁর উপন্যাসে বর্ণনার অতিবিস্তার নিয়ে যে অভিযোগ আছে তা ভিত্তিহীন। বরং অধিকাংশ বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। কখনও বিস্তৃত বা অলঙ্কৃত বর্ণনা কোনো গভীরতর উদ্দেশ্যেই এসেছে, অকারণ কবিত্বে তাঁর আস্থা নেই, তরল উচ্ছ্বাসকে তিনি যত্নে সংযত করতে চেয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের বর্ণনাকে বিষয় হিসেবে দুইভাবে দেখা যায় –

ক. পরিবেশ : ১. প্রকৃতি, ২. গৃহ-আসবাব প্রভৃতি।

খ. মানুষ : ১. রূপ, ২. পরিচ্ছদ-প্রসাধন।

প্রথম ক্ষেত্রে পটভূমির ভাব ও স্বাদ গড়ে তোলাই লক্ষ্য। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রায়ই মানব-স্বভাবের অন্দরে প্রবেশ লেখকের উদ্দেশ্য।

লক্ষ্য করার মতো, বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি বিশেষ উপাদানকে নানা উপন্যাসে ব্যবহার করেছেন। কোথাও তাদের প্রয়োগ বহিরঙ্গ, ক্বচিৎ স্থূল। আবার অনেক সময়ে গভীর তাৎপর্যবহ। উপাদানগুলি হলো – ১. চিঠি ২. উইল ৩. গান ৪. ছড়া ৫. স্বপ্ন ৬. অতিলৌকিক সঙ্কেত ৭. জ্যোতিষীর গণনা ৮. সন্ন্যাসী-মহাপুরুষ।

লেখকের দৃষ্টিকোণ উপন্যাসের শিল্পরীতিতে একটি গুরুতর প্রশ্ন। শুধু দৃষ্টিকোণের পরিবর্তনে একই বিষয়বস্তু একেবারে ভিন্ন রূপ ও স্বাদ পাবে। দৃষ্টিকোণ অর্থে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব নয়। তিনি বিষয়টি কিভাবে তুলে ধরতে চান – সোজাসুজি বা কোনো পাশ থেকে, কৌণিক ভঙ্গিতে বিশেষ বিশেষ স্থানে আলো ফেলতে চান কিনা, কোনো বিশেষ পাত্রের মনোভাবের ফ্রেমে গোটা উপন্যাসকে বাঁধতে চান কিনা – এই ব্যাপারটিই দৃষ্টিকোণ কথাটির সাহায্যে বোঝাতে চেয়েছি।

বঙ্কিমচন্দ্র কতকটা নিরপেক্ষ দূরত্ব থেকে গোটা জীবনকে দেখতে চেয়েছেন। দেখার এই রীতি মহাকবির – অনাধুনিক উচ্চস্তরের নাট্যকারের। কাহিনীর সর্বত্র লেখকের এ দৃষ্টি প্রসারিত। যেন তিনি একটু উপর থেকে আলো ফেলে জীবনের পুরো মঞ্চটাকে উজ্জ্বল করে তুলতে চান। একটু দূর থেকে হলেও তাঁর মমত্ব সর্বব্যাপী, কিন্তু উচ্ছ্বসিত আসক্তিতে লিপ্ত নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে চ্যুতি সেখানে রচনার দুর্বলতা। কখনও নীতি বা ধর্মঘটিত উদ্দেশ্য আরোপিত হয়ে এই চ্যুতি ঘটিয়েছে; কোথাও সন্ন্যাসী জাতীয় চরিত্র তৈরি করে লেখক এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন।

বঙ্কিম কিন্তু মাঝেমাঝে পাঠকের সঙ্গে সরাসরি আলাপচারী। নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব থেকে এভাবে ঘটনাবর্তে নেমে-আসা শিল্পীচিত্তের কিঞ্চিৎ ব্যাকুলতার নিদর্শন।

দুটি উপন্যাসে ব্যতিক্রম : ইন্দিরা ও রজনীতে। প্রথম বইয়ে তরুণী নায়িকার এবং দ্বিতীয়টিতে একাধিক চরিত্রের চোখ দিয়ে কাহিনীটি দেখা। ফলে রচনাশৈলীতে স্বাতন্ত্র্য এসেছে। তবে এ সব ক্ষেত্রে শিল্পীর স্বল্পস্থায়ী বৈচিত্র্য-সন্ধান, এটি তাঁর কোনো মূল প্রবণতা নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত উপন্যাসের ভাষা অতিসচেতন মননের ফল। তার অধিকাংশ কথাই অপরিবর্তনীয়। ভাষার বেলায় বঙ্কিম মধ্যপন্থী – বিদ্যাসাগরী ও আলালী রীতির মিশ্রণ ঘটাতে চেয়েছিলেন, – এ সত্য তাঁর প্রবন্ধের ভাষা সম্বন্ধে কতক খাটে। কিন্তু উপন্যাস শিল্প। তার ভাষায় কোনো সাধারণ আদর্শ – সর্বজনীন অনুসরণযোগ্য রীতির খোঁজ করা চলে না। তা মূলত শিল্পীর ব্যক্তিগত এবং শেষ পর্যন্ত অনুকরণের বাইরে। এর আগে কৃষ্ণকমলের দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা অনেকটা শিল্প হয়ে উঠেছিল, যেখানে তিনি ভূদেবকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের ভাষা সরীসৃপের বংশে পাখি। তাঁর লেখায় বিচিত্র মনোভাব, প্রবৃত্তি-তরঙ্গ, রূপবর্ণনা বা ঘটনাগতি ফুটিয়ে তোলার জন্য নানা ধরনের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। কখনও ভাষা চঞ্চল দ্রুতগতি, কখনও মন্থর। কখনও বা বিপরীত লয়ের উত্থান-পতন। ছোট বড় নানা আকারের বাক্য তিনি মিশিয়েছেন, নানা জাতের শব্দে যোজ্যতা ঘটিয়েছেন। আবার প্রশ্নাত্মক-নির্দেশক-বিস্ময়বোধক বাক্য একে অপরের গায়ের উপর এসে পড়েছে এবং অর্ধসমাপ্ত বাক্যের প্রয়োগেও অভীষ্ট সিদ্ধ করতে চেয়েছেন।

সংলাপের ভাষায় নাটকীয় তৎপরতা, স্থিরচিত্রে ভাষার কৌশলে গতি আনা, সংক্ষিপ্ত কথায় গূঢ় ব্যঞ্জনা, স্বল্পদীর্ঘ বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা। তাঁর রচনার সাধারণ লক্ষণ। আবার ঐশ্বর্য প্রাচুর্য বর্ণাঢ্যতার লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য মাঝেমাঝে সে-ভাষা অলঙ্কৃতও। এবং স, ব বৈচিত্র্যের মধ্যে একটা সংযত পৌরুষ এ ভাষার সুস্থির মেরুদণ্ড।

যে-পদ্ধতিতে লেখক চরিত্রগুলি গড়েন এই প্রসঙ্গে তাও সংক্ষেপে নির্দেশ করা যেতে পারে।

১. প্রধানত প্রত্যক্ষ ঘটনা, ক্রিয়া ও কথাবার্তায় এক একটি মানুষকে নাটকীয় কায়দায় সামনে ধরে দেওয়া। কখনও তীব্র ঘটনা-বিস্ফোরণ কিংবা আবেগ-তাড়িত সংলাপের অগ্ন্যুৎপাতে হৃদয়ের গভীর গোপন অংশটি উদ্ঘাটিত এবং চরিত্রের নবতর পরিচয় প্রকাশিত।

২. পাত্রপাত্রীর ভাবনা ব্যক্ত করা। কখনও মনের বিশেষ অবস্থার কিছু ব্যাখ্যান। ক্বচিৎ ভিন্নমুখী একাধিক মনোবৃত্তির উপস্থাপনায় বিশ্লেষণী প্রয়াস। এই উদ্দেশ্যে 'সুমতি-কুমতি'র কথোপকথন জাতীয় প্রসঙ্গের অবতারণাও হয়েছে।

৩. চিঠির সাহায্যে মনের সচেতন স্তরের ব্যাখ্যা। স্বপ্নের মধ্য দিয়ে তির্যক ভঙ্গিতে মনের গোপন স্তরের উদ্ঘাটন।

৪. রূপ-বর্ণনায় মূল ভাব প্রকাশ।

এছাড়া আরও নানা গৌণ কৌশল স্থানবিশেষে প্রযুক্ত হতে দেখি।

বঙ্কিমচন্দ্র অতি সচেতন শিল্পী ; সতর্কভাবে উপন্যাস গড়েছেন। বাংলা উপন্যাস এভাবে শুরুতেই একটা বিশিষ্ট ব্যাপক ও বিচিত্র আঙ্গিকে সুস্থিত হয়েছিল।

পাঁচ

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৬৫ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত আটাশ বছর উপন্যাস লিখেছেন, – ২৭ বছর বয়সে শুরু, শেষ ৫৫ বছরে। এই সময়ে বাংলার রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসে নানা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ঘটেছে। লেখক বঙ্কিমের বয়স বেড়েছে, মনেও কিছু-না-কিছু পরিবর্তন এসেছে। তাঁর উপন্যাসের পর্ববিভাগ এই দ্বিমুখী পালাবদলের ফল। পর্ব চারটির একটি তুলনামূলক ছক এখানে দেওয়া হলো।

প্রথম পর্ব ১৮৬৫-৬৯ ৩টি গ্রন্থ	দ্বিতীয় পর্ব ১৮৭৩-৭৮ ৪টি গ্রন্থ +১টি খসড়া	তৃতীয় পর্ব ১৮৮২-৮৭ ৩টি গ্রন্থ	চতুর্থ পর্ব ১৮৯৩ ২টি গ্রন্থ
১.ক. ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স প্রথম পর্ব ১৮৬৫-৬৯ ৩টি গ্রন্থ	১.ক. মাত্র ১টি ই.রো. – উপকাহিনীতে দ্বিতীয় পর্ব ১৮৭৩-৭৮ ৪টি গ্রন্থ ১টি খসড়া	১.ক. ইতিহাসাশ্রয়ী রো তৃতীয় পর্ব ১৮৮২-৮৭ ৩টি গ্রন্থ	১.ক. পুরনো খসড়ার পূর্ণাঙ্গ নবরূপ–১টি ই.রো. চতুর্থ পর্ব ১৮৯৩ ২টি
খ. ইতিহাস – দূর অতীতের গ. ১টিতে স্বদেশ প্রেমের স্পর্শ	খ. ইতিহাস–মাত্র শত বৎসর আগের গ. স্বাধীনতা রক্ষায় ইংরেজ বিরুদ্ধতা	খ. ইতিহাস–অষ্টাদশ শতকের গ. স্বাধীন রাজ্য গঠনের চেষ্টা– ১টিতে নবাবী ফৌজের সঙ্গে, ২টিতে ইংরেজের সঙ্গে সংঘাত ঘ. লেখকের বিশেষ জীবনাদর্শ–নিষ্কামকর্ম ও পূর্ণ মনুষ্যত্ব নব রাজ্যগঠনের মূলে	খ. ইতিহাস–রাজপুত মোগল সংঘাতের, সপ্তদশের শেষভাগ গ. মোগলদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজপুতদের স্বাধীনতা রক্ষার যুদ্ধ
	২.ক. সামাজিক উপন্যাস- খ. সমাজ সমস্যার গভীরে ও ব্যক্তি রহস্যের মূলে প্রবেশ গ. ১টি সমাজ–চিত্রের খসড়া		২.ক. পুরনো সংক্ষিপ্ত গল্পের বিস্তৃত নবরূপ– ১টি সামাজিক উপন্যাস খ. লঘু মেজাজের
৩. প্রেম বনাম অদৃষ্ট ২টিতে	৩. প্রেম বনাম সামাজিক মূল্যবোধ,– ১টি উপকাহিনীতে মাত্র প্রেম বনাম অদৃষ্ট	৩. প্রেম বনাম আদর্শবাদ	৩. মাত্র ১টি উপকাহিনীতে প্রেম বনাম সামাজিক মর্যাদা তথা অদৃষ্ট
৪. ১টি কমেডি ১টি ট্র্যাজেডি ১টি ট্র্যাজ-ডি কমেডি	৪. ট্র্যাজেডি ৩টি কমেডি ১টি (ট্র্যাজিক স্পর্শসহ)	৪. কমেডি ১ ট্র্যাজেডি ১ মহাকাব্যিক রচনায় ট্র্যাজেডি কমেডির নানাতরঙ্গ	৪. সামাজিক লঘু কমেডি ঐতিহাসিক কমেডি– ট্র্যাজিক উপকাহিনী

প্রথম উপন্যাসে লেখক রচনাগত পরীক্ষা ও প্রয়াসের মধ্য দিয়ে গল্পকথন, নানারকম মানুষগড়া এবং ভাব-স্বাদ সঞ্চারণে সিদ্ধি চেয়েছেন। পরবর্তী লেখায় আর প্রস্তুতির সাধনা নেই। শিল্প হিসেবে দুর্গেশনন্দিনী থেকে একপায়ে কপালকুণ্ডলার শীর্ষে পৌঁছলেন। তারপরে কখনও পূর্ণতা, কখনও অতি নতুন ভাব ও রীতির চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন – কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষার পর্ব প্রথম উপন্যাসেই শেষ।

প্রথম পর্বকে মোটামুটি ভাবে শুদ্ধ ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্সর কাল বলা যায়। দ্বিতীয় পর্ব সামাজিক উপন্যাসের। তৃতীয় পর্ব স্বাধীনতা-চেতনা তথা জীবনাদর্শ সন্ধানের। চতুর্থ পর্ব বিদায়-পূর্ব সৌন্দর্য-স্বপ্ন।

নবযুগের মানবিক চেতনা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ বঙ্কিমের রচনামাত্রের আভ্যন্তর ধর্ম। সে-কথা ছেড়ে দিলে প্রথম পর্বে সমকালীন সমাজের প্রতিফলন নেই। সাধারণভাবে দেশপ্রীতির যে আবহাওয়া ছিল তার সুর মৃণালিনীতে ক্ষীণভাবে বেজেছে। কপালকুণ্ডলার কথা মনে রাখলে বলা যায়, এই সময়ে বঙ্কিম শিল্পী হিসেবে পূর্ণজাগ্রত, কিন্তু সমাজচিন্তায় প্রবেশ করেননি, সেরূপ আগ্রহও জাগেনি। উল্লেখ করা চলে এ পর্যন্ত তিনি কোনো প্রবন্ধ লেখেননি। সে-কারণে লেখকের জীবন-জিজ্ঞাসা গভীরতম হয়ে উঠেছে যেখানে প্রেম ভাগ্যতাড়িত (মৃ) বা অমানবিক বিশ্ববিধানের আঘাতে বিপর্যস্ত (ক)।

দ্বিতীয়-তৃতীয় পর্বে দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক জীবন কিছু সোচ্চার হয়েছে, নানা সংগঠন গড়ে উঠেছে, পত্রিকা নাট্যশালা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একটা ইংরেজ-বিরোধী বা সমালোচনার আন্দোলন দেখা দিয়েছে। আগে থেকে ছিল হিন্দু পেট্রিয়ট, ন্যাশনাল পত্রিকা – অমৃত বাজার পত্রিকা হয়ে উঠল বলিষ্ঠ সহযোগী। আরও কতকগুলি ঘটনা।

ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭২। নতুন পেনাল কোড (ইউরোপীয়দের পৃথক বিচারব্যবস্থা) ১৮৭৩। ইন্ডিয়া লীগ ১৮৭৫। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ১৮৭৬। ড্রামাটিক পারফর্মেন্স আইন (নাট্যনিয়ন্ত্রণ) ১৮৭৬। ভার্নাকুলার প্রেস আইন (সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ) ১৮৭৮। অস্ত্র আইন (দেশীয়দের অস্ত্রধারণ নিষেধ) ১৮৭৯। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স ১৮৮৩। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ১৮৮৫।

দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসে এইসব ব্যাপারের প্রতিক্রিয়া ঘটেনি। কিন্তু সামাজিকভাবে বঙ্কিম উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করে নব্যমনের নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। স্বাধীনতা-চেতনা জাতীয় ইতিহাসবোধের সঙ্গে ইউরোপের পজিটিভিজম ও হিতবাদের মিশ্রণ ঘটিয়ে একটা সামাজিক জীবনবাদ গড়ে তুলছিলেন। অমরনাথের চরিত্র ছাড়া উপন্যাসে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রতিফলন নেই। কিন্তু এই সমাজ-চেতনা উপন্যাসকে শুদ্ধ রোমান্সের অতীত থেকে বর্তমানে নামিয়ে আনল। তাই এ পর্বে মিলল সমাজচৈতন্য ও প্রেমের দ্বন্দ্বে সৃষ্ট শ্রেষ্ঠ চরিত্রের ফসল।

এইগুলির প্রতিক্রিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে সদর্পে প্রকাশ পেয়েছে তৃতীয় পর্ব থেকে। দ্বিতীয় পর্বের চন্দ্রশেখরে ইংরেজ-বিরূপতার একটা স্তর ছিল। কিন্তু তৃতীয় পর্বের দুটি উপন্যাসে কোম্পানির বা কাজী-নবাবের অপশাসনের বিরুদ্ধে আদর্শ স্বাধীন রাজ্য গড়ার পরিকল্পনা মানবজীবনের পরম আদর্শের অঙ্গীভূত হয়েছে। তিনি তখন প্রচার-নবজীবন পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। অনুশীলনতত্ত্ব, কৃষ্ণ-চরিত্র লিখছেন। তাঁর ধর্মতত্ত্ব জীবনবিবিক্ত সাধনা ছিল না। আদর্শ মনুষ্যত্বই তাঁর ধর্ম এবং তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী স্বাধীন আদর্শ রাজস্থাপনের স্বপ্ন। সরাসরি উপন্যাসে এইসব চিন্তা প্রতিফলিত হলো। কিন্তু শিল্পী বঙ্কিম মানবচিত্তে কামনার অমোঘ শক্তিকে কখনো তুচ্ছ ভাবেননি। তাই দেখি, আদর্শের সঙ্গে প্রেমের সংঘাত।

চতুর্থ পর্ব আসলে পূর্বের অনুক্রমণ। মৃত্যুর ঠিক আগের বছর দুটি ছোট পুরনো লেখা নতুন করে ছেপে বের করার প্রয়োজন দেখা দিল। বঙ্কিম সংশোধন করতে গিয়ে যেন নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা বোধ করলেন। মোহিতলাল এই পর্বের লেখাকে বলেছেন তাঁর 'সোয়ান সং'। বাইরের সমাজ চেতনা রাজনৈতিক অভিপ্রায় মানবজীবনসম্পর্কিত তত্ত্ব – সব কিছু থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের শুদ্ধ লঘু কৌতুকে মেতে উঠতে (ই) কিংবা প্রেমই নিয়তি – চরিত্রই নিয়তি – এই জীবনরহস্যে স্নান করতে (রা) চাইলেন। অবশ্য শেষের বইটিতে স্বদেশপ্রেম হিন্দুত্ব প্রভৃতির ছিঁটেফোঁটা স্পর্শ থেকে গেল।

ছয়

কতকগুলি গুরুতর সামাজিক। প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভূমিকা নিয়ে বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে নানা সময়ে কথা উঠেছে। প্রধানত চারটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা চলে –

১. মুসলমানদের প্রতি মনোভাব
২. ইংরেজ শাসকদের প্রতি মনোভাব
৩. জমিদার-শ্রেণী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি
৪. নীতি-বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি।

এর কোনো কোনোটি নিয়ে বঙ্কিম প্রবন্ধ লিখেছেন। সেখানে তাঁর যুক্তি এবং সিদ্ধান্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলির বিশ্লেষণ বা সংক্ষেপকরণ এ-আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। উপন্যাসে ঐসব একমুখী সিদ্ধান্ত অনেক সময় বেঁকে যায়, জটিল হয়ে ওঠে। তার মধ্যে তাকানো আমার অভিপ্রায়[৭]।

মুসলমান নরনারী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস অনেক। ছ-টি উপন্যাসই মুসলমান নবাব-বাদশাহদের আমলের। একটি সামাজিক উপন্যাসের অবশ্য উল্লেখ্য মুসলমান চরিত্র নেই। যে দুটি ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগের প্রজা-আন্দোলনকে রূপ দিয়েছে তাতেও উল্লেখ করার মতো মুসলমান কেউ নেই।

৭. এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি কয়েকটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধে। 'বঙ্কিমচন্দ্র, বাস্তবতা এবং' বইটি দ্রষ্টব্য।

সীতারামে মুসলমান কাজী-ফকিরের সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের ছবি আছে, গাঢ় বিরূপতার রঙে আঁকা। কাজী ও নবাবী ফৌজের বিরুদ্ধে প্রজাবিদ্রোহ, হিন্দু প্রজার। ঘোর ধর্মীয় অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায়ের লড়াই রূপে তা চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চেহারা নিয়েছে। ('সেই মহতী জনতা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একদিকে সব মুসলমান – আর একদিকে সব হিন্দু।') শ্রীর মুখে রণধ্বনি-'মার্–শত্রু মার্। দেবতার শত্রু, মানুষের শত্রু, হিন্দুর শত্রু – আমার শত্রু-মার্।' সীতারামের স্থাপিত রাজ্যকে 'স্বাধীন হিন্দু রাজ্য' বলা হয়েছে। ('আবার এক্ষণে জনরব উঠিল যে, সীতারাম হিন্দু রাজধানী স্থাপন করিতেছেন, ইহা শুনিয়া দেশবিদেশে যেখানে মুসলমানপীড়িত, রাজ্যভয়ে ভীত বা ধর্মরক্ষার্থে হিন্দুরাজ্যে বাসের ইচ্ছুক, তাহারা সকলে দলে দলে আসিয়া সীতারামের অধিকারে বাস করিতে লাগিল।') এই হলো বঙ্কিম উপন্যাসে সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান বিদ্বেষের চূড়ান্ত নিদর্শন। অবশ্য সীতারাম রাজ্যস্থাপন প্রসঙ্গে চাঁদ শাহের কথা উল্লেখ করা সঙ্গত। ('এই সময়ে চাঁদ শাহ নামে একজন মুসলমান ফকির, সীতারামের সভায় যাতায়াত আরম্ভ করিল। ফকির বিজ্ঞ পণ্ডিত, নিরীহ এবং হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী। তাঁহার সহিত সীতারামের বিশেষ সম্প্রীতি হইল।') সীতারামের চরম অধঃপতনের পরে ফকির মক্কায় চলেছে, তীর্থ যাত্রায় নয় – বঙ্কিম তাঁকে দিয়ে বলিয়েছেন, 'যে দেশে হিন্দু আছে সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।'

অন্য উপন্যাসগুলির মধ্যে মৃণালিনীতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সম্ভবত কেউ আবিষ্কার করবে না, কারণ কোনো রূপ যুক্তি যোগাড় হবে না। মুসলমানদের বাইরে থেকে এসে নবদ্বীপ জয়ের যে চিত্র আছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদ সেক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ঔপন্যাসিককে লক্ষ্মণসেনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করেছে।

রাজসিংহ আক্রমণকারী মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে রাজপুত রাজার স্বাতন্ত্র্যরক্ষার যুদ্ধ। বইয়ের বিজ্ঞাপনে ঘোষিত হয়েছিল 'হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য।' লেখক পক্ষপাত ঢেকে রাখেননি। কিন্তু ঔরংজীবের চরিত্রাঙ্কনে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে ইতিহাসবিকৃতি ঘটেছে এরূপ অভিযোগ স্বীকার্য নয়। চঞ্চলকুমারী ঔরংজীবের ছবি পায়ে ভেঙেছিল হিন্দুবিদ্বেষী বাদশাহের প্রতি ক্রোধে, নায়িকার এই তেজস্বিতা ও উগ্র হঠকারিতা কাহিনীর প্রয়োজনীয় ভিত্তি। একে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা শিল্পের দিক থেকে অবান্তর।

আর মুসলমান নবাব মীরকাশিমকে বঙ্কিম ইংরেজবিরোধী যুদ্ধের নেতারূপে গৌরবময় ভূমিকায় স্থাপিত করেছেন চন্দ্রশেখর উপন্যাসে – এ তথ্যও মনে রাখা সঙ্গত।

প্রসঙ্গত ভাবার, এদেশে আধুনিক মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল দেরিতে। নব্য শিক্ষিত হিন্দুরাই বাংলার নবজাগরণকে ধারণ করেছিল। নব্য

জাতীয়তাবাদ এবং স্বাধীনতার বাসনা জন্মেছিল তাদেরই মননে। এ সবেরই ঐতিহাসিক কারণ ছিল, আর সেই কারণেই হিন্দুত্বের একটা বিশেষ রঙ এতে লেগেছে। সদ্য সমাপ্ত মুসলমান শাসনের ইতিহাসকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিদৃষ্টি আদর্শ রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলে মনে করেনি – মনে করাটাই মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা হত।

বঙ্কিমচন্দ্রে সাম্প্রদায়িক বোধ আধুনিক কালের মতো নয়, কিন্তু একালের মনোভাব একশ বছর আগের লেখায় খোঁজা মোটেই ঠিক নয়। তার চেয়ে বড় কথা, বঙ্কিম জটিল বা সোজা, ভালো-মন্দ,' ভালোয়-মন্দয়-মেশানো মানুষ গড়েছেন, তাদের সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের দ্বারা প্রভাবিত হননি। আয়েষা ওসমান কতলু খাঁ দলনী গুরগণ তকী মীরকাশিম মেহেরুন্নিসা মবারক জেবুন্নিসা দরিয়া উদিপুরী – মুসলমান নরনারীর এইসব সার্থক, প্রায়ই উচ্চাঙ্গের চরিত্রদৃষ্টি, – এমন কি ঔরংজীব-চরিত্রের আভ্যন্তর শূন্যতার আবিষ্কারও। এরা চক্রান্ত করেছে, উন্মাদের মতো ভালোবেসেছে, রূপের মোহ বিস্তার করেছে, সেই আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছে। কেউ-বা প্রেমে একনিষ্ঠ। কেউ শুধু ছলনাকারী। আসলে একজন শিল্পীর রচনার এরা সম্পদ সাহিত্যের মূল্যায়নে এই সাফল্যের পরে কিছু নেই। এখানে বঙ্কিমের পূর্ণ জয় – সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন এই স্তরে পৌঁছতে পারে না – এই মানবিক মনোরাজ্যের বিচিত্রতায়।

তিনটি উপন্যাসে ইংরেজ কোম্পানির কথা আছে। একটিতে তাদের জয়, অন্য দুটিতে তাদের অপাতপরাজয় হলেও শেষ পর্যন্ত জয়ের ইঙ্গিত। এ দেশে ইংরেজ শাসন দীর্ঘস্থায়ী হতে যাচ্ছে – তার বিরুদ্ধে কোনো সুস্পষ্ট সুগঠিত রাজনৈতিক সংগ্রাম নেই। কিন্তু পরাধীন জাতির মানস প্রতিরোধে তিনি আস্থাবান। তা ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতা-চেতনা গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে।

স্বদেশী ডাকাত দেবীচৌধ্‌রানী গৃহবধূ হয়ে বাড়ি ফিরেছে, ভবানী পাঠক দ্বীপান্তরে গিয়েছে, বিসর্জিত হয়েছে সন্তানদলের বিজয়সংগ্রামের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই সব স্ফুলিঙ্গ পাঠকমনকে উত্তপ্ত করে চলেছে অনেক কাল ধরে। বঙ্কিমচন্দ্রের সযুক্তিক সচেতন প্রবন্ধের সব দ্বিধাগ্রস্ত সিদ্ধান্ত ছাপিয়ে উঠেছে এই বোধ – বন্দেমাতরম গান, সত্যানন্দের উক্তি – 'সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন 'শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।'

জমিদারশ্রেণীর মানুষই তাঁর সামাজিক উপন্যাসের নায়ক, প্রধান পাত্রপাত্রী। এদের মধ্যে বিবেকবান উদার লম্পট প্রভৃতি নানা ধরনের চরিত্র আছে। তাদের শ্রেণীগত কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকট নয়, সব লক্ষণই ব্যক্তিগত। প্রজা-শোষণ ব্যাপারটাই অনুপস্থিত। 'বঙ্গদেশের কৃষক' বইয়ের চিন্তাধারার কোনো প্রতিফলন তাঁর উপন্যাসে নেই। মাত্র মুচিরাম গুড়ে এই শ্রেণীকে তীব্র ব্যঙ্গে আহত করা হয়েছে, সম্ভবত পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস হিসেবে এটি লেখা নয় বলেই। বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক মন সমাজবোধের এই বিশিষ্ট দিক সম্বন্ধে আশ্চর্যভাবে রুদ্ধদ্বার।

বঙ্কিমচন্দ্র নীতিবাগীশ – এ রকম একটা অভিযোগ আছে। এই অভিযোগ বর্তমান শতাব্দীর। তাঁর সমকালে অন্য আপত্তি ছিল – নীতিহীনতাকে বড় রমণীয় ভাবে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন।[৮] বোঝা যায় নীতিবিষয়ে ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতকের মননে পার্থক্য ঘটেছে। তিনি রোহিণীকে হঠাৎ নিশাকরে আসক্ত দেখিয়েছেন, গুলি করে মেরে ফেলেছেন, কুন্দ বিধবা হয়েও বিয়ে করেছিল বলে তার বিষ প্রয়োগে মৃত্যুর ব্যবস্থা হয়েছে, শৈবলিনীকে তিনি নরকদর্শন করিয়েছেন প্রভৃতি একালে অনেকের কাছে বঙ্কিমের অপরাধ বলে গণ্য। আসলে এ-বিষয়ে স্বতন্ত্র রায় দেওয়া চলে না, – শিল্প হিসেবে ঐসব ব্যাপার স্বাভাবিক ও মনস্তাত্ত্বিক কিনা তার বিচার দরকার। যেখানে তা নয় সেখানে লেখকের সিদ্ধি ঘটেনি; তখন কারণ হিসেবে নীতিবাগীশতকার দিকে আঙুল তোলা চলে। কিন্তু নীতিভ্রষ্ট পাপদষ্ট অনুশোচনাজর্জর নর-নারীই তো তাঁর সর্বোত্তম রচনা। তিনি পুরুষের নীতিচ্যুতিকেও পাপ বলে বুঝেছিলেন, মানুষের প্যাসনের শক্তিকে আবিষ্কার করেছিলেন, রমণীর স্খলনকে চারিত্রিক সমস্যা বলে দেখেছিলেন – পতিতালয়ে তাদের স্থান নির্দেশ না করে মনের রহস্যের মুখে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন। ফলে নীতির প্রশ্নটি সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রীর বিবেকের অংশ হয়ে উঠল। সমকালীন পাঠকের মূল্যবোধের কথা মনে রেখে এবং তার উপরে দাঁড়িয়ে এইভাবেই তিনি মধ্যযুগীয় নীতিবোধের প্রতিস্পর্ধী হয়েছেন, পাপপুণ্যের কথা ভুলে মানব-হৃদয়ের রূপে মুগ্ধচিত্ত শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

আমার সিদ্ধান্ত বঙ্কিমের উপন্যাসে যেভাবে বিষয়গুলি রূপ পেয়েছে তাতে তাঁকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক, ইংরেজ সমর্থক, জমিদারশ্রেণীর মুখপাত্র বা নীতিবাগীশ–এর একটি বিশেষণও দেওয়া চলে না।

যদি তিনি ঐসব লক্ষণাক্রান্ত হতেন, কিন্তু রচনা হত অভেদ্য তাহলেও সাহিত্যিক হিসেবে পুরো নম্বরই পেতেন।

যদি তিনি ঐসব দুর্লক্ষণে পীড়িত না হয়েও শিল্পে হতেন অসার্থক, তাঁকে প্রগতিচিন্তার মানুষ বলতাম, বড় শিল্পী বলতাম না।

বঙ্কিম খুব বড় শিল্পী এবং শিল্পে প্রকাশিত ঐসব সামাজিক ভাবনাও মূলত অশিথিল।

৮. 'নভেল বা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য ঃ চন্দ্রনাথ বসু'। প্রবন্ধটি 'সমালোচনা সাহিত্য' (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) গ্রন্থে সঙ্কলিত

৩ দুর্গেশনন্দিনী :
তৈরি-হবার পালা শেষ

এক

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাংলা উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী। এটাই ইতিহাস। এ ছাড়াও স্বয়ং বইটির মধ্যে এমন বেশ কিছু ব্যাপার আছে যা সাহিত্যের ইতিহাসে এর স্থান নিশ্চিত করেছে।

আগের যে কোনো উপন্যাসধর্মী বাংলা কাহিনীর তুলনায় দুর্গেশনন্দিনী পরিণত পূর্ণাঙ্গ বিস্তৃত লেখা। একই জাতের বলে প্রথমে অঙ্গুরীয় বিনিময় আর দুরাকাঙ্ক্ষের সঙ্গে তুলনার কথা মনে আসে। এখানে অঙ্গুরীয় বিনিময়ের মতো অন্যের রচনার উপরে দাঁড়িয়ে কল্পনার ডানা-মেলার চেষ্টা নেই। দুর্গেশনন্দিনী আদ্যন্ত মৌলিকতায় গর্বিত, সর্বত্র ব্যাপ্ত এক উজ্জ্বল উল্লাস। লেখক গোড়া থেকেই জানেন কি তাঁর লক্ষ্য এবং কিভাবে তা চরিতার্থ করবেন। ভূদেব অনুবাদ করতে বসে নতুন কাহিনী লিখে ফেলেছিলেন; কৃষ্ণকমলও এক কাল্পনিক কোঁতপন্থী যুবকের ভ্রমণকথা-ডায়েরি লেখার ছলে হঠাৎই এক উপন্যাস বানিয়ে ফেললেন। বঙ্কিম কিন্তু জানতেন কি লিখবেন, কেন লিখবেন; আর তার প্রথম সাধারণ বাধা রাজমোহন্‌স ওয়াইফেই ডিঙিয়ে এসেছিলেন।

দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র রীতিমতো কোমর-বেঁধে উপন্যাস লিখতে বসলেন। প্রথম বাংলা উপন্যাস লিখছেন। কিছু অপরিণতির দাগ অবশ্য আছে; কিন্তু দক্ষতাও সর্ব অঙ্গে। বড় মাপের দুর্বলতা গজপতি বিদ্যাদিগ্গজকে নিয়ে একটা পুরোদস্তুর উপকাহিনী গড়া, যার উদ্দেশ্য হাস্যরসের যোগান দেওয়া। দুর্গেশনন্দিনীর অন্য নানা ব্যাপারের পরীক্ষা যেখানে তাঁর নিজের শিল্পবোধের হাতে পাসমার্কা পেয়ে পরের বইগুলিতে আরও উঁচুতে উঠেছে, গজপতি সংযোজন যেখানে একেবারেই উতরাল না। বঙ্কিম বুঝলেন বাংলা উপন্যাস লেখার কাজে এই বস্তুটি চলবে না– এ জাতের হাসির রিলিফের পৃথক আয়োজন। পরে মাঝে মধ্যে লঘু হাওয়া বইয়ে দিতে বা কিছু সরসতার প্রয়োজনে মূল গল্পের ফাঁকে ফাঁকে অন্য ব্যবস্থা তাঁকে নিতে হয়েছে, (তারও কিছু পূর্বরূপ এ বইয়ে আছে। কিন্তু বিদ্যাদিগ্গজী বন্দোবস্ত আর নয়।

প্রথম উপন্যাস থেকে এটাই তাঁর বড় বিমুখ-শিক্ষা। না হলে গল্পবলার ধরন, ঘটনায় জট-পাকানো, সময়মতো খোলা, প্রয়োজনে তাতে নাটকীয় মোচড় দেওয়া, কখনও কাহিনীকে দ্রুত করা, কখনও মন্থর, মূল আর গৌণ প্রসঙ্গ মিশিয়ে দেবার কৌশল, ইতিহাসে-কল্পনায় সামঞ্জস্য ঘটানো বা রাজনৈতিক ইতিহাসকে ব্যক্তিত্বের

সংযোগে মানবিক কাহিনীতে বদলে নেওয়া– এসবের পাকা ভিত গড়ে উঠেছে দুর্গেশনন্দিনীতে।

ঠিক তেমনি দুর্গেশনন্দিনী গোড়া বেঁধে দিয়েছে সেই জিজ্ঞাসায়– ব্যক্তিত্বের মুক্তি কি মোহে, অথবা মোহই ব্যক্তির নিয়তি? নারীর স্বাধীনতা প্রেমে এবং শক্তিও? সামাজিক-নৈতিক পুণ্যের আঁটো দড়ি-দড়ায় জোর টান পড়ল এই প্রথম লেখা থেকে। উজ্জ্বল পাপের শৈল্পিক জয়ের শুরু চরিত্র স্বাতন্ত্র্যের পথ ধ'রে।

বঙ্কিমের উপন্যাসের কতগুলি প্রসঙ্গ-ঘটিত বিশিষ্টতা যা পরের লেখায় বার বার মিলেছে, কিন্তু প্রথম দেখা গেল এই প্রথম বইয়েই, এর কতক জন্মেছে ঔপন্যাসিকের আত্মিক প্রবণতায়, আবার কিছু নেহাত মুদ্রাদোষই।

১. নারীরূপ বর্ণনায় আগ্রহ। একাধিক পাত্রীর রূপের তুলনা। রূপচিত্রণের মধ্য দিয়ে স্বভাবের মূল খোঁজা। (বিমলা-তিলোত্তমা-আয়েষা-আসমানীর সৌন্দর্য)।

২. অতীত জীবনের গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন – তার সাহায্যে কাহিনীর গুরুতর প্রয়োজন-নির্বাহ। (বিমলা-অভিরাম-বীরেন্দ্র-তিলোত্তমার পূর্বকথা জানানো হয়েছে বিমলার চিঠির মধ্য দিয়ে। ওসমানের সঙ্গে বিমলার সম্পর্কের কথাও।)

৩. প্রেমবাসনাকে কোনো আদর্শের দ্বারা সংযমিত করা। (আয়েষার আচরণ।)

৪. প্রেমিকের পত্নীকে উপহার-দান। (আয়েষাকর্তৃক তিলোত্তমাকে অলঙ্কার দান।)

৫. রমণীর রূপ দেখে বিহ্বল সৈন্য বা প্রহরীশ্রেণীর পুরুষকে নিয়ে সংক্ষিপ্ত কৌতুক এবং তার মাধ্যমে উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা। (গড় মান্দারণে পাঠান সৈনিক-বিমলা সংবাদ।)

৬. সন্ন্যাসী মহাপুরুষের ভূমিকা–চিকিৎসক ও জ্যোতিষীরূপে বিশিষ্টতা, ঘটনাধারা ও প্রধান পাত্রপাত্রীর উপরে প্রভাব। (অভিরাম স্বামীর চরিত্র ও কার্য।)

৭. প্রদীপের আলোয় নারীরূপ দর্শন। (শৈলেশ্বর মন্দিরে প্রদীপ জ্বালবার পরে জগৎসিংহের তিলোত্তমাকে দেখা।)

৮. নারীর দেহগত পবিত্রতা-বিষয়ে সংশয়ী প্রেমিক বা স্বামীর কাছে শত্রু বা দুষ্কৃতকারীর স্বীকারোক্তি। (মৃত্যুকালে কতলু খাঁর উক্তি – জগৎসিংহের কাছে।)

৯. স্বপ্নের সাহায্যে মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা। রূপকাশ্রয়ী সরলতা এবং প্রতীকী জটিলতার মিশ্রণ লক্ষণীয়। (রোগশয্যায় তিলোত্তমার স্বপ্ন।)

এদের কোনোটি পরের দু-একটি বইয়ে, কোনোটি বারবারই পুনরাবৃত্ত। এ কারণেই বলব, বঙ্কিম দুর্গেশনন্দিনীতে আপনার ভিতরের ঔপন্যাসিককে পুরোই আবিষ্কার করলেন – প্রাথমিক প্রস্তুতির কাজ শেষ করলেন। পরের উপন্যাসে যেখানে ত্রুটি তা হাঁটতে-শেখার ফল নয়, দ্রুত চলা বা ভুল করার ফলে পতন।

আমি অবশ্য এমন কথা বলছি না বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস-ঘটিত সমস্যাগুলি সমাধান করে ফেলেছিলেন এই প্রথম লেখাতেই। কোনো খাঁটি লেখকের পক্ষেই তা হবার নয়।

বঙ্কিমের কাছে প্রায় প্রতিটি উপন্যাসই এক-একটা চ্যালেঞ্জ, জীবনকে বোঝবার আর ঠিকমতো সেই বোঝা না-বোঝা প্রকাশ করার। কিন্তু তৈরি হবার পালা দুর্গেশনন্দিনীর গায়েই যা একটু লেগে আছে – বেশি নয় যদিও, এবং পরে আর নেই।

দুই

উপন্যাসে যাদের কথা বলা লেখকের লক্ষ্য বলে মনে হয়, সর্বদাই শিল্পের আলোক-কেন্দ্র সেখানে নয়। এটা লেখকের অনিচ্ছায় ঘটে যেতে পারে, যেখানে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার ফাঁক থাকে শিল্পীর, যেমন দুর্গেশনন্দিনীতে। আবার লেখক খুব ভেবেচিন্তে সে কাজ করতে পারেন, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। উদাহরণ রাজসিংহ।

দুর্গেশনন্দিনীতে যাদের নিয়ে গল্প, সমালোচনার ভাষায় যারা নায়ক-নায়িকা– সেই জগৎসিংহ-তিলোত্তমা লেখকের মনোযোগ প্রায় সবটাই দখল করেছে। বিবিধ সদগুণে তাদের ভূষিত করা হয়েছে। তিলোত্তমার কমনীয় নব যৌবনের রূপ বর্ণনায় লেখক রামধনুর রঙ এবং প্রকৃতি-জগতের গন্ধস্পর্শাদির অপর্যাপ্ত পেলবতায় কলম ডুবিয়ে নিয়েছিলেন। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে এবং বাৎসায়নে 'মুগ্ধা নায়িকা'র যে সব লক্ষণ নির্দেশিত, লেখক প্রথম বইয়ে তার বাইরে পা দিতে সাহস করেননি। লজ্জাকাতর, মাধুর্য, নবপ্রণয়ের অস্ফুট রোমাঞ্চ, মৌন আত্মমগ্নতা, দুঃখের আঘাতে ছিন্নলতার মতো ভূলুণ্ঠিত কাতরতা। তিলোত্তমা পুরনো ভারতীয় আদর্শে গড়া নিষ্প্রাণ মূর্তিমাত্র – এ-অভিযোগ করা চলে না। কারণ এই স্থির বিদ্যুতে কটাক্ষ এবং নীরব চিত্তে শিহরণ আছে – তা আমাদের ভুলতে দেন না লেখক। কিন্তু এই তরুণী ভারতীয় সাহিত্যের পাঠকদের অপরিচিত নয়। সীতা-শকুন্তলায় এরই কিছু রকমফের আমরা দেখেছি। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং 'দ্রোপদী'[১] প্রবন্ধে এই শ্রেণীর নায়িকা চরিত্রের অজস্র সাদৃশ্য এবং সুলভতা লক্ষ্য করেছেন। নতুন যুগের নতুন সাহিত্যাঙ্গের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা যে উপন্যাসে তার নায়িকার আসনে কিন্তু নতুন মানবীকে পাওয়া গেল না। তিলোত্তমা আধুনিকা না হলেও চিরন্তনী – এ জাতের জবাবদিহি চলবে না। মানব-স্বভাবের মৌল বৃত্তি যদি কিছু থাকেও তা যুগের ব্যক্তির মাপে বদলেই চলেছে অবিরাম। বদলটা রূপ। রূপ ধরেছে যে বৃত্তি তাই চরিত্র, তাকে নিয়ে সাহিত্যের কাজ। তিলোত্তমা মোগল আমলের নারী, আধুনিকা নয় – এ যুক্তি চলল না। দুর্গেশনন্দিনী মোগল আমলের গল্পের পুনর্কথন নয়, আধুনিক উপন্যাস। এর পাত্রপাত্রীর ও জীবন বোধের শিকড়ে উনিশ শতকের শিক্ষিত নাগরিক বাঙালির চেতনা, রূপে সজ্জায়, ঘটনায়, মধ্যযুগের সঙ্গে সন্ধি করেছে। এবং শেষকথা বঙ্কিম যেখানে পুরনোকে জেনে ঐতিহ্যকে ভেঙেছেন সেখানেই বড়, তাকে মানার মধ্যে নয়। তিলোত্তমাকে দেখি অতীত থেকে নেমে আসা এক জীবন্ত ছবি, শত্রুর অন্তঃপুরে সে করুণ রসের আশ্রয়, পাঠককেও বেদনাবিদ্ধ করে। কঠিন রুক্ষ পৃথিবীর

১. বিবিধ প্রবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

কোনো আঘাত তার সহ্য হয় না। সম্পূর্ণ জীবনটাই তার পুষ্পাকীর্ণ আনন্দভূমি ছিল। এই সব কিছু তাকে উত্তপ্ত বর্তমান থেকে দূরে রেখেছে। জীবন্ত অথচ ফ্রেমে বাঁধা কাচে-ঢাকা ছবি।

জগৎসিংহকে নিয়ে সমস্যা আরও বেশি; সম্ভাবনার মুখে দাঁড়িয়েও নিরুচ্চার বলে সেখানে প্রত্যাশাভঙ্গের জন্য অখুশি হই। এখানেও সংস্কৃত সাহিত্যের (অবশ্যই রামায়ণ-মহাভারতের নয়, কালিদাসাদি কবি-নাট্যকারদের) আনুগত্য। ধীরোদাত্ত নায়কের যে ধারণা প্রচলিত তার সঙ্গে সামান্যত ধীরোদ্ধত নায়কের লক্ষণ মেশাতে হয়েছে – অবশ্য উদাত্ত নায়ককে ক্বচিৎ উদ্ধত করে তোলা শাস্ত্রসম্মত কিনা সে বিষয়ে সংশয় থাকা সত্ত্বেও। আসলে কোনো শ্রেণীবদ্ধ চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে যে তাঁর মানস-সন্তানদের ধরা সম্ভব হবে না, এ বিষয়ে মনস্থির করতে লেখকের আরও একটু সময় লেগেছে। জগৎসিংহের বীর্যবত্তার পরিচয় দেবার জন্য লেখককে কিছু পরিশ্রম করতে হয়েছে। সেনাপতির কুশলতা আছে কিনা তার প্রমাণ মেলেনি। তবে একটা আভিজাত্যের উচ্চতা গাম্ভীর্য পৌরুষ কৃতজ্ঞতা বিপদে স্থৈর্য প্রভৃতি মানবিক গুণ যে তার মধ্যে আছে এতে সন্দেহ করার কারণ ঘটেনি। প্রণয়ে ব্যাকুল, একনিষ্ঠ, বিরহে কাতর, ভদ্র ও সহানুভূতিশীল মাপসই নায়ক জগৎসিংহ। কিন্তু জগৎসিংহকে লেখক একটি সঙ্কটে ফেলেছেন, সংস্কৃত নাটকের নায়কদের জীবনে এ-জাতীয় নৈতিক ভাবনার সুযোগ ছিল না। তার প্রেয়সী নারী শত্রুর হাতে বন্দিনী এবং ধর্ষিতা, এই সংবাদে জগৎসিংহের যন্ত্রণা এবং অসহায় ক্রোধের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে ভাবীপত্নীর সতীত্বের প্রশ্ন। ভালোবাসা যতই গভীর হোক অসতী নারী বিবাহযোগ্যা নয় – এই সিদ্ধান্তে সে অবিচল। কতলু খাঁর মৃত্যুকালীন সাক্ষ্যে সেই সঙ্কট-সমাধানের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। কিন্তু তিলোত্তমার মাতা যে জারজ-কন্যা এই কথা জেনেও জগৎসিংহের ভাবান্তর হলো না, তাকে গ্রহণে প্রশ্নও জাগল না। একই সঙ্গে এই ধরনের আধুনিক উদারতা ও চূড়ান্ত রক্ষণশীলতা, ঔপন্যাসিক কি খেয়াল করেননি, অথবা দ্বিধার শিকার হয়েছেন?

জগৎসিংহ পাঠককে আরও একটু ভাবায় – আয়েষার প্রতি তার কি মনোভাব এই নিয়ে। আয়েষার সেবায় এবং রোগশয্যায় দীর্ঘকালীন সাহচর্যে ভদ্র নায়ক তার প্রতি সোচ্চার কৃতজ্ঞতা অনুভব করেছে। বেশ সরল এবং সামাজিক ব্যাপার। সে তিলোত্তমাকে ভালোবাসে, এবং সে একনিষ্ঠ, তাই তার মনে অন্য কোনো ভাবের আভাসমাত্র আসা সঙ্গত নয়, লেখক নিয়মাফিক তা জানেন। কিন্তু ঐ সুন্দরী যুবতী যখন সরবে নিজের ভালোবাসা ঘোষণা করল, কোনো প্রতিদান চাইল না এবং নীরবে তার জীবন থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল (জগৎসিংহ বিদায় নিতে এসে তার দেখা পায়নি) তখন নায়ক কি ভেবেছিল? আমাদের নায়ক কি কি করল এবং কি ভাবল (দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে, 'মুক্তকণ্ঠ' শীর্ষক অধ্যায়ে) দেখা যাক। আয়েষা যখন বলল, 'এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর' তখন– যদি তন্মুহূর্তে কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত, তবে রাজপুত কি পাঠান অধিকতর চমকিত হইতে পারিতেন না। রাজপুত্রের মনে অন্ধকার মধ্যে যেন কেহ প্রদীপ জ্বালিয়া দিল।'

কিছু পরে আয়েষা রাজপুত্রের কাছে ক্ষমা চেয়ে বলল, সে ওসমানের প্ররোচনায় হঠাৎ সংযম হারিয়ে ওই সত্য প্রকাশ করে ফেলেছে, নাহলে কেউ কোনোদিন তা জানতে পারত না। তখন নায়কের প্রতিক্রিয়া মাত্র একটি সংযত বাক্যে – 'রাজপুত্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন; অন্তঃকরণ সন্তাপে দগ্ধ হইতেছিল।'

এই সন্তাপ কি সহানুভূতির ফল? আর কোনো অনুভূতির স্পর্শমাত্র ছিল না? কিছু পরে পিতার মৃত্যুশয্যায় আয়েষাকে জগৎসিংহ দেখল, 'সে মূর্তি স্থির, গম্ভীর, নিস্পন্দ।'

ওসমানের তরবারির মুখে জগৎসিংহ বলেছিল, 'আমি আয়েষার অভিলাষী নহি।' কিন্তু এই বাক্য কি মনের সব রহস্যের উত্তর?

আয়েষার চিঠির জবাবে জগৎসিংহ লিখেছিল, 'আয়েষা, তুমি রমণীরত্ন। জগতে মনঃপীড়াই বুঝি বিধাতার ইচ্ছা। আমি তোমার কোনো প্রত্যুত্তর লিখিতে পারিলাম না। তোমার পত্রে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি।....আমাকে ভুলিও না।....'

খুব সংযত এই চিঠির পিছনে যে হৃদয়-কম্পন তা পাঠকের কানে বাজিয়েছেন বঙ্কিম, যতই মৃদু আর নিরুচ্চতার তা হোক না। 'প্রেমে একনিষ্ঠ থাকার দেবতা'র কাছে তা লুকানো থাকার কথা নয়। এই আদর্শভ্রষ্টতায় জগৎসিংহ চরিত্রগৌরবে বেঁচে উঠত। বঙ্কিম তা হতে দেননি। মনের দরজা খুলেই কুলুপ লাগিয়েছেন। ভিতরটা ঠিক জানা যায়নি, আভাসমাত্র পাওয়া গিয়েছে ক্ষণকালের জন্য।

এইভাবে নায়ক-নায়িকার প্রেম-বাধা-বিয়ে, সিরিয়াস কমেডির মেজাজে উপন্যাস গড়ে উঠেছে। আয়েষা সেখানে কোনো সমস্যা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু অনেক বড় শিল্পী বলেই নিজেই এতে খুশি হতে পারেননি বঙ্কিম। দেখা গেল–

১. এই কমেডির শেষ আয়েষার বেদনাদীর্ণ ছবিতে।
২. বিমলা শুধু নায়ক-নায়িকার দূতী হয়ে থাকেনি, তার নিজস্ব কাহিনী অনেকটা স্বাধীন হয়ে উঠেছে।[২]

তিন

বিষয়-বিন্যাস ও পাত্রপাত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েনগুলি বোঝার চেষ্টা করা যাক।

১. জগৎসিংহ-তিলোত্তমার প্রেম। সরল ধাঁচ। উপন্যাসের অভিপ্রায়। আপাত মুখ্য-কাহিনী।
২. বিমলার কথা – দূতীয়ালি, প্রেম-লাঞ্ছনা-প্রতিহিংসার গল্প। জটিল ও কামনা-নিয়ন্ত্রিত। সহায়ক উপ-কাহিনী।
৩. আয়েষার প্রেম ও আত্মসংযম। উপ-প্রসঙ্গ।

২. গঠন-রীতির দিক থেকে এই উপপ্রসঙ্গগুলির বিচার বিস্তৃত ও স্বতন্ত্রভাবে করেছি আমার 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি' গ্রন্থে

২ এবং ৩নং বিষয় দুটি যথাক্রমে বিমলা ও আয়েষাকে আশ্রয় করে উপন্যাস-নির্দিষ্ট ভূমিকার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে অনেক বড় হয়ে উঠেছে। ১নং বিষয় ঘোষিত ও সচেতন অভিপ্রায় হয়েও বাইরের স্তরেই প্রধান হয়ে রইল, ভিতরে স্তরে গভীরতর আবেদনে ২ এবং ৩নং বিষয় হয়ে উঠল অনেক তাৎপর্যের।

আয়েষা-কতলু খাঁ-ওসমান মিলে উপন্যাসে পাঠানশক্তির ঐতিহাসিক তথা মানবিক কেন্দ্র। বাকি সব সৈন্যসামন্ত দাসদাসীর জনতা – পরিবেশ হয়ে ওঠাই যাদের কাজ। কতলু খাঁ, ওসমান বা যে কোনো সেনাপতি হলেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো। কতলু খাঁর নারীলিপ্সা বিমলা-তিলোত্তমাঘটিত নৈতিকতার সমস্যা পাকিয়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আয়েষাকে বাদ দিলে উপন্যাসের বাকি অংশ, নায়ক-নায়িকার মূল ব্যাপারটি তো বটেই, বিমলা-বীরেন্দ্র-অভিরাম স্বামীর কথারও ক্ষতি হতো না। এমন কি আয়েষাও জগৎসিংহ-তিলোত্তমার জীবনে সামান্যতম সমস্যা আমদানি করেনি। তবে আয়েষা না থাকলে ওসমানকে মানুষ হিসেবে চেনা যেত না, জগৎসিংহের মনের যে অংশ একটু আগে দেখার চেষ্টা হল – তার খোঁজ মিলত না। আর স্বয়ং আয়েষাকেই পাওয়া যেত না। এগুলো উপন্যাসের এত বড় আকারের ক্ষতি যা অন্য কিছু দিয়ে পূরণ হবার নয়।

প্রেম সেবা সংযম আত্মত্যাগ এইসব সামাজিক গুণের সমন্বয়ে আয়েষা মহিমা পেয়েছে এ রকম ভাবলে মানুষ হিসেবে তাকে এড়িয়ে যাওয়া হবে। যে তীক্ষ্ণ তীব্র ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনচিত্ততা ভালোবেসেছে বলে সেবায় গলে গেল, তাকে সেবাময়ী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গেল জাতীয়া পুণ্যাত্মা নারীর সঙ্গে তুলনা করব না। আয়েষার সেবা একান্ত স্বার্থপর – নিজ হৃদয়ের উল্লাস ও তৃপ্তি। এই প্রেমে সে মৌন ও সংযত। বাসনাকে সম্পূর্ণ গোপন করতে, আবার দৃপ্ত প্রগল্‌ভতায় প্রকাশ করতে সমর্থ। এ ভালোবাসা অপরিণামী, এমন কি আত্মপ্রকাশেও অক্ষম, এ কথা জেনেও আত্মদান করেছে এবং গভীর কষ্ট পেয়েছে। একাই সে ব্যথা বহন করেছে। এবং আত্মহত্যা করেই রেহাই পেতে চায়নি। বাঁচা এবং কষ্ট পাওয়ার মধ্যে তার ব্যর্থ প্রেমকে ধরে রাখার স্বপ্ন দেখেছে। নারী-ব্যক্তিত্বের এই উদ্বোধন আধুনিক মননে জন্ম নিয়েছে, এর হৃদয়কে আশ্রয় করে নিয়ে নিরপেক্ষ, দেহ-বিবিক্ত এক রোমান্টিক অনুভূতি কম্পিত হয়েছে। বাঙালি-চেতনায় এই বস্তু নতুন প্রাপ্তি। জগৎসিংহ-তিলোত্তমার গল্প নিয়ে যে উপন্যাস, তাতে আয়েষা প্রায় বাইরে থেকে যে বিষণ্ণতা বাজাল তা আকস্মিক হয়ে পড়ত। আসলে আয়েষা স্বাধীনভাবে উপন্যাসের একটা গভীরতর বোধের স্তর; প্রয়োজনীয় সংযোজনের বিন্দুগুলো ঘটনায় ঠিকঠাক গ্রথিত রেখে একটা ঐক্যের মায়া তৈরি করেছেন লেখক।

এবারে বিমলার কথা। বিমলার আরম্ভে প্রণয়দূতীর চটুলতা, বাক্যে ও আচারে প্রগল্‌ভ বক্রতা – বুদ্ধির ধার, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বিপদেও ধৈর্যরক্ষা প্রভৃতি। সঙ্গে সঙ্গে মমত্ব ও দায়িত্ববোধ। ফলে তার চরিত্র এমন ব্যক্তিত্ব পেল গোড়া থেকেই যার সদৃশ

কিছু আমাদের সাহিত্যে কখনো ছিল না। তিলোত্তমার আর তার সম্পর্ক মুখ্য প্রণয়কাহিনীর সঙ্গে তার যোগের সূত্র। তার অতীত জীবন একটি বড় চিঠির আকারে পৃথক গল্পের আবর্ত তৈরি করেছে। প্যাসন-কেন্দ্রিক এবং পূর্ণাঙ্গ, অর্থাৎ আরম্ভ-শীর্ষ-শেষ আছে। বিমলা-বীরেন্দ্রের প্রণয়ে শুরু, বিয়েতে চূড়ান্ত বিন্দু, পরিচারিকা পরিচয়ে স্বামীগৃহে বাসে 'ডিনোমেন্ট'–এখানেই মূল সমস্যার (জগৎসিংহ-তিলোত্তমার প্রেম) সঙ্গে তার যোগ আর বীরেন্দ্র-হত্যায় সমাপ্তি। অভিরাম স্বামীর কামনা-রক্তিম জীবন এর যোগ্য ভূমিকা। বিমলার এই নিজস্ব কাহিনীতে তার স্বভাবের যে সত্য আছে তার সঙ্গে মিলিয়েই উল্লিখিত লক্ষণগুলির যথার্থ মর্ম বোঝা যাবে।

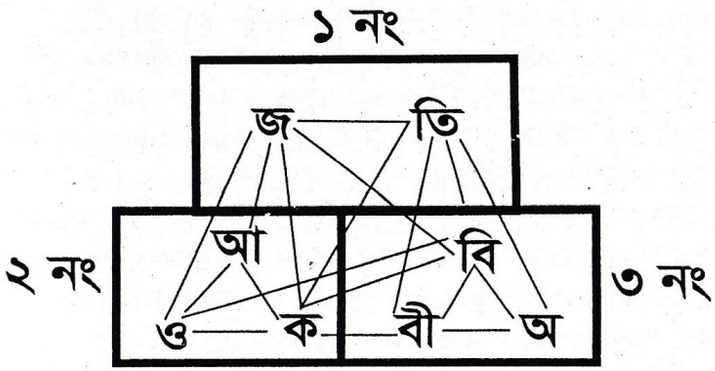
বিমলার উৎস পাপে, যদি অবৈধ জন্মকে 'পাপ' বলা যায়; মায়ের একনিষ্ঠ প্রেমের দুঃখকে সঙ্গী করে সে বড় হয়েছে। অতি উচ্চমানের শাস্ত্রবিদ এবং কামনাবিহ্বল বিবেকহীন পিতার প্রথমে অবহেলা ও পরে মমতার সাহচর্য সে পেয়েছে। তার প্রণয়ী বীরেন্দ্রের আকর্ষণও যত তীব্র তত রীতিবহির্ভূত, সে কামনা ভিতরের বাইরের কোনো বাধায় নিয়ন্ত্রিত হবার নয়, কিন্তু প্রণয়িনীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতেও রাজি নয়। যখন পিতা ও রাজপুত রাজা মানসিংহের চেষ্টা ও চক্রান্তে সে বিয়ে ঘটানো হলো, তার ভাগ্যে দীর্ঘস্থায়ী অপ্রেম ও ঘৃণাই জুটল। অবশ্য গড়মান্দারণে তার অবস্থান পরিচারিকার মতো, সম্ভবত কতকটা রক্ষিতার মতো। হয়তো পুরজীবনে যে মর্যাদা সে আদায় করেছিল তা নিজের ব্যক্তিত্বের মূল্যে, বিমলা সারা জীবন মন্থন করে উগ্র বিষই তুলেছিল এতকাল – তিলোত্তমার সুকোমল সান্নিধ্য বা প্রায়-মাতৃত্ব তার উপরে কিছু কোমল প্রলেপ দিয়ে থাকবে। হাসি কৌতুক চপলতা রসিকতা, রাতে বনপথে শুদ্ধ প্রকৃতি-সৌন্দর্যে আত্মহারা চিত্তের গান গেয়ে ওঠা – এসবই আসলে জীবনের ঐ ক্ষতমুখ ঢেকে-দেওয়া উজ্জ্বল উদ্ধার, হয়তো সে নিজেও এই আবরণ সৃষ্টিতে কিছুটা সচেতন ভাবেই সক্রিয়। কিন্তু বিমলার কোনো নৈতিক সঙ্কট ছিল না, না কোনো পাপের বোধ বা তার জন্য অনুশোচনা। শুধু নিয়তির কাছে মৌন আত্মসমর্পণ। ভিতরে গম্ভীর বিষণ্ন, বাইরে উৎফুল্ল প্রগল্‌ভ। পুরো স্ত্রী-স্বভাব হলেও একটা পৌরুষের ভাব আছে তার চরিত্রে। এবং এইসব উপাদান মিলে যে ব্যক্তিত্ব তা-ই জ্বলে উঠেছিল বীরেন্দ্রের মৃত্যুতে তথা কতলু হত্যায় প্রতিশোধ গ্রহণে। ব্যাপারটি ঘটনার দিক থেকে বেশ থিয়েটারী, কিন্তু এক আশ্চর্য রমণীর মধ্য দিয়ে ভাবলে সম্পূর্ণ সঙ্গত এবং বিশ্বাস্য।

অবশ্য এই উপন্যাসের সবচেয়ে জটিল রমণী বিমলাই সর্বোত্তম চরিত্র; কিন্তু যে ভাবে তাকে পরিবেশন করা হয়েছে তাতে সে মুখ্য হয়ে ওঠেনি; প্রণয়কাহিনীর নায়িকার সহযোগিনী – কিছু অতিরিক্ত ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের সংযোগে জীবন্ত এবং সক্রিয় এই পর্যন্ত। কতলুকে হত্যা করে কমেডির বড় বাধা সে দূর করেছে, হত্যার কারণ যতই তার নিজস্ব হোক না। যে অংশে বিমলা চরিত্রের শিকড় পর্যন্ত পৌঁছনো গেল, তার সত্তার সত্য আবিষ্কৃত হলো তা অপুষ্ট বিবরণে সীমাবদ্ধ হয়ে রইল চিঠির আকারে। বিমলার আত্মকথন বলে কিছু আত্মব্যাখ্যান (প্রায় বিশ্লেষণ) এতে পাওয়া গিয়েছে, সেটুকু পাঠকের বাড়তি লাভ। না হলে বিস্তৃত বিচিত্র প্রসঙ্গে যে কাহিনী পূর্ণদেহ হতে

পারত তাকে দ্রুত ছাঁদে বলা উপবৃত্তান্ত করে রাখা হলো। বিমলা মারফত একটি বয়স্ক মানবিক রচনার জন্য যে আশা জাগানো হয়েছে তা চরিতার্থ হলো না।

সামাজিক পাপকে ভেদ করে প্রবৃত্তিতাড়িত দেহধৃত আত্মার যে কান্না – বঙ্কিম মূলত তারই শিল্পী – এ বিষয়ে নিজে অনেকখানি সচেতন ছিলেন প্রথম উপন্যাস থেকেই। তবুও শান্ত রোমান্টিক কমেডির পিছনে পাপও প্যাসনের জন্য সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ জায়গাটুকুমাত্র নির্দিষ্ট করে দিলেন। এখানে লেখক হিসেবে তাঁর দ্বিধা। ভাবনায় এত দুঃসাহসীর রচনায় এই ভীরুতাকে 'কলোনিয়াল রেনেসাঁসের' একটি ব্যাধি বলে যদি কেউ অভিহিত করেন তো আপত্তি করব। আসলে লেখকের মন এখনও পুরো পাকেনি এটি তার একটি চিহ্ন।

উল্লিখিত তিনটি অঙ্গের পাত্রপাত্রী আটজন – তারাই এ বইয়ের বিশিষ্ট নরনারী – বাকিরা প্রায় জনতার ভিড়, মানসিংহ-আসমানী-বিদ্যাদিগ্‌জকে তার মধ্যে চেনা যায় মাত্র। ঐ তিনটি অঙ্গের এবং আটটি মানুষের সম্বন্ধকে বেশ জটিল বন্ধনে জড়িয়ে দিয়েছেন গল্পকার, এ সম্পর্ক কখনও নেহাত ঘটনার, কখনও চিত্তের। অনেকটা নিচের নক্সার মতো–



পাত্রপাত্রীদের নামের আদ্যক্ষর দেওয়া হলো। উপরের ১নং আয়তক্ষেত্রটি– উপন্যাসের মূল অভিপ্রায় জগৎসিংহ-তিলোত্তমার প্রেম। নিচে বাঁ-দিকে ২নং আয়তক্ষেত্র পাঠান রাজশক্তি – উপন্যাসের দিক থেকে এর মধ্যে প্রধান হয়ে উঠল আয়েষা। নিচে ডান দিকে ৩নং আয়তক্ষেত্র তিলোত্তমার পরিবার, যার মধ্যে বিমলাই মুখ্যত মূল প্রসঙ্গের সঙ্গে সর্বদা সংশ্লিষ্ট। চরিত্রগুলির পারস্পরিক সংযোগ-রেখাগুলি ঘটনা বা হৃদয়গত যোগাযোগের নির্দেশক। ঔপন্যাসিকের অভিপ্রেত নায়ক-নায়িকা বলে জগৎসিংহ-তিলোত্তমার সঙ্গে বেশির ভাগ (প্রতি ক্ষেত্রে অন্য পাঁচটি ক'রে) মানুষের সম্বন্ধ। কিন্তু সে দিক থেকেও বিমলার গুরুত্ব সর্বাধিক – ছ'জন লোকের সঙ্গে তার যোগ, ওসমান ছাড়া অন্যগুলি গুরুতর ধরনের। জগৎসিংহের পিছনে মানসিংহের যোগাযোগে যে রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশ ছিল, উপন্যাসের পটভূমি রূপে তা গ্রাহ্য – এই নক্সায় তা দেখানো হলো না।

উপন্যাসের মুখ্য অঙ্গের (১নং) সরল মানাবক রূপ আয়েষার(২নং অংশের অন্তর্গত) রোম্যান্টিক দীর্ঘশ্বাসে ব্যাকুল ও ক্বচিৎ কেন্দ্রচ্যুত; এবং বিমলা (৩নং অংশের অন্তর্গত জীবনোত্তাপে ও ক্রিয়ার ফলে (২নং ৩নং জুড়ে। চারধারে উত্থিত তরঙ্গের মধ্যবর্তী, যদিও তার দ্বারা অন্তরে প্রভাবিত নয়।

চার

অন্য চারটি বিশিষ্ট মানুষ, কতলু ওসমান বীরেন্দ্র অভিরাম আদৌ বিবর্ণ নয়, যদিও প্রথম দুজন তুলনায় সরল এবং চতুর্থ ব্যক্তি লেখকের দুঃসাহসী ভাবনার সৃষ্টি।

কতলু বিলাসে লালসায় নিষ্ঠুরতায় আত্মম্ভরিতায় একরঙা, সে রঙ চড়া। ছুরিকাহত হবার প্রসঙ্গে যে মদবিহ্বল চিত্র ফুটেছে তা অনেকটাই ভাষার জোরে। মৃত্যুর মুহূর্তে নাবালক সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তায় মমতার স্পর্শ লেগেছে।

ওসমানকে, বিশেষত তার দ্বৈরথ-যুদ্ধের ব্যাপারকে অনেকে নকল বিলাতিয়ানা মনে করেছেন। আসলে এ উপন্যাসে যে প্রেম, যে নীতির বিপর্যয় এসে গিয়েছে তা-ই নতুন বিলাতিয়ানা, কিন্তু বিদেশি নয়, কারণ অনেকখানি পশ্চিমী মনের মালিক তখনকার বাঙালি লেখক এবং পাঠকও। ওসমান কুশলী সেনাপতি, চতুর রাজনীতিক, পৌরুষ ও বীর্যের সেবক, গভীরভাবে ও সংযমের সঙ্গে ভালোবাসতে এবং ধীরভাবে অভিলাষ সিদ্ধির জন্য অপেক্ষা করতে জানে। সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতাবোধ তার স্বভাবের সহজ অঙ্গ। বিমলার প্রতি আচরণ স্মরণ করা যায়। কিন্তু তার প্রেম বাইরে ধৈর্যশীল হলেও অন্তরে তীব্র। ঈর্ষায় তাই সে কাতর হয়, আত্মবিস্তৃত হয়। এবং আহত পৌরুষ বাঞ্ছিতা রমণীর উদ্দেশে প্রয়োজনে দ্বৈরথে প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না। জগৎসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে মৃত্যু হতে পারে – কবর সে তৈরি রেখেছিল; আর জয় হলেই আয়েষাকে পাবার নিশ্চয়তা ছিল কি? যে প্রেমিকার হৃদয় অন্যে সমর্পিত যদি তাকে পাওয়া যেত প্রণয় তৃপ্ত হতো কি? আসলে প্রেয়সীর জন্য যুদ্ধই তার প্রেম-নিবেদনের ভাষা – প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের কঠিন পুরুষালি উত্তর – জয়লাভে বা মৃত্যুতে।

বীরেন্দ্রসিংহের যে রূপ প্রত্যক্ষ কাহিনীতে তা রূঢ়, নির্ভীক এবং চাতুর্যহীন বীর্যবত্তায় চিহ্নিত। পাঠানরাজের প্রতিস্পর্ধী হয়েও সে পূর্বক্রোধ স্মরণ করে মোগল সেনাপতির আশ্রয় নেয়নি, নিজেও দুর্গরক্ষায় সতর্ক হয়নি। আর কতলুর বিচারে যথাসম্ভব দ্রুত আত্মহত্যাই করেছে – কন্যার উপরে পাঠান নবাবের ঘৃণিত আচরণের কথা ভেবে।

কিন্তু এই মানুষের আরও পরিচয় বিমলার চিঠিতে। চরিত্রের ভিতরমহলের খবর। তার সঙ্গে আগে বলা বৈশিষ্ট্যগুলি মিলিয়েই একে চিনতে হবে।

বীরেন্দ্রসিংহ বিমলার প্রতি আকৃষ্ট হলো। বিমলা শূদ্রনারীর কন্যা এবং পিতা অভিরাম স্বামীর অবৈধ সন্তান একথা জেনেও সে সংযত হয়নি। তার প্রেমে তীব্রতা ছিল, গভীরতাও ছিল। কিন্তু প্রেমিকা শূদ্রমাতার মেয়ে বলে বিয়েতে রাজি হল না। এ

বিষয়ে তার অদ্ভুত নীতিবোধ, অভিরাম স্বামীর প্রতি এই উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে, 'আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা জারজা হইলেও শূদ্রী নহে।'

বিয়ে করতে অরাজি হলেও প্রেমসম্পর্ক বজায় রাখতে সে দুরূহ কার্য করেছে, মানসিংহের অন্তঃপুরে হানা দিয়েছে। অবশেষে বিমলাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণে বাধ্য হলে তার উপরে অপমান ও লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিয়েছে। পরিচারিকার পরিচয় তাকে ঘরে রেখেছে, ক্রমে বিরূপতা কমে গেলেও স্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠা পায়নি, রক্ষিতা বলেই সকলে তাকে মনে করেছে।

প্রেমের ব্যাপারে বীরেন্দ্রের মনোভাব একটু অসাধারণ। বিমলার প্রতি ভালোবাসা গভীর, সাধারণ লাম্পট্য তা নয়, কিন্তু পত্নীরূপে তাকে পেতে চায় না বীরেন্দ্র, বিয়ে করতে বাধ্য হলে তাকে দাসী বা রক্ষিতা রূপে গৃহে স্থান দেয়। অথচ অন্য নারীর প্রতি আসক্তি নেই। এই জটিলতার মর্মভেদ করলে আমরা আধুনিক একটি মানুষের বক্র মনের দেখা পেতাম। লেখক সেদিকে চোখ ফেরাবার সুযোগ করে নেননি।

অভিরাম স্বামী বঙ্কিমের প্রথম মহাপুরুষ সন্ন্যাসী শ্রেণীর চরিত্র। এবং এই চরিত্রটিকে একই সঙ্গে মহিমায় স্থিত এবং ইন্দ্রিয়দৌর্বল্যে পীড়িত করে তিনি সাহসিক কাজ করেছেন। সন্ন্যাসাশ্রমে অভিরাম স্বামী নামে পরিচিত শশিশেখর ভট্টাচার্য ছিলেন মানসিংহের মতো মহারাজার শ্রদ্ধার পাত্র, বহুখ্যাত শাস্ত্রবিদ পণ্ডিত এবং উচ্চস্তরের জ্যোতিষী। কিন্তু সুন্দরী নারীর প্রতি তাঁর অসংযত লোভ। পর পর দুটি ঘটনা – প্রথমে গ্রামের এক বিবাহিতা যুবতীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন, যার ফলে জন্ম হয় তিলোত্তমার মায়ের, পরে আবার এক কুমারী শূদ্রকন্যার সঙ্গে সংসর্গ যার গর্ভে জন্ম বিমলার। পরে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ। কন্যার প্রতি মমতা, দৌহিত্রীর প্রতি স্নেহ প্রভৃতি মানবিক গুণের পরিচয়ও আছে।

সংক্ষিপ্ত বিবরণে মাত্র নিবদ্ধ থাকায় এই উপাদানগুলি পূর্ণ ব্যক্তিগঠনে সফল হয়নি, ইঙ্গিতটুকু শুধু পাওয়া যাচ্ছে। অসংযত নারীলোলুপ এই ব্যক্তির চরিত্রে প্রথমে পাণ্ডিত্যের দীপ্তি এবং শেষ পর্যন্ত মহাপুরুষোচিত শ্রদ্ধার আরোপ লেখকের নীতিবোধ সম্পর্কে পুনর্বিচারে প্ররোচিত করে। কামনাতাড়িত ইন্দ্রিয়দুর্বলতা সত্ত্বেও চরিত্রমহিমা থাকা সম্ভব? অথবা বিমলার উক্তি ('মন্ত্রপূতি ব্যতীত যাহার পাণিগ্রহণ হইয়াছে, তাহার যদি স্বর্গারোহণে অধিকার থাকে, তবে মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।') আমাদের চিরলালিত ন্যায়-অন্যায়, সতীত্ব বিষয়ক বোধগুলিকে বেগে নাড়া দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র মোগল-পাঠান যুদ্ধের ভূমিকায় কাহিনী গড়েছেন, সে বিবাদ গল্পের মধ্যে ঢুকেছে, জড়িয়ে গেছে। মানবিক চিত্তোত্তাপ যা আছে তার সঙ্গে সম্পর্কটা সহজ, কোথাও সুর কাটে না। আকবরের আমলের বঙ্গদেশ, মানসিংহ-কতলু প্রভৃতির ঐতিহাসিক কার্যধারার উল্লেখ, গড়-বন্দীশালা, শত্রুর মুণ্ডচ্ছেদ – এ জাতীয় বিষয় একটা অতীত বাতাবরণ তৈরি করেছে। তাছাড়া ঘটনাধারাও কোনো এক পুরোনো যুগের, এ কালের ছাপ তার গায়ে নেই। লোকদের পোশাক আচরণ মনোভাবের সরল বাইরের স্তর আগের দিনের হওয়াই সম্ভব। বর্ণনার ঐশ্বর্যও এদিকে কিছু সহায়তা

করেছে। কিন্তু আকবর-মানসিংহের নাম না থাকলে সময়টা ষোড়শ শতক না হয়ে অষ্টাদশ শতক বলেও ধরা যেত। আর এর ঐতিহাসিকতায় দেশের ব্যাপকতর জনজীবনকে, বহু মানুষের যৌথ যুগান্তকারী কোলাহলকে রূপ দেওয়া যায়নি। মাত্র রাজনৈতিক সংঘাতকে অবলম্বন করা হয়েছে। যুদ্ধাদি থাকলেই, রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্ব গুরুত্ব পেলেই এক ধরনের বিস্তারের বোধ আসে। তা এখানেও আছে। পরের অনেক উপন্যাসে এই সংকীর্ণতা উত্তীর্ণ হয়ে ইতিহাসবোধে অন্য মাত্রা এনেছিলেন বঙ্কিম। দুর্গেশনন্দনীতে তা অপেক্ষিত।

অবশ্য পাত্রপাত্রীর অনেকের মনের ভিতরের স্তরে এমন জীবনরহস্যের খোঁজ বা আভাস মিলছে যাতে উনিশ শতকী জিজ্ঞাসা স্পষ্ট। কোনো কোনো চরিত্রের অবলম্বনে নৈতিকতা বিষয়ে এমন দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত আছে যা মধ্যযুগীয় মূল্যবোধের প্রতিস্পর্ধী।

এভাবেই দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক জীবনের কথা ভেবেছেন, পুরোনো ইতিহাসের স্বাদে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবীন বোধকে দেখেছেন।

৪ কপালকুণ্ডলা : চিত্তের গভীরে/ ভাগ্যের রহস্যে

এক

দুর্গেশনন্দিনীর মাত্র একবছর পরে কপালকুণ্ডলা প্রকাশিত হয়। লেখক কিন্তু প্রথম বইয়ের সাফল্য সত্ত্বেও কোনোদিক থেকেই তার অনুবর্তন করেননি। বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে ভাষাভঙ্গি পর্যন্ত সর্বত্র অন্য কিছু করলেন। এবং প্রতি ক্ষেত্রে শুধু প্রথমে লেখা থেকে উন্নতিতে নয়, তাঁর সৃষ্টির উচ্চতম পর্যায়ে পৌঁছলেন। বঙ্কিমচন্দ্র পরে ভালো উপন্যাস আরও লিখেছেন, কিন্তু কপালকুণ্ডলার চেয়েও ভালো কিছু নয়। কপালকুণ্ডলাকে প্রথম সংস্করণের পরে তিনি কিছু ঘষেছেন। বিশেষ করে সমাপ্তিকে আরও ইঙ্গিতময় করেছেন, একটা গোটা অধ্যায় বাদ দিয়েছেন। অতি সচেতন শিল্পকর্ম, প্রথম থেকে শেষ বাক্যটি সমান সতর্কতায় বুনট-করা। সামান্য শিথিলতাকে প্রশ্রয় দেননি। মূলে ছোট লেখা, এর ফলে আরও ছোট হয়েছে।

চারটি খণ্ডে একত্রিশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত ২৩/২৪ হাজার শব্দের কাহিনীটি। ঘটনাধারার বিকাশ অতি সুশৃঙ্খল, যেন রচনার সম্পূর্ণ চেহারা ছবির মতো লেখকের সামনে স্পষ্ট ছিল। তৃতীয় খণ্ডটি জুড়ে প্রধানত মতিবিবি-জাহাঙ্গীর-মেহেরুন্নিসা সংক্রান্ত উপকাহিনী। সেখানে লেখকের পদচারণা আরও সংযত। রাজকীয় ষড়যন্ত্র বা মোগলাই প্রণয়দ্বন্দ্বের চতুর নাগরালি, অথবা জাহাঙ্গীর-মেহেরুন্নিসার সর্বজন প্রিয় রোমান্টিক প্রণয়-প্রসঙ্গের উপর দিয়ে দ্রুত বেগে চলে গিয়েছেন লেখক। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো শিল্পীর প্রলুব্ধ হবার নানা উপকরণ ছিল, কিন্তু ক্লাসিক মেজাজে সংযত থেকেছেন তিনি।

শুধু উপকাহিনীর ক্ষেত্রে নয়, তাঁর এই সংযম বর্ণনায় ও ঘটনানির্বাচনেও সতর্ক। অনেকে উপন্যাসটিকে 'কাব্য' বা 'কাব্যধর্মী' রচনা বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু কেন? নিসর্গের কাব্যসুলভ বিচিত্র রূপ, রোম্যান্টিক কবিকল্পনার প্রিয় হবার মতো নিসর্গদুহিতা নির্জনবাসিনী নায়িকা – এসব উপাদান থাকা সত্ত্বেও যেমন সংক্ষিপ্ত তার বর্ণনা, তেমনি অনুচ্ছ্বসিত, এবং আবেগ ও প্রেমহীনা রমণী। নায়কের সৌন্দর্যপ্রিয়তা ছিল। আরম্ভে বাইরে তা প্রকাশ পেয়েই সৌন্দর্যের বিমুখ রূপ দর্শনে বিমূঢ় হয়ে পড়েছে, অন্তরে গভীরে আশ্রয় নিয়েছে – রচনাটির দেহ কাব্যসুরভিত রাখেনি। কবিত্ব এই বইয়ের একটি প্রধান বিশেষত্ব, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

মাঝখানে এক বছর (তৃতীয় খণ্ডের ঘটনাবলীর কালবিস্তার) বাদ দিয়ে আগের দুখণ্ডে মাত্র ৭ বা ১০ দিনের এবং পরের একখণ্ডে ৩৬ ঘণ্টার বিবরণ। সুনির্দিষ্ট অল্প কয়েকটি ঘটনা, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ নাট্যসচেতন প্রয়োগে মানুষের জীবন ও ভাগ্যের একটা বৃহৎ সুর বেজে উঠেছে। এই উপন্যাসের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ :

১. ইতিহাস ও সংসার জীবনের তুচ্ছতা এবং নির্জন সমুদ্রোপকূল ও অরণ্যের ভীষণতা এই তিন ধারার মিলন।

২. অনুচ্ছ্বসিত আভ্যন্তর কবিত্ব, নাটকোচিত গঠন তথা নাট্যতরঙ্গিত প্রয়োগকৌশল এবং ঘটনাসজ্জার সহজ সম্বন্ধ। কবিত্ব, বহিরঙ্গ উচ্ছ্বাস ও আতিশয্য নয়; নাটুকেপনার চিহ্ন মাত্র নেই; মুখ্য কাহিনীতে ঘটনাগুলি সুনির্বাচিত এবং স্বল্পায়ত, ঐতিহাসিক অংশে অতিসংযত ও সংক্ষিপ্ত।

৩. ভিতরে বিশাল ইতিহাসের ভূমিকায় ছড়িয়ে পড়ার বাসনা, কিন্তু আয়তনের অতিসংক্ষিপ্ততা ও গাঢ় গঠনে সংযমিত; আবার বিশ্বব্যাপ্ত হাহাকারে সেই ঘনীভূত সংযম হয়ে উঠল ব্যাকুল ও অস্থির।

৪. মুখ্য ও গৌণ কাহিনীর মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনে নিশ্চিত অভিপ্রায় কাজ করেছে। ভিতর দিক থেকে নানা স্তরের সাদৃশ্য-বৈপরীত্যের মাত্রা সৃষ্টি।

৫. ভাষায় তৎসম শব্দের বর্ণাঢ্য চিত্রময়তা, গাম্ভীর্য, সংলাপে ক্বচিৎ কবিত্ব, কখনও কথ্য সরসতা, আবার নাটকোচিত আবেগ-বিস্ফোরণ বা দ্যোতনার বিদ্যুৎ। অথচ ভাষারীতির এই ভিন্নতাই একটি বইয়ে পরস্পর অচ্ছেদ্য, স্বাভাবিক বন্ধনে আত্মীয়।

৬. এত ছোট বইয়ে এত বিচিত্র স্বভাবের প্রাণবন্ত মানুষের উপস্থিতি দুর্লভপ্রায়।

৭. এর ট্র্যাজেডিতে য়ুরোপীয় প্যাসন-কেন্দ্রিক নাটকের স্বভাব, পশ্চিমী অদৃষ্টবাদ এবং বাঙালি প্রকৃতি-তত্ত্বের একটি অভিনব সম্পর্ক অনুভূত।

দুই

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের সঙ্গে ভারতে মোগলযুগের রাজনৈতিক ইতিহাস একটু যুক্ত আছে। ভারতসম্রাট জাহাঙ্গীর, ভাবী মহিষী নূরজাহান তখনও শের আফগানের স্ত্রী মেহেরুন্নিসা – তাদের ইতিহাসখ্যাত বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে উপন্যাসমধ্যে স্থান পেয়েছে। অবশ্য লেখক তাদের একান্ত গৌণ পাত্ররূপে অতি অল্পসময়ের জন্য উপন্যাসের মধ্যে প্রত্যক্ষ রেখেছেন, কিছু বেশি সময় ধরে তাদের প্রসঙ্গ ছায়া বিস্তার করেছে এবং অন্যতম মুখ্যপাত্রী কাল্পনিক মতিবিবির পশ্চাৎপটে মোগলাই ঐশ্বর্য-বিলাস-বাসনা-বিভ্রম-চক্রান্ত-শক্তিমত্তার পেখম ছড়িয়ে রেখেছে। মোগল ইতিহাস মূল প্রসঙ্গে প্রবেশ করেনি। একপ্রান্তে পৃথক বর্ণবন্ত ঘটনামুখর উপকাহিনী নির্মাণ করেছে এবং কাহিনীর এক প্রধান পাত্রীকে রূপে-চরিত্রে বিশিষ্ট করে গড়ে তুলেছে।

রাজনৈতিক অংশটুকু স্থূলত ঐতিহাসিক। সেলিমপুত্র খস্রুকে আকবরের উত্তরাধিকারী মনোনীত করার একটি চক্রান্ত প্রভাবশীল পারিষদবর্গ করেছিল। আকবর মৃত্যুর আগে সেলিমকে ক্ষমা করে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করে যান। এই তথ্যটুকুকে কাজে লাগিয়েছেন লেখক যেভাবে একজন খাঁটি ঔপন্যাসিক ইতিহাসকে কাজে লাগান। রাজনৈতিক ঘটনাংশকে কাঠামো করে নিজের ইচ্ছা ও প্রয়োজনমতো কাল্পনিক নারী মতিকে ব্যবহার করেছেন। তার লোভ কুটবুদ্ধি বাসনা প্রতিহিংসা মিলে

ইতিহাসের তথ্যকে মানবিক কাহিনীর প্রাণ ও উত্তাপে পূর্ণ করেছে। জাহাঙ্গীর ও মেহেরুন্নিসাকে সামনে এনে দেখানোয় ইতিহাসের মোহর আরও নিশ্চিত স্বীকৃতি দিয়েছে। অবশ্য এলফিনস্টোনের ভারত-ইতিহাসের প্রভাবে সেকালের অন্য লেখকদের মতো বঙ্কিমও সেলিম-মেহেরের পূর্বপ্রণয়ের গল্পে বিশ্বাস করেছেন। আধুনিক কালে একে ইতিহাসে রোম্যান্টিক প্রসঙ্গ-সংযোজন বলে অগ্রাহ্য করা হয়। কিন্তু সাহিত্যপাঠে অতটা রূঢ় হবার দরকার নেই। সেলিম-মেহেরের সুবিদিত ভবিষ্যৎ জীবন, সেলিমের যুবাবয়সে সুন্দরী নারী-বিষয়ে চিত্তদৌর্বল্যের কথা এবং সাধারণভাবে মোগল রাজকীয় পরিবেশে অভিজাত তরুণদের ভোগাসক্তি ও অসংযম এসব মিলে একে সম্ভাব্য সত্য বলে মনে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র অল্প রাজনৈতিক ইতিহাস এবং প্রচুর ব্যক্তিগত প্রবণতাকে মিলিয়ে সে যুগের বাদশাহী পটটিকে সত্য করে তুলেছেন। এমন কি মতিবিবি লুৎফুন্নিসাকেও একটি পুরোই ঐতিহাসিক রমণী-চরিত্র বলে পাঠককে বিশ্বাস করিয়েছেন।

কপালকুণ্ডলায় ইতিহাসের সংযোগে একটা স্বাদবৈচিত্র্য আনতে চেয়েছিলেন লেখক – এনেওছেন, অন্য কিছু তাৎপর্যময় জীবন চিন্তার দিকে তর্জনী তুলতে চেয়েছিলেন – (সে কথা পরে বলব) কিন্তু কখনও একে প্রধান কাহিনীর অংশ করে ফেলেননি। যে অর্থে দুর্গেশনন্দিনী বা মৃণালিনীতেও আমরা ঐতিহাসিক রোমান্সের আদর্শ খুঁজি, কপালকুণ্ডলায় তা করা অসঙ্গত। শ্রেণীগত বিচারে এ লেখাও একই বর্গের, কিন্তু আসলে অনেক তফাৎ। প্রধান কাহিনীতে ও সমস্যায় ইতিহাসাশ্রয়ী কল্পনা নেই, তাই ইতিহাসের যোগে যে বিশাল কলকোলাহল, জাতীয় জীবনের উত্থান-পতনের সুর, মহাকাব্যিক সমগ্রতার বোধ, যুগবদলের দুন্দুভি-শব্দের প্রত্যাশা – এখান তা নেই। এখানে ইতিহাসের স্বাদ আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি নারীর স্বভাবে তা কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

কপালকুণ্ডলায় ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালির সামাজিক-পরিবারিক জীবনে একটু জায়গা করে নিয়েছে। নবকুমারের সংসারের যে ছবিটুকু আছে তার কোনো বিস্তৃত চিত্র প্রকাশ পায়নি। কিন্তু কৌলিন্যপীড়িত অবহেলিত বধূরূপে শ্যামার পরিচয়ে বাস্তবতা আছে, যে বাস্তবতা বঙ্কিমচন্দ্রের সমকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বাঙালির পরিবার-জীবনের সংস্থানে ষোড়শ শতাব্দীর সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর পার্থক্য চোখে পড়ে না, ঊনবিংশ শতাব্দীতেও নানা দিকে নিবিড় ঐক্য অব্যাহত থেকেছে। গঙ্গাসাগরের তীর্থযাত্রীরাও সাধারণ গ্রামীণ মানুষ – বহু যুগেও তাদের মন ও কাজের ধারা বদলাবার সুযোগ ঘটেনি এ দেশে। পুরোহিত অধিকারী সম্বন্ধে একই কথা। এদের ষোড়শ শতকে স্থাপন করতে পাঠকের আপত্তি হবে না। আর সেকালের পথঘাট, পাল্কী ও পদব্রজে যাতায়াত, পান্থশালা, পথে ডাকাতি, লুঠতরাজ, কাপালিক তান্ত্রিকের নিভৃত বীভৎস ধর্মাচরণ, জোর করে ধর্মান্তরিতকরণ এবং তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া সাধারণভাবে

মধ্যযুগের ছাপ এনেছে রচনায়। ফলে ঐতিহাসিক অংশটির সঙ্গে এর বিবাদ ঘটেনি। অথচ রাজকীয় গৌরবহীন এই সব অংশে অপরিচয়ের দূরত্ব নেই, এদের সমাজ-বাস্তবতার সংশয় আসে না। উপন্যাসের নায়ক নবকুমার এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, বিশেষ করে তার পারিবারিক পটভূমিতে, যা স্বভাবত সরল উত্তেজনাহীন এবং উচ্চকাঙ্ক্ষাহীন।

নবকুমারের ব্যক্তিগত জীবনে যৌবন আরম্ভ না হতেই বাইরে থেকে ঘা পড়েছিল, যুগের বা ইতিহাসের। তার শান্ত সংসারজীবনে যা ছিল সাময়িক বিক্ষোভ মাত্র, ব্যক্তিত্বের ভিতরে তা স্থায়ী বাসা বেঁধে ছিল। স্ত্রী পদ্মাবতীর বাবা বাধ্য হয়ে সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, ফলে পদ্মাবতী স্বামী পরিত্যক্ত হয়। এ ঘটনা আগের। কাহিনীর মধ্যে আবার নবকুমারের জীবনে ইতিহাসের উজ্জ্বল ও শাণিত নায়িকা লুৎফুন্নিসার প্রবেশ। নবকুমারের দূর পল্লীবাসী নিরীহ নিস্তরঙ্গ জীবনটি নিয়ে ইতিহাস বড় কম অত্যাচার করেনি।

উপন্যাসের মুখ্যপাত্রী কপালকুণ্ডলা কিন্তু ইতিহাসের কেউ নয়, পল্লীসমাজের বা সংসারেরও কেউ নয়। সে সমুদ্রতীরের অরণ্যের নির্জনতার। রোমান্টিক কল্পনা এ ক্ষেত্রে তান্ত্রিকসাধনা প্রকৃতির আদিশক্তি – এরূপ কিছু দেশীয় উপাদানকে অবলম্বন করেছে।[১] এবং এই কল্পলোক ও অমানব নিসর্গ কপালকুণ্ডলার মধ্য দিয়ে নবকুমারের সাংসারিক জীবনে সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

এই তিন ধরনের উপাদানের মিশ্রণে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের সম্ভোগ জটিল হতে বাধ্য।

শুধু জটিল নয়, একটা বিশালতার বোধে এই লেখাটি পাঠকের মন বেঁধে দেয়। আকারে অতি ছোট মাত্র ৫১ পৃষ্ঠার বই।[২] সপ্তগ্রামের একটি বনাকীর্ণ গ্রাম্য সংসার। একদিকে মোগল-ইতিহাসের যুদ্ধ ষড়যন্ত্র কামনার বড় ঢেউ ভাঙছে, অন্যদিকে সমুদ্র বালিয়াড়ি জনহীন অরণ্যের ভীষণতা। আকাশের সীমা ছাড়িয়ে গেছে দেবী কালিকার মায়া মূর্তি। আর সামনে আলুলায়িত চুলে কপালকুণ্ডলা। ফলে লেখাটির মধ্যে একটা মহাকাব্যিক বিপুলতার সুর বেজেছে যা রাজনৈতিক ইতিহাসে সংক্ষুব্ধ ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে মহার্ঘ্য এবং মৃত্যুর অনন্তে প্রসারিত। যুগক্রান্তির দামামা বাজেনি বলে এ স্বাদকে বলব না ঐতিহাসিক রস, কিন্তু সব সময়কে ডিঙিয়ে মহাকাল (নারীরূপে মহাকালী) এই রচনাকে মহাকাব্যিক রসে উত্তীর্ণ করেছে।

এই ভাবনা অন্য এক প্রশ্নে নিয়ে যায়– এ লেখায় আধুনিক মানুষ, তার সমস্যা কোথায়? তান্ত্রিক প্রকৃতিতত্ত্বে আত্মসমর্পণে কি একালের জীবনবাদ নির্জিত নয়?

এরূপ সংশয় ঘটার প্রকৃত কোনো কারণ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র তান্ত্রিক চরিত্র আমদানি করেছেন দেশকালের সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি বজায় রেখে। প্রকৃতিবাদের মধ্যে আদ্যশক্তিতত্ত্বের কিছু মিশ্রণ যদি ঘটেও, তাতে যদি ইউরোপীয় 'ফেটালইজম' বা অদৃষ্টতত্ত্ব

১. আমার 'কপালকুণ্ডলা : প্রকৃতি-আদিতে-মধ্যে-অন্তে প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। বই– 'পুনশ্চ পঙ্কিম'।
২. সাহিত্যসংসদ সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

কিছু স্বতন্ত্র রূপ পায় তাতেও আপত্তি করা অসঙ্গত। আধুনিক চীনা গল্পকার লু সুন তার কোনো কোনো ছোটগল্পে বিশেষত দীর্ঘকাহিনী 'ফোর্জিং অব দি সোর্ড' যে চীনদেশীয় যাদুবিশ্বাস, আদিম প্রেততত্ত্ব ও গূঢ়বিদ্যার (ব্ল্যাক ম্যাজিক অ্যান্ড অকাল্টইজম) ব্যবহার করে রচনাগুলিকে খাঁটি চীনা বস্তু করে তুলেছিলেন, অথচ তার মধ্য দিয়ে আধুনিক মানব-বিশ্বাসের স্খলন ঘটেনি। একালের চীনা সাহিত্যে অত বলিষ্ঠতায় কে আর নব মানববাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন?

তন্ত্র কাপালিক আদ্যশক্তি প্রভৃতির সহযোগে বঙ্কিম যদি উপন্যাসে যথার্থ ভারতীয়ত্বের একটি মাত্রা যুক্ত করেন, যদি ইউরোপীয় অদৃষ্টবাদ তন্ত্রের ইঙ্গিতে প্রকৃতিতত্ত্বের মিশ্রণে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে তাতে আপত্তি করা অর্থহীন। যথার্থ অকাল্টইজমের আমদানিও একালের সাহিত্যে বহুক্ষেত্রে আধুনিক অভিপ্রায়ই ফল।[৩] আমরা মাটির গভীরে শিকড় হারিয়ে নব্যসাহিত্য ও ভাবনার পত্তন করায় ঐতিহাসিক কারণেই কিছু বিপদে পড়েছি।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নরনারী অনেকটা ষোড়শ শতাব্দীর, অনেকটাই একালের – এ দেশে সময় সর্বদা জীবন ও মনের ভিতরে গভীর খাত কেটে এগোয় না বলে। যারা মুখ্য মানুষ তাদের অনেকে ইতিহাস দিয়ে দাগা, তাই আচারে আলাপে বসনে সেকালের। কেউ বা গ্রামীণ (নবকুমার) বলে সেকালে–একালে দূরত্ব দুস্তর নয়। কিন্তু এদের তৃষ্ণা ও যন্ত্রণা, হৃদয়কে একান্ত জেনে বাধা অতিক্রমের সংগ্রাম ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে দেখবার চোখ আমরা পাইনি। মানুষ নামক আশ্চর্য রহস্যের একান্ত সন্ধান আগে করিনি – মহাকাব্যের যুগে যদি করেও থাকি – সে সহস্র সহস্র বছরের বিস্মৃত অধ্যায়। এমন কি পূর্বোক্ত অদৃষ্টতত্ত্ব, সর্বসংহারী অন্ধ প্রকৃতি-নিয়তিও, যদি বা দর্শনের ও আরাধনার বিষয় থেকে থাকে, হয়ে থাকে সুনিশ্চিত আত্মসমর্পণের আধার, বঙ্কিমে তা বিশ্বকে চেনার অঙ্গ, জীবনকে হারাবার বিষয়, প্রেমকে রক্ষা করার অনন্ত সংগ্রাম; অনেকটাই রবীন্দ্রনাথের 'যেতে নাহি দিব' কবিতার মতো মরণ-আহত চিরজীবী প্রেমের অনন্ত তৃষ্ণার বোধ জাগায়।

তিন

এ-উপন্যাসে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আছে, কিন্তু নিসর্গ-বর্ণনায় সুলভ কবিত্ব নেই। বর্ণনায় লেখক বেশ কৃপণ, এত সংযত। কতগুলি বড় সুযোগ তৈরি করে পাঠকের মনে লোভ জাগিয়ে তিনি অতি দ্রুত মোটা তুলির দু-একটি টানে কাজ সেরেছেন। কুয়াশা-ঢাকা শীতের গঙ্গাসাগর, নদী-মোহনা, দীর্ঘ বিস্তীর্ণ বেলাভূমি বালিয়াড়ি, নির্জন স্বল্পবৃক্ষ অরণ্য, সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার উপন্যাসের ভিত্তি গড়েছে। পরেও আছে গ্রামপ্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি, নদী-সৈকত, পাড়-ভাঙা উদ্দাম গঙ্গা। বর্ণনা যেটুকু যখন আছে

৩. বাংলা সাহিত্যে এ বস্তু দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি সমর্পণ' গল্পের যখ-দেওয়ার প্রসঙ্গটি দ্রষ্টব্য। 'রবীন্দ্রগল্প : অন্য-রবীন্দ্র' : ক্ষেত্র গুপ্ত - গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য

সুনির্বাচিত শব্দে ছবিতে লেখকের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই। কিন্তু এ উপন্যাসে প্রকৃতির খুব বড় ভূমিকা আছে এবং বর্ণবহুল চিত্ররচনায়ই সে ভূমিকা প্রতিষ্ঠা পায় না। বঙ্কিমচন্দ্র অনেক ভিতর থেকে ঐ ব্যাপারটিকে উপন্যাসের কেন্দ্র পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন।

এ বইয়ে প্রকৃতির উপাদানগুলো শুধু জনহীন নয়, প্রাণীহীন। আকাশ সমুদ্র কুয়াশায় একাকার – তার মধ্যে অতিক্ষুদ্র মানবজীবনপুঞ্জ একটি দিকভ্রান্ত নৌকার যাত্রী। নৌকাগুলি দল বেঁধে চলতে চেয়েছিল। কোথায় কোন সঙ্গী কখন বিক্ষিপ্ত হয়েছে। এখন শুধু মৃত্যুর প্রতীক্ষা। চরের নাগাল পাওয়া সে তো হঠাৎ ভাগ্যের দান।

পাহাড়ের মতো বালিয়াড়ি, অনন্ত সমুদ্র, নক্ষত্রবিদ্ধ অসীম আকাশ। বাঘের ভয় আছে – বাঘ নেই। পাখির গান শোনা গেল না, কোনো ছোট প্রাণীও চোখে পড়ল না। কাপালিক মানবঘাতী। আর কপালকুণ্ডলা? তার যথার্থ পরিচয় পরে নেওয়া যাবে। প্রথম দেখায় তাকে মূর্তিমতী সমুদ্রকন্যা বলে মনে হয়েছিল।

সপ্তগ্রামের কিছু দূরে গঙ্গা, পাড় ভাঙছে এক এক থাবায়। সৈকতে শ্মশান, তারপরে বন – লোকালয় অনেক পথ।

লেখক রূঢ় নন, উগ্র নন–বরং শান্তভাবে যে প্রকৃতির কথা বলেছেন তা জড়, ভীষণ জীবনবিমুখ।

রোমান্টিকেরা জড় প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ খোঁজেন, আনন্দ-মুক্তির পথ দেখতে পান বদ্ধ বাস্তব জীবন থেকে; অসীমের দ্যোতনা প্রকৃতি আর আত্মার আত্মীয়। বঙ্কিম রোম্যান্টিক, কিন্তু তাঁর কল্পনায় যে নিসর্গ ধরা পড়েছে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। রোমান্টিকের এভাবে দেখায়ও বাধা নেই। এখানে অসাধারণ রূপের আকর নিসর্গবস্তু (নবকুমারের সমুদ্রবন্দনা দ্রষ্টব্য) প্রাণকে আশ্রয় দেয় না, মানবহৃদয়ের মুখের উপরে বন্ধ তার দাক্ষিণ্য – ক্রোধে বা ঘৃণায় নয়, মৌন অস্বীকারে।

কপালকুণ্ডলার ভিত্তি পর্যন্ত এই নিসর্গ-চেতনা, কারণ মূল পাত্রীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা গল্পের কেন্দ্রীয় সমস্যাও।

প্রকৃতির যেসব রূপ মানুষকে আশ্বাস দেয় না – আন্দিজের সেই শ্বেত ঝঞ্ঝা, মেরু অঞ্চলের তুষার সমাধি, সাহারার বালুঝড়, শ্বাপদসঙ্কুল গহন বন বা সমুদ্রবক্ষে জাহাজডুবি, পম্পিয়াইয়ের আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ প্রভৃতি, স্বাভাবিকভাবে বঙ্কিমের উপাদান হতে পারত না। ভৌগোলিক বাস্তবতা এবং মধ্যযুগের বাঙালি গৃহস্থ যুবকের জীবনের সম্ভাব্যতার সীমা তিনি মনে রেখেছেন। কারণ বিরূপ প্রকৃতিতে নিক্ষিপ্ত নায়ককে নিয়ে বালক-ভোলানো অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লেখা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ঐসব প্রসঙ্গের আয়োজন বিশ্বাস্য হলে লেখকের অভিপ্রায় সিদ্ধি সহজ হতেও পারত। অবশ্য সমুদ্র-মোহনায় প্রচণ্ড রকমের ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডব তৈরি করা হয়তো অসম্ভব ছিল না। কিংবা সপ্তগ্রামে বর্ষার জলপ্লাবন। লেখক কিন্তু কোনো আকস্মিক নৈসর্গিক বিপদ-পাতেরও সাহায্য নিতে চাননি। একান্ত সুলভ উপাদানগুলিকে ব্যবহার করে চূড়ান্ত দুর্লভ লক্ষ্য ভেদ করেছেন। যে সত্য তাঁর কল্পনাধৃত তাকে সহজের ভূমিকায় প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। পরিচিত পরিবেশে অপরিচয়ের সব রহস্য ঘন হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনার গোড়ায় দেশীয় তন্ত্রতত্ত্বের কিছু প্রভাব থাকা সম্ভব, শুধু ইউরোপীয় রোম্যান্টিকতার সাদৃশ্যে এর জন্ম নয়, জন্ম হত না।

বাংলার বামাচারী তন্ত্রসাধনার অনেক কিছুই আধুনিক মনের গ্রহণীয় নয়। বঙ্কিম পরবর্তীকালে এক ইংরেজি চিঠিতে তাঁর সৃষ্ট কাপালিককে ভ্রষ্ট বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে যেমন জীবনবিমুখ নিসর্গ একটা মৌন প্রবল অন্ধশক্তির ভূমিকা নিয়েছে তেমনি কালীসাধনার কথাও নানাভাবে উল্লিখিত। কাপালিকের আরাধ্যা ভৈরবী, অধিকারীর আরাধ্যা দেবী কালী। আর কপালকুণ্ডলা জাগ্রত– দর্শনে 'দেখিলেন, কেন আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্তি। গলবিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিতস্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকরাজি দুলিতেছে – বাম করে নরকপাল – অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বলজ্বালা-বিভাসিত লোচনপ্রান্তে বালশশী সুশোভিত।....সেই নবকাদম্বিনীসন্নিভ রূপ আকাশমার্গে তাহার আগে আগে চলিল।

তন্ত্রসাধনার শাস্ত্র-আচারের কথা বাদ দিলে মূলে রয়েছে প্রকৃতিসাধনা – যে প্রকৃতি নিসর্গরূপে নারীরূপে এবং জড় ও জীবমাত্রের স্ব-ভাব রূপে একক সত্য। কালিকা তাই আদ্যা প্রকৃতি। ভালোমন্দ সদসৎ পাপপুণ্য নিরপেক্ষ মূলীভূত সত্য – সর্বতত্ত্বের উৎস। কল্যাণী বা রুষ্টা প্রকৃতি ('ন্যাচুরা বিনাইনা' বা 'ন্যাচুরা ম্যালাইনা') – এ পার্থক্যও সংসারী স্বার্থবদ্ধ মানব-ভাষ্যমাত্র। আদিপ্রকৃতি এবং তার ত্রিধা প্রকাশ (নিসর্গ-রমণীত্ব-স্বভাব) প্রীত বা রুষ্ট নয়, কল্যাণ-অকল্যাণে সমদৃষ্টি, চূড়ান্ত নির্বিকার। সংসারী মানুষ, প্রবৃত্তিতাড়িত জীবন ঐ বোধের দিকে তাকিয়ে তাই আতঙ্কে স্তব্ধ। জীবনের বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের কল্পনা করা যায়, কিন্তু জীবনের দিকে পিছন ফিরে আছে যে, নিষ্ঠুরতা ছাড়াই স্বভাবত যা হৃদয়ঘাতী, সেখানে বড় অসহায় এই মানব-অস্তিত্ব। সেই আদ্যা প্রকৃতি এই উপন্যাসের নিয়তি – নারী এবং নিসর্গ।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, কপালকুণ্ডলাকে কি আদ্যাপ্রকৃতির রূপক বা প্রতীক রূপে আঁকা হয়েছে এই বইয়ে? তাহলে ভাবনার দিক থেকে যত মূল্যবানই হোক শিল্প, হিসেবে এর মান নেমে যেত। তাঁর ঐ জাতীয় বোধ কিন্তু উপন্যাসের পরিবেশ-চরিত্রের, বিশেষ করে কপালকুণ্ডলার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে, কপালকুণ্ডলার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্বাস্যতা বিপর্যস্ত করে নয়। ঐ চরিত্র বিশ্লেষণে তা প্রমাণিত হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'সিরিয়াস রোমান্টিক কমেডি'। তাতে একদিক থেকে আয়েষার আর ভিতর থেকে বিমলার গাঢ় ব্যথার রঙ লেগেছে। কপালকুণ্ডলায় এই প্রথম রীতিমতো ট্র্যাজেডি লিখলেন। এর ট্র্যাজিক স্বরূপ প্রধান পাত্রপাত্রীর চরিত্র বিশ্লেষণে বোঝা যাবে। উচ্ছ্বাসভরে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্কমোহন সেন এবং মোহিতলাল মজুমদার প্রায় সমকণ্ঠে গ্রীক নাটকের সঙ্গে এর তুলনা করেছেন। একমুখিন দেহগঠনের জন্য এবং সম্ভবত এর অদৃষ্টবাদের জন্য। ওঁদের সঙ্গে একমত হওয়া গেল না। এই উপন্যাসের দেহে শিথিলতা নেই, অকারণ বিস্তার নেই, অনিবার্য দ্রুততায় পরিণতির দিকে ছুটে চলা আছে, কিন্তু মতি-প্রসঙ্গে উপকাহিনীর নিজস্ব আবর্তন আছে – কোনো

গ্রীক ট্র্যাজেডিতে যা থাকবে না। তা ছাড়া এই উপন্যাসের অদৃষ্টবাদ গ্রীক নাটকের আত্মীয় নয়। গ্রীক নাটকে অদৃষ্টবাদ সমাজনীতি-নির্ভর; দেবদেবীরা সামাজিক মূল্যবোধের ধারক। ব্যক্তিগত গুণপনায় যত বড় হন নায়ক, ঐ সামাজিক মূল্যে আঘাত করলে তাকে অদৃষ্টবিড়ম্বিত হতেই হবে।[৪] এ-রকম কোনো ব্যাখ্যা দেবার সুযোগ নেই কপালকুণ্ডলায়। ট্র্যাজেডির অন্য এক রূপ ও স্বাদ হোমরের মহাকাব্য দুটিতে পাওয়া যায় – বিশেষ করে 'ইলিয়াডে'। দৈবীরোষ সেক্ষেত্রে অকারণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো অপ্রতিরোধ্য – মানবযুক্তিতে তার হদিস নেই – পরিমাপ পাওয়া যায় না। নবকুমার কি সে জাতীয় নৈসর্গিক রোষের শিকার হয়েছিল অকারণে, মানববিচারের দিক থেকে বললে বিনা দোষে? অন্তত যে ধরনের প্রকৃতিবোধ এই উপন্যাসের মর্মনিয়ন্ত্রা তাতে কিছু সহধর্মিতা গ্রীক মহাকাব্যের সঙ্গে, যদিও সূক্ষ্ম বিচারে সে সাদৃশ্যের পরিমাণ বেশ কমে যাবে।

আর শেকসপিয়রের ট্র্যাজেডির মূলে যে মানবচরিত্রের প্রবৃত্তিতরঙ্গিত গহন রহস্য তার সঙ্গে এর কোনো নৈকট্য নেই? এর সংক্ষিপ্ত উত্তর –

১.ক. নবকুমার তার প্যাসনের ও চরিত্রের অপ্রকাশ্য কূট আবর্তের শিকার প্রতিদিন।

খ. নবকুমার অজ্ঞাত রহস্যময় অনতিক্রম্য এক প্রকৃতি-শক্তির বলি।

২.ক. মতির চরিত্রই তার ভাগ্য।

খ. অজ্ঞাত প্রকৃতিশক্তির সংস্পর্শে তার সব চেষ্টা অনায়াসে বিপর্যস্ত।

এই উপন্যাসে ট্র্যাজেডি নবকুমারের, কপালকুণ্ডলার নয় – এবং গৌণত মতির। আর একটু ছড়িয়ে দেখলে এ উপন্যাসে ট্র্যাজেডি গোটা প্রবৃত্তি-বহুল মানব-অস্তিত্বের–প্রেম প্রতিহিংসা চক্রান্ত লোভ উচ্চাশার, শান্ত সাংসারিক আশার – কোমল বাৎসাল্যস্নাত চিত্তের, সদসৎ গোটা জীবনব্যাপারের এবং সেই ট্র্যাজেডির উৎস আকাশ দিগন্ত ব্যাপ্ত আদ্যাপ্রকৃতির এবং মৃত্তিকার মানবী কপালকুণ্ডলা।

চার

কপালকুণ্ডলায় ছোটবড় চরিত্র অনেকগুলি। ব্যক্তিত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্রপাত্রী ছাড়াও এমন অনেক ছোট চরিত্র আছে যাদের বৈশিষ্ট্য সুমুদ্রিত–যারা উল্লেখে মাত্র পর্যবসিত নয়। কপালকুণ্ডলা নবকুমার মতিবিবি কাপালিক অধিকারী নবকুমারের মা শ্যামা প্রতিবেশীবৃদ্ধ জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসা জাহাঙ্গীরের রাজপুত মহিষী পেষমন গঙ্গাসাগরের যাত্রীর দল মোগলসভার পারিষদবর্গ রামগোবিন্দ ঘোষাল পথের ভিক্ষুক – এই ছোট আকারের বইয়ে এত পৃথক স্বভাব মানুষের সমাবেশ লেখকের ক্ষমতার পরিচয় দেয়।

৪. 'নাট্যকার মধুসূদন ঃ ক্ষেত্র গুপ্ত' বইয়ে কৃষ্ণকুমারী নাটকের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এইসব লোকজনের যথার্থ খোঁজ নেবার আগে এদের নানাদিক থেকে শ্রেণীবদ্ধ করা যাক।

১. কাহিনীর গুরুত্ববিচারে

১.১. মূলকাহিনীতে

১.১.১. প্রধানপাত্রপাত্রী : কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, মতিবিবি।

১.১.২. সহযোগী : কাপালিক, অধিকারী, শ্যামা।

১.১.৩. পটভূমিতে স্থাপিত : নবকুমারের মা। প্রতিবেশী নৌকাযাত্রীর দল এবং সেই বৃদ্ধ, পথচারী ভিক্ষুক।

১.২. গৌণকাহিনীতে

১.২.১. প্রধান পাত্রপাত্রী : মতিবিবি, জাহাঙ্গীর, মেহেরুন্নিসা।

১.২.২. সহযোগী : জাহাঙ্গীর-মহিষী, পারিষদবর্গ।

১.২.৩. পটভূমিতে স্থাপিত : পেষমন, ঘোষাল মশাই।

২. সপ্তগ্রামের পরিবারভুক্ত ও সংশ্লিষ্ট সমাজের সঙ্গে জড়িত

২.১. পরিবারের অন্তর্ভুক্ত

২.১.১. পুরুষ : নবকুমার।

২.১.২. নারী : নবকুমারের মা, শ্যামা, কপালকুণ্ডলা।

২.২. বাইরের, কিন্তু নানাসূত্রে পরিবারের সঙ্গে যুক্ত

২.২.১. পুরুষ : নৌকাযাত্রী প্রতিবেশীবর্গ, ঘোষাল, কাপালিক।

২.২.২. নারী : মতিবিবি।

৩. সংসারের বাইরের লোক

৩.১. পুরুষ : কাপালিক, অধিকারী।

৩.২. নারী : কপালকুণ্ডলা।

৪. মোগল জীবন ও রাজনীতি-জড়িত

৪.১. ঐতিহাসিক

৪.১.১. পুরুষ : জাহাঙ্গীর, সনাম ও নামহীন পারিষদবর্গ।

৪.১.২. নারী : মেহেরুন্নিসা, জাহাঙ্গীরের রাজপুত মহিষী।

৪.২. কাল্পনিক

৪.২.১. পুরুষ : ঘোষাল মশাই।

৪.২.২. নারী : মতিবিবি, পেষমন।

৫. যুগ্ম-চরিত্র (সাদৃশ্যে, সহযোগিতায়, বৈপরীত্যে) এবং যৌথ-চরিত্র।

৫.১. যুগ্ম চরিত্র

৫.১.১. কালীসাধনায় : কাপালিক ও অধিকারী, কাপালিক ও কপালকুণ্ডলা।

৫.১.২. সঙ্গিনী-পরিচারিকা : কপালকুণ্ডলা ও শ্যামা, মতিবিবি ও পেষমন।

৫.১.৩. মুখ্য পাত্রীর সহযোগিনী : শ্যামা ও পেষমন।

৫.১.৪. বান্ধবী-প্রতিদ্বন্দ্বিনী : মেহেরুন্নিসা ও মতিবিবি।

৫.১.৫ রাজকীয় প্রণয়ী-প্রণয়িনী : জাহাঙ্গীর ও মেহেরুন্নিসা, জাহাঙ্গীর ও মতিবিবি।

৫.১.৬. মতির প্রেমের দিক থেকে : জাহাঙ্গীর ও নবকুমার।

৫.১.৭. নবকুমারের প্রেমের দিক থেকে : কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি।

৫.২. যৌথচরিত্র

৫.২.১. গ্রামীণ : নবকুমারের প্রতিবেশী নৌকাযাত্রীরা।

৫.২.২. নাগরিক : বাদশাহের পারিষদবর্গ

৬. সরল-জটিল, স্থির-বিবর্তমান, গভীর-অগভীর

৬.১. সরল বা জটিল

৬.১.১. সরল : কপালকুণ্ডলা, অধিকারী, শ্যামা, পেষমন, নবকুমারের মা, প্রতিবেশীর দল।

৬.১.২. জটিল : নবকুমার, মতিবিবি, কাপালিক, জাহাঙ্গীর, মেহেরুন্নিসা, জাহাঙ্গীর-মহিষী, ঘোষাল, পারিষদবর্গ।

৬.২. বিবর্তমান বা স্থির

৬.২.১ (ক) বিবর্তমান : নবকুমার, মতিবিবি, কাপালিক।

৬.২.১. (খ) আপাত-বিবর্তন : কপালকুণ্ডলা।

৬.২.২. স্থির : (৬.২.১.) চিহ্নিত চরিত্রগুলি বাদে বাকি সবাই।

৬.৩. গভীর বা অগভীর

৬.৩.১. গভীর : নবকুমার, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, জাহাঙ্গীর, মেহেরুন্নিসা।

৬.৩.২. অগভীর : (৬.৩.১.) চিহ্নিত চরিত্রগুলি বাদে বাকি সবাই।

৭. প্রবৃত্তির দিক থেকে

৭.১. প্রবৃত্তি প্রধান

৭.১.১. প্রণয় – তীব্র : নবকুমার, মতিবিবি, জাহাঙ্গীর, মেহেরুন্নিসা।

৭.১.২. প্রণয় – শান্ত : শ্যামা।

৭.১.৩. উচ্চাশা ও লোভ – তীব্র : কাপালিক, মতিবিবি, ঘোষাল, জাহাঙ্গীর-মহিষী, মেহেরুন্নিসা।

৭.১.৪. প্রতিহিংসা – তীব্র : কাপালিক।

৭.১.৫. বাৎসল্য – শান্ত : অধিকারী।

৭.১.৬. বাৎসল্য – তীব্র : জাহাঙ্গীরের রাজপুত-মহিষী।

৭.২. প্রবৃত্তি-বিমুখ

৭.২.১. অচেতন এবং পূর্ণ বাসনা-বিরহিত – শান্ত : কপালকুণ্ডলা।

৮. সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের রস ও স্থায়ী ভাবের আলম্বন হিসেবে – (রতি ভাব ৭.১.১. এবং ৭.১.২. দ্রষ্টব্য)

৮.১. করণ রস (স্থায়ী ভাব–শোক)

৮.১.১. পুরুষ : নবকুমার।

৮.১.২. নারী : মতিবিবি, শ্যামা, মেহেরুন্নিসা

৮.২. হাস্য (স্থায়ী ভাব হাস), কৌতুকাত্মক চরিত্র

৮.১.১. পুরুষ : নৌকোযাত্রী বৃদ্ধ।

৮.২.২. নারী : মতিবিবি, শ্যামা।

৮.৩. বীভৎস রস (স্থায়ী ভাব – জুগুপ্সা) : কাপালিক।

৮.৪. ভয়ানক রস (স্থায়ী ভাব – ভয়) : কাপালিক।

৮.৫. রৌদ্র রস (স্থায়ী ভাব – ক্রোধ) : কাপালিক।

৮.৬. বীর রস (স্থায়ী ভাব – উৎসাহ, সাহসী চরিত্র)

৮.৬.১. পুরুষ : নবকুমার, ঘোষাল, অধিকারী।

৮.৬.২. নারী : মতিবিবি, কপালকুণ্ডলা।

৮.৬.৩. বীর রসের অভাব (অর্থাৎ ভীরুতা) : নবকুমারের সহযাত্রীগণ।

৮.৭. বিস্ময় রস (স্থায়ী ভাব – আশ্চর্য) : কপালকুণ্ডলা।

৯. সামাজিক নীতি, মানবিক সদসৎ বৃত্তির দিক থেকে

৯.১. নীতিবাদী

৯.১.১. প্রণয়বিষয়ে–পুরুষ : নবকুমার।

৯.১.২. প্রণয়বিষয়ে–নারী : শ্যামা।

৯.১.৩. পরোপকারী : অধিকারী, কপালকুণ্ডলা।

৯.২. নীতিহীন

৯.২.১. চক্রান্তকারী পুরুষ : পারিষদবর্গ, ঘোষাল, কাপালিক।

৯.২.২. চক্রান্তকারী নারী : মতিবিবি, জাহাঙ্গীর-মহিষী।

৯.২.৩. মিথ্যাচারী, অকৃতজ্ঞ : নৌকোর সহযাত্রীরা।

৯.২.৪. প্রণয়বিষয়ে-পুরুষ : জাহাঙ্গীর।

৯.২.৫. প্রণয়বিষয়ে-নারী : মেহেরুন্নিসা, মতিবিবি, জাহাঙ্গীর-মহিষী।

৯.৩. নীতি বিষয়ে অচেতন, সব নীতিবোধের বাইরে : কপালকুণ্ডলা।

আরও কোনো রূপ শ্রেণীতে চরিত্রগুলিকে ভাগ করা একান্ত অসম্ভব বলি না। এবারে এই বর্গীকরণের ফলে পাঠকের পক্ষে উপন্যাসটির সম্ভোগে কি সাহায্য হচ্ছে দেখা যাক। প্রথমত, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মানুষগুলি অজস্র বৈচিত্র্যের প্রতিফলন। লেখক আমাদের ছোট আকারের গল্পে কয়েকটি মাত্র চরিত্রের মধ্যে অনেক বড় পৃথিবীর আভাস এনেছেন।

দ্বিতীয়ত, শ্রেণীবিন্যাসের ফলে উপন্যাসের নরনারীর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা তাদের আরও বেশি করে চিনতে বা বুঝতে প্ররোচিত করে, কাহিনীর গতি সম্বন্ধে আমাদের মানবিক অন্তর্দৃষ্টিকে শাণিত করে তোলে। আসলে কিন্তু বর্গীকরণের হিসেব খুব স্পষ্ট করে লোকগুলির প্রাথমিক লক্ষণ বলে দেয়, সঙ্গে জানায় এ কথাও যে মুখ্য পাত্রপাত্রীদের ছকে ভাগ করে অনেকটাই পাচ্ছি না, তবে দরজায় পৌঁছবার রাস্তাটি এতে যুক্তিতে বাঁধা হয়ে গেল, এবং বস্তুবোধে।

কয়েকটি চরিত্রের কথা ভেবে দেখা যাক বর্গীকরণের হিসেবমতে।

ক. অধিকারী। মূল কাহিনীর এক সহযোগী মানুষ। সংসারের বাইরে তার অবস্থান। কালীসাধক, কিন্তু সে বিষয়ে কাপালিকের তুলনায় পার্থক্য স্পষ্ট। সরল। স্থির। অগভীর। শান্ত ও বাৎসল্য রসাশ্রয়ী মন। অভিপ্রেত কর্মে উৎসাহী। নীতিবাদী – পরোপকারী।

খ. পেষমন। গৌণ কাহিনীর পটভূমির লোক। মোগলজীবন ও রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাল্পনিক নারী চরিত্র। অন্যতম প্রধান পাত্রী মতির পরিচারিকা হিসেবে

বিশিষ্টতা–কপালকুণ্ডলার সঙ্গিনী শ্যামার সঙ্গে মতির সঙ্গিনী পেষমনকে তুলনা করে চিনতে সুবিধে। সরল। স্থির। অগভীর।

দেখা যাচ্ছে অধিকারী পেষমনের মতো অপ্রধান চরিত্রগুলির মূল বিশিষ্টতাগুলি সূত্রাকারে এখানেই পাওয়া যাচ্ছে। ঘটনাধারাকে এই সব সূত্রের সূচীমুখে বিশ্লেষণ করলে পুরো মানুষটা সহজে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কিন্তু যে সব গৌণচরিত্র কিছু বাঁক আছে তাদের অনেক কিছু বর্গীকরণ বলে দিতে পারে না। যেমন–

গ. শ্যামা। মূল কাহিনীর সহযোগী। সপ্তগ্রামের পরিবার-জীবনের ভিতরের লোক। নায়িকার একমাত্র সঙ্গিনী। মতির সঙ্গিনী পেষমনের থেকে আলাদা। সরল। স্থির। অগভীর। শান্ত। প্রণয় চরিত্রের ভিত্তিতে, তবে তা নীতিবাদী। করুণ রসাশ্রয়ী। হাস্য রসাশ্রয়ী।

ঘ. জাহাঙ্গীর। গৌণ কাহিনীর অন্যতম প্রধান চরিত্র। ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব। মতিবিবির প্রেম সম্পর্কে নবকুমারের সঙ্গে তুলনীয়। জটিল। স্থির। গভীর। প্রণয়তীব্র প্রবৃত্তি তাড়িত মানুষ – এ বিষয়ে নীতিহীন।

জটিল-গভীর মানুষ জাহাঙ্গীর এ খবরটুকু পাওয়া যথেষ্ট নয়, তার মধ্যে ঢোকা চাই, শ্রেণীবিশ্লেষণ ততদূর নিয়ে যেতে পারল না। শ্যামা কিন্তু সরল অগভীর মেয়ে। তবু একই সঙ্গে করুণ ও হাস্যের আশ্রয় সে কি করে হলো? তার অগভীরতাও কোথায় কিছু চঞ্চল হয়ে উঠেছে। জীবনের এই সব রহস্যের সামনে পৌঁছবার জন্যই চরিত্রব্যাখ্যান।

আর যারা প্রধান নরনারী, বর্গবিন্যাসে তাদের মনের বাইরের মহলের পরিচয়। নবকুমার প্রণয়প্রবৃত্তির বশীভূত, নীতিবান করুণরসাশ্রয়ী মানুষ–এ তথ্যটুকু জরুরি এবং একেবারে অপর্যাপ্ত। মোট কথা কোনো ধরনের শ্রেণী-পরিচয়ই মানবরহস্য ভেদ করতে বা সে চেষ্টা করতে পারে না। তবে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীবিভাগ করার ফলে চরিত্রের ভিতরে তাকাবার অনেক দরজা-জানালা খুলে যায়। জীবন নামক ব্যক্তিগত সত্য চারদিকে অজস্র ছড়িয়ে, কোটি সহস্রখণ্ডে। তাকে পড়ার চেষ্টা অরণ্যে রহস্যে দিশাহারা করে দেয়। বর্গীকরণ আমাদের মনে আশ্বাস যোগায় যুক্তিবিদ্ধ বস্তুনিষ্ঠ শ্রেণীবিন্যস্ত পরিচয়ের। যারা প্রাথমিক পাঠে তৃপ্ত হবেন তাদের জন্য এই বন্দোবস্ত, অন্তহীন সিঁড়ি নামার প্রথম ধাপ–মিথ্যা তো নয়।

বর্গীকরণের ফলে এক চোখে মানুষ তৈরিতে লেখকের বিশেষ ধরনের আগ্রহ এবং মোট হিসেব পাই। কপালকুণ্ডলার মতো ছোট উপন্যাসে জটিল চরিত্রের সংখ্যা ৭-এর বেশি, জীবনের গভীরতায় নেমে গেছে ৫ জন। যদিও এদের অনেকে খুবই অল্প সময়ের জন্য এসে চলে গিয়েছে। ৩টি চরিত্রের নিশ্চিত বিবর্তন ঘটেছে। প্যাসন প্রধান নরনারী ৯ জন, তার মধ্যে ৫টি চরিত্রেই প্রণয় মুখ্যবৃত্তি; ৭ জনের বেলাতেই প্যাসন

তীব্র। ৬ জনের স্পষ্টত বা অস্পষ্ট বাসনায় নীতিবোধ অস্বীকৃত; গ্রাম ও নগরের দুটি গোষ্ঠিও নীতির ধার ধারে না।

এদের মধ্য দিয়েই কপালকুণ্ডলায় তিনি মানবসত্যকে ভেদ করতে চেয়েছেন।

এবং মুখ্যনারী এদের দ্বারা পরিবৃত অথচ সব নীতি-দুর্নীতির বাইরে, প্রণয়প্রবৃত্তির সঙ্গে অপরিচিত, সরল হয়েও গভীর। একদিকে এই একজন, অন্যদিকে প্রায় অন্যসকলে। তারই মন্থনে উঠেছে বিষ-অমৃত-যন্ত্রণা-নির্বেদ।

পাঁচ

এই উপন্যাসে যুথবদ্ধ মানুষের দুটি পৃথক দল আছে। একদল নাগরিক–বাদশাহের সভাসদ, ওমরাহের দল। এদের মধ্যে খস্রুর শ্বশুর খাঁ আজিম এক আধবার সামনে এসেছে, অন্যদের কথা মাত্র বিবরণে পাওয়া গিয়েছে। রামগোবিন্দ ঘোষালও এই শ্রেণীভুক্ত, তবে তাকে একটু পৃথক করে দেখার কারণ আছে। প্রবল উচ্চাশা, পরস্পরের সঙ্গে প্রাধান্য নিয়ে কলহ, গোপন চক্রান্ত, বাদশাহের সামনে নীচ চাটুকারিতা এদের বৈশিষ্ট্য। সেলিমের বিরুদ্ধে খস্রুর পক্ষে এদের চক্রান্ত, আবার মুমূর্ষু বাদশাহের কৌশলে তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ–কোনোটা করতেই এদের নীতিবোধে বাঁধে না। আগে থেকেই এরা পালিয়ে বাঁচার পথ রাখতে চায়, সে কারণেই মতিবিবি ওড়িশায় প্রেরিত হয়েছিল। এদের সাহসের পরিমাণও এতেই বোঝা যাবে। এই গোষ্ঠি সরাসরি সামনে না এসে উপন্যাসের কিরূপ অভিনব রূপ নেয় তা দেখা গেল না।

তুলনায় গ্রামীণ লোকদের গোষ্ঠিটি কিছু সামনে এসেছে। প্রধানত নায়কের সহযাত্রী রূপে নামহীন জনতার এই দলটিকে পাই। এরা তার প্রতিবেশী। এদের মধ্যে থেকে এক বৃদ্ধ বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তবে কোনো ব্যক্তিলক্ষণে স্বতন্ত্র নয়। সে যেন ওদেরই মুখপাত্র, আচরণে এবং স্বভাবে।

এই লোকেরা ভীরু। বিপদের মুখে পড়ে স্থিরভাবে চিন্তা করতে, উদ্ধার পাবার চেষ্টা করতে এরা জানে না, অকারণ কোলাহল করতে পারে। অসুবিধার বোঝা বাড়াতে পারে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই লোকদের ধর্মাচরণ নেহাত প্রথানুগত্য। বৃদ্ধ এসেছে তীর্থ করতে কিন্তু মন তার পড়ে আছে নিজের ফসল-খেতের দিকে। শত্রুরা ধান কেটে নিয়েছে শুনে তার ধর্মকর্ম মাথায় উঠেছে। নবকুমারের সঙ্গে সে যখন তর্ক করেছে যুক্তির কাছেও যায়নি। নৌকো পথ হারালে মাঝিদের উপরে তম্বি করেছে।

নিজেদের রান্নার কাঠ যোগাড় করতে এরা তীরে ওঠেনি বাঘের ভয়ে, কিন্তু নির্লজ্জ বৃদ্ধ নবকুমারকে ভদ্রলোক ও সদাশয় জেনে অনুরোধ করেছে। আবার এই উপকারীকে নির্জনে ফেলে রেখে অনায়াসে দেশে ফিরে গিয়েছে। সেখানে রঙ চড়িয়ে নবকুমারের মৃত্যুসংবাদ প্রচার করতে তাদের বাধে না। ভীরু, নির্বোধ এবং হীন স্বার্থপর এই লোকগুলি অতি ছোট মাপের। নবকুমারকে বাঘে খাওয়া নিয়ে এরা হাস্যকর গল্প বানিয়েছে। সে হাসিতে কৌতুক তো নেই–যথেষ্ট ব্যঙ্গও উপকারী নবকুমারকে ফেলে

চলে আসে তখন নবকুমারের দিকে থেকে লেখক নীতিবাক্যের অবতারণা করেছিলেন 'তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন!' বাক্যটি বাংলা সুভাষিতের পর্যায়ে উঠে গিয়েছে। গ্রামবাসীদের দিক থেকে দেখলে বাক্যটি একটু ঘুরিয়ে বলা যায় না– 'তুমি উত্তম তাই বলিয়া আমি অধম হইব না কেন!' বঙ্কিমের উচ্চারিত বাক্যটি যদি সমাজদুর্লভ আদর্শবাদ হয়, তবে ঐ বাক্যের মধ্যে উহ্য যে প্রতিস্থিতি, একটু ঘুরিয়ে দেখে যা পাওয়া গেল্ তা নিষ্ঠুর বাস্তব–একান্ত সুলভ, বিশেষ করে এখানে চিত্রিত 'মব-সাইকোলজি'র দিক থেকে তো বটেই।

পদ্মাবতীর বাবা রামগোবিন্দ ঘোষালকে আমরা সামনে দেখিনি, একাধিক প্রসঙ্গে তার উল্লেখ কিছু শুনেছি। তাতে লোকটির চরিত্র সম্বন্ধে পরোক্ষ ধারণা জন্মে। তাকে নেহাত সঁরলচিত্ত গৃহস্থ বলে মনে হয় না। ষোড়শ শতাব্দীতে সপরিবারে উৎকল তীর্থে যাবার সঙ্গতি সাহস এবং ধর্মপ্রাণতা তার ছিল। যুদ্ধকালীন মত্তপ্রায় পাঠান সেনাদের হাতে পড়ে তাকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হতে হয়। তার স্বভাবে যেমন আদর্শবাদ দেখি না–ধর্মের জন্য প্রাণ দেবার, তেমনি তার চরিত্রে একান্ত ব্যক্তিস্বার্থের প্রেরণাও ছিল না–মুসলমান রাজত্বে মুসলমান হয়ে ব্যক্তিগত সাফল্যের ফায়দা তুলবার। বাধ্য হয়ে সে ধর্মান্তর গ্রহণ করে নিজের ও পরিবারের প্রাণ বাঁচাবার জন্য।

সে নিজের গ্রামেই ফিরে আসে। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই সমাজ-পরিত্যক্ত হয়। বিবাহিত কন্যা পদ্মাবতীও স্বামী-গৃহে স্থান পেল না। এই অপমান মেনে নিতে রাজি সে হলো না–এবং এই সময় থেকে ধর্মান্তর গ্রহণকে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সঙ্কল্প করল। সে প্রথমে রাজমহলে যায়। কিন্তু পরিচিত লোকের সংস্পর্শ সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলবার জন্য, আরও উচ্চ রাজকীয় পদলাভের আশায় আগ্রায় চলে যায়। তীক্ষ্ণ আত্মসম্মানবোধ নিজের অতীতকে একেবারে মুছে ফেলতে তাকে প্ররোচিত করে, এবং উচ্চ থেকে উচ্চতর পদপ্রাপ্তির অভিমুখে আপনার বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতাকে নিয়োগ করে – আর ঐ দুটি বস্তুই তার প্রচুর পরিমাণে ছিল।

কন্যার উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে গেলে ঘোষাল তার সঙ্গে সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে। মনে হয় তার মধ্যে নীতিঘটিত কিছু মূল্যবোধ অবশিষ্ট ছিল।

একান্ত গৌণ এবং পটভূমিতে স্থিত এই মানুষটির মধ্যে লেখক কিছু জটিল মানবিক উপকরণ এনেছিলেন, অবশ্য উপন্যাসে অপ্রয়োজনীয় বলে তাকে পুষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ করে তোলেননি।

যে ভিখারী কপালকুণ্ডলার কাছে থেকে মতিবিবির দেওয়া গয়নার বাক্সটি নিয়ে ছুটে পালিয়েছিল, তাকে কাহিনী-মধ্যে চকিতে দেখেছি। কপালকুণ্ডলার চরিত্রের একটি বিশেষ দিক ফুটিয়ে তোলার জন্যই তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু কোনো মানুষই দাবার ঘুঁটি নয় – বড় লেখক একথা জানেন। সে কারণে এই ভিখারীর স্বল্পবর্ণ ছবিটিও শুধু প্রয়োজন সিদ্ধ করে না, নিজেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কপালকুণ্ডলার মতো দানী তার অভিজ্ঞতার কেন, স্বপ্নেরও বাইরে। কপালকুণ্ডলার কাছে সে সামান্য ভিক্ষাই চেয়েছিল। ঐ নারীর যে ভিক্ষা দেবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে সে

কথা বোঝাবার জন্যই তার সালঙ্কৃত দেহের প্রতি ইঙ্গিত করেছিল। (কপালকুণ্ডলা কহিলেন, 'আমার ত কিছু নাই, তোমাকে কি দেব?'... ' সে কি মা। তোমার গায়ে হীরা মুক্তা–তোমার কিছুই নাই?') এতে যে ঐ নারী তাকে গয়না দিতে চাইবে এবং শেষ পর্যন্ত গায়ের সব কিছু এবং বাক্সভর্তি বাকি গয়নাও দিয়ে দেবে তা সে ভাবতেও পারেনি। প্রথমে সে 'কিছু বিস্মিত' হল, তারপরে 'ক্ষণেক বিহ্বল' এবং পরমুহূর্তে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করল। কপালকুণ্ডলাকে সে উন্মাদ ভেবেছিল অথবা সবটাই স্বপ্ন কিনা তাতে ভেবে দেখার অবকাশ লোকটির ছিল না। তার স্বাভাবিক বৃত্তি তাকে দ্রুত পালাতে প্ররোচিত করল, কারণ এ দান এখনই হস্তচ্যুত হতে পারে এ বিষয়ে সে নিশ্চিত ছিল।

এটি তুচ্ছতম মানুষের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সতর্ক দৃষ্টির একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

অধিকারী চরিত্রটি উপন্যাসের নানা প্রয়োজন সাধন করেছে। তার বাস জনপদের মধ্যে নয়, আর কাপালিকের সঙ্গ ছেড়ে নবকুমারের বাড়ি পর্যন্ত নায়িকার যাত্রাপথটি অধিকারীর কুটিরের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। কপালকুণ্ডলার কাছে বিয়ে ব্যাপারটাই কোনো অর্থ ছিল না, নবকুমারকে কপালকুণ্ডলা বিমূঢ় করেছিল, লুব্ধ করেনি। অধিকারীর হস্তক্ষেপ ছাড়া এ বিয়ে ঘটত না। কাহিনীতে এইভাবে অতি গুরুতর এক ভূমিকা নিয়েছে এই শান্ত ব্রাহ্মণ–না জেনে নিয়তির হাতের পুতুলের মতো, অপরিচিত যুবকের জীবনবিপর্যয়ের নিমিত্ত হতে হলো তাকে অকারণেই।

অধিকারীর কাপালিকের সঙ্গে একটি লক্ষণীয় বৈপরীত্য, – দুজনেই কালীসাধক; একজন শান্তভক্ত, মাতৃরূপের উপাসক; অন্যজন উগ্র তপস্বী, বামাচারী। দুজনেই সংসার-জীবনের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক। কিন্তু মনের দিক থেকে অধিকারী গৃহী; কাপালিক সব গার্হস্থ্য মানবধর্মের পরিপন্থী। অধিকারী কাপালিককে মহাপুরুষ বলে মনে করে, কিন্তু তার আচরণ সমর্থন করে না। কপালকুণ্ডলাকে সে পালন করেনি, কিন্তু পিতার মমতার স্নেহ করে। সুযোগ পেয়েই কপালকুণ্ডলাকে সে গার্হস্থ্য ধর্মে ব্রতী করাল, কাপালিকের বীভৎস্যতা থেকে উদ্ধারের উপায় করে দিল।

বৃদ্ধের ঘটকালীতে কৌতুকের সামান্য স্পর্শ আছে, কিন্তু তার শান্ত রসাস্পদ স্নেহকোমলতা বিক্ষুব্ধ কাহিনীর উপরে একটি স্বল্পস্থায়ী প্রলেপের মতো।

পেষমন মতিবিবির পরিচারিকা। অন্যতম মুখ্য পাত্রীর নিভৃত ভাবনার সঙ্গিনী হিসেবে উপন্যাসে তার প্রয়োজন ছিল। অভিজাত আমীর-ওমরাহদের বেগম-কন্যাদের এই জাতীয় মার্জিতবুদ্ধি বিলাসপ্রিয় পরিচারিকা থাকাই স্বাভাবিক, সেদিক থেকে সে একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রতিনিধিও বটে। নায়িকা কপালকুণ্ডলার সঙ্গিনী যেমন শ্যামা, মতিবিবির পেষমন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা ও শ্যামা বাইরের দিক থেকে সমাজ সংস্থানে সমশ্রেণীভুক্ত, অন্যদিকে পেষমন মতির দাসীমাত্র। শ্যামা নিজ বেদনায় ও ব্যক্তিত্বে যতটা স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে, পেষমন তা পারেনি, সে অনেকটা কাহিনীগত প্রয়োজনের সীমায় বদ্ধ।

পেষমন স্বল্পপ্রাণ নারী। তার লোভ আছে, সহজ ভোগবৃত্তি পর্যন্ত তার বাসনা। যে বড় লোভ চিত্তের অহঙ্কার, প্রাপ্তিকে ছাপিয়ে অপ্রাপ্তি পর্যন্ত প্রসারিত, তার তাৎপর্য বোঝার ক্ষমতা পেষমনের নেই, তাই মতবিবির স্বভাবে যে মুহূর্ত থেকে নূতন সত্য দেখা দিল সে মালিককে আর বুঝতে পারেনি। দেহের সুখ ও ভোগ, ঐশ্বর্য ও শক্তির মদ পর্যন্ত তার চিন্তা যেতে পারে, যে ভোগ-বাসনার তীব্রতা দেহের সুখ-ঐশ্বর্য-শক্তি-প্রতিষ্ঠানে অনায়াসে বর্জন করে তা পেষমনের কাছে বিদেশী। তাই বদলাতে আরম্ভ করা থেকে মতি তার চোখ অপরিচতা হয়ে পড়তে লাগল।

তবুও মতির প্রতি পেষমনের হয়তো কিছু মানবিক মমত্বও ছিল, না হলে আগ্রা ছেড়ে মতি যখন সপ্তগ্রামে চলে এল পেষমন তার সঙ্গ নিত না। চাইলেই মতির সুপারিশে সে কোনো ওমরাহ-বিবির পরিচারিকার পদ পেতে পারত। মতি কতকটা সে রকম প্রস্তাবও দিয়েছিল। মনে হয় শুধু মতির প্রতি দৌর্বল্যই তাকে এই গ্রাম্য বর্বরদের দেশে নিয়ে এসেছিল।

সেলিমের রাজপুত-মহিষী রাজা মানসিংহের বোন, খুব অল্পসময়ের জন্য উপন্যাসে দেখা দিলেও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। সচরাচর মোগল বাদশাহদের রাজপুত-রানীরা মনেপ্রাণে হিন্দুধর্ম ও মূল্যবোধগুলো মেনে চলত। কিন্তু যুবরাজপত্নী স্বামীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চক্রান্তে পা দিয়েছিল। সেলিমের প্রতি আকবরের বিরূপতার সুযোগে সেলিম-পুত্র খস্রুকে বাদশাহ করার চক্রান্তে সেলিম-মহিষী খস্রু-জননীর সমর্থন লক্ষ্য করার মতো। মুখে সে মতিকে বলেছে যে বাদশাহের পত্নী হবার চেয়ে বাদশাহের জননী হওয়া অনেক গৌরবের। কিন্তু আসল কারণ আরও গভীরে, সেখানে ঈর্ষার সাপ আর প্রভুত্বের লড়াই আছে। সেলিম বাদশাহ হলে মেহেরুন্নিসা অচিরে প্রধান বেগম হয়ে বসবে, এ-ভাবনা তাকে স্বামী-বিরোধী চক্রান্তের প্রধান অংশীদার করে তুলেছিল। মোগল দরবার ও হারেম জুড়ে চক্রান্ত-ছলনা-ঈর্ষা-হিংসার যে আবর্ত ফেনিল ছিল এই রাজপুত রানী তারই বুদ্বুদ–তার সব প্রাচীন সতীত্বের আদর্শ সেই আবর্তে তলিয়ে গিয়েছিল।

ছয়

চরিত্র-কল্পনার প্রথম বহির্বৃত্ত ছেড়ে ভিতর দিকে দ্বিতীয় বৃত্তে যাওয়া যাক। শ্যামা, জাহাঙ্গীর, মেহেরুন্নিসা, কাপালিক এই চারজন এই কক্ষে স্থিত। আগের পাত্রপাত্রীর তুলনায় এরা অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বা প্রয়োজনীয়–মূল বা গৌণ কাহিনীতে যেমন এদের গুরুত্ব, তেমনি চরিত্র হিসেবেও এরা বিশেষ ভাবনার অবকাশ রাখে।

জাহাঙ্গীরকে বাদশাহ রূপে উপন্যাসে দেখা গেল মাত্র একটি অধ্যায়ে। কিন্তু যুবরাজ সেলিম রূপে তার উল্লেখ পেয়েছি আগে কয়েকবার। যুবরাজ সেলিমকে অধিকারচ্যুত করার চক্রান্তে তার মহিষী, প্রণয়িনী মতি, বৈবাহিক খাঁ আজিম এবং অন্যান্য বহু ওমরাহ তৎপর। মৃত্যুকালে সম্রাট আকবরের শেষ চালে সেই চেষ্টা সফল হতে পারেনি। সেলিমের নিজের কোনো কৃতিত্ব তাতে ছিল না। কিন্তু সে সিংহাসন

পেল। এর পরেও এক প্রধান চক্রী মতির সঙ্গে তার হৃদ্য ব্যবহারে মনে হয় রাজকীয় ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে সে অনবহিত, অথবা সুন্দরী নারীর প্রেমের ব্যাপারে সে তা গ্রাহ্য করে না।

জাহাঙ্গীর-মতিবিবির কথোপকথনে মোগল বাদশাহের স্বভাবের এই ব্যক্তিগত দিকটিই ব্যক্ত হয়েছে। অতি মার্জিত ও বিদগ্ধ উক্তিতে বাদশাহী অভিজাত্য ও একটা গভীর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। অথচ তারল্যহীন প্রণয়-বিহ্বলতা, রমণীরূপে ডানা-পোড়াবার জন্য উদ্যতপ্রাণ যে পতঙ্গ অন্তরে কম্পিত হচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে লাভাবিস্ফোরণ ঘটা সম্ভব, পাঠক তা অনুভব করে। উল্লেখমাত্রে মেহেরুন্নিসার প্রেমের স্মৃতি তার চোখে তীব্র আবেগে জল এনে দিল–মেহেরকে লাভ করার সঙ্কল্প কত দৃঢ় তা আভাসে স্বীকার করে নিতেও বাদশাহের সঙ্কোচ হলো না। তেমনি মতিবিবির স্বতন্ত্রব্যক্তিত্ব ও রূপের সম্ভোগ-বাসনাও যে কম গাঢ় নয় তা প্রকাশেও দ্বিধা ছিল না, ছলনাও নয়। এই উক্তি তা প্রমাণ করে– 'প্রেয়সি।... কিন্তু আমাকে কেন ত্যাগ করিয়া যাইবে? এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য উভয়েই বিরাজ করে না? এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফোটে না?'

জাহাঙ্গীর বুদ্ধিমান। মতি কেন রাজপুরী ত্যাগ করে যাচ্ছে বুঝতে তার অসুবিধা হলো না। মেহেরুন্নিসার কাছে এ ক্ষেত্রে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনে সে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়েছে। জাহাঙ্গীরেরও মতির প্রতি মনোভাবে লাম্পট্যসূচক স্থূলতা ছিল না। এবং তার মতো রমণীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে আটকে রাখলে আসলে মানুষটাকেই পাওয়া যাবে না একটু বোঝবার গভীর সংবেদনশীলতা তার ছিল। তাই দুঃখিত মনেই মতিকে সে যেতে দিল।

মেহেরের প্রতি গভীর ভালোবাসা সত্ত্বেও মতিবিবির জন্য তার এই হৃদয়-ব্যাকুলতা কেন, তার উত্তম বঙ্কিম দেননি। কারণ মানব-হৃদয়-রচনার সৃষ্টিশীলায় সে উত্তম জমা নেই। নানা নীতি ও আদর্শবাদী তত্ত্ব দিয়েও এই সম্ভাবনা রোধ করা যায়নি। বঙ্কিমের উপন্যাসে বারবারই সোচ্চারে বা নীরবে এই প্রশ্ন।

লাহোরে নূরজাহানের কবরের পাথরে তাঁর নিজের লেখা এক ফারসি বয়েৎ উৎকীর্ণ আছে-

বর্ ম্যজারেমা গরীবাঁ ন্যঃ চেরাগে ন্যঃ গুলে
ন্যঃ পরে পরমানা সুজদ্ ন্য সত্যায়ে বুলবুলে।

অর্থাৎ, গরিবের এ কবরে চিরাগ দিও না, দিও না ফুল – পাছে শামা পোকার ডানা পুড়ে যায়, কষ্ট পায় বুলবুল।

কপালকুণ্ডলার লেখকের সঙ্গে এই কবিতার পরিচয় ছিল কিনা জানি না, কিন্তু মাত্র একটি অধ্যায়ে মেহেরুন্নিসা (ভবিষ্যতের নূরজাহানের) যে-ছবি তিনি এঁকেছেন তাতে বাদশাহী অভিজাত্য, বুদ্ধি ও বৈদগ্ধ্য, নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে চাপা গর্ব, তীব্র গভীর প্যাসনেট প্রেম, আকাশ-ছোঁয়া উচ্চাশা, তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদা, সংযম এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব-

উত্তরণের সরব চেষ্টা প্রকাশ পেয়েছে। চরিত্রের এই সংক্ষিপ্ত রূপের মধ্যে যে প্রলোভন ছিল বঙ্কিমের মতো সংবৃত্তমন্ত্র শিল্পী তাতে অভিপ্রায় ভ্রষ্ট হননি। অন্যথায় বিস্তৃততর ভূমিকায় তাকে দাঁড় করাবার চেষ্টাই হতো স্বাভাবিক।[৫]

বঙ্কিমচন্দ্র মেহেরুন্নিসার মুখে যে কটি কথা দিয়েছেন তার মধ্যেই স্বভাবের পূর্বোক্ত লক্ষণগুলি নিহিত।

১. অন্যের তোমার মতো চিত্র-নৈপুণ্য থাকিলে তোমার এ মুখের আদর্শ রাখিতে পারিত। মেহের। কবরের মাটিতে মুখের আদর্শ থাকিবে।

২. 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?'

৩. 'কাহাকে বিস্মৃত হইব? আত্মজীবন বিস্মৃত হইব কিন্তু যুবরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিব না'

৪. মেহেরুন্নিসা হৃদয়মধ্যে তাহার ধ্যান করিবে। ...দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখনও দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবে না। আর যদি দিল্লীশ্বর কর্তৃক তাহার স্বামীর প্রাণান্ত হয়, তবে স্বামীহন্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবেক না।'

প্রথম উদ্ধৃতিতে মেহেরের নিজের অলোকসামান্য রূপ সম্পর্কে চেতনা এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর হতাশা বোধ, অবশ্য প্রকাশভঙ্গিতে একটা কাব্যসুলভ দার্শনিকতা রয়েছে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে, সেলিমের সঙ্গে প্রণয়ের উত্তপ্ত স্মৃতি, অপরিমেয় উচ্চাশার সঙ্গে বর্তমান সামান্যতায় গাঢ় অসন্তোষ ধরা পড়েছে। যেমন নিজের রূপ, তেমনি সামর্থ্য–রাজনৈতিক তীক্ষ্ণ মেধা এবং জাহাঙ্গীরকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার শক্তি সম্বন্ধে মেহেরের সংশয় ছিল না। ভাগ্যের চক্রান্তে বর্ধমানের সামান্য কর্মাধ্যক্ষ শের আফগানের পত্নীর জীবনই তাকে সত্য বলে মেনে নিতে হয়েছে। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে যুবরাজের প্রতি তীব্র ভালোবাসার সব উত্তাপ ধরা আছে। চতুর্থ উদ্ধৃতিটিতে মনের আরও জটিল রূপ। সে জাহাঙ্গীরকে গভীরভাবে ভালোবাসে। সে নিশ্চিত জাহাঙ্গীরের মনের উপরে এখনও তার সম্পূর্ণ জয় – এত আত্মবিশ্বাস। কাজেই বাদশাহের অধিকার নিয়ে জাহাঙ্গীর তাকে পেতে চেষ্টা করতে পারে, স্বামীকে ত্যাগ করে বরণ করতে প্ররোচিত করতে পারে। অথবা শের আফগানকে হত্যা করেও তাকে লাভ করতে চাইতে পারে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মেহেরুন্নিসা এতটা ভেবেছিল, জাহাঙ্গীরের মন তার এতই জানা ছিল অথবা মতি-মারফত জাহাঙ্গীরকে জানাচ্ছিল কত সহজে তার গোপন বাসনা এত দূর থেকেও মেহের প্রথম ভাগের মতো পড়তে পারে। এই সব কথার একটাই তাৎপর্য মানসিক আত্মসমর্পণ। কিন্তু বাচ্যার্থে যে নিষেধ তাও আদৌ অর্থহীন নয়। বিবাহিতা

৫. ইতিহাস-খ্যাত নূরজাহানের পুনর্নির্মাণ চেষ্টায় দ্বিজেন্দ্রলাল অংশত সফল হলেও উচ্ছ্বাসাতিরেকের শিকার হয়েছিলেন। তবে একটি নাট্য কবিতায় মোহিতলাল লক্ষ্যভেদ করেছিলেন।

নারী সে, অন্য পুরুষের প্রতি, হোক না তামাম হিন্দুস্তানের বাদশাহ–তার এই মনোভাব পাপের। আর একটা ভাবনার স্তর, মেহের তাকে ভালোবাসলেও নিজেকে সঁপে দেবার জন্য তৈরি হয়ে বসে নেই সে এত সহজলভ্য নয়। তার তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদা আছে–একথাটাও ভারত সম্রাটকে কৌশলে পৌঁছে দেওয়া। মেহেরুন্নিসা হয়তো জানত, কিংবা জানত না, এই কথাগুলি জাহাঙ্গীরকে আরও লুব্ধ, আরও মত্ত করে তুলবে। অথবা ঠিক না জেনেই সে জাহাঙ্গীরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে স্বামী হত্যার জন্য। সংলাপের ভাষায় শক্তিকে ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটায় কিভাবে বিচ্ছুরিত করে তুলতে হয়, সে কৌশল বঙ্কিমের জানা ছিল।

শ্যামা কপালকুণ্ডলার একমাত্র নারী সঙ্গিনী, সংসার জীবনের সঙ্গে তার একমাত্র বন্ধন। তার সঙ্গে আলাপেই নায়িকা পরিবার-জীবনের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুটা বাহ্যজ্ঞান পেয়েছে। তার চেহারায়, পোশাকে এবং স্বভাবের বাইরের দিকে যেটুকু বদল তা ঘটেছে শ্যামার সচেতন চেষ্টায়। নায়িকা-জীবনে শেষ দিকে ঘটনার যে জটটুকু প্রয়োজন ছিল, শ্যামার জন্য ওষুধ আনতে যাবার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। মূল গল্পের দিক থেকে লেখক তাকে বেশ প্রয়োজনীয় চরিত্র করে তুলেছেন। কিন্তু উপন্যাসের জন্য শুধু নয়, তার নিজের স্বভাবেও তাকে সত্য করে তোলা হয়েছে।

শ্যামার মধ্যে কোনো জটিলতা নেই, সেকালের হিন্দু বাঙালির পারিবারিক সৎস্থানে বহু কুলীন বধূর জীবনের প্রতিনিধিত্ব তার মধ্যে। কিন্তু সরাসরি তার হা-হুতাশ না দেখিয়ে প্রকাশের বুদ্ধিদীপ্ত কৌশলে তাকে বিশিষ্টতা দেওয়া হয়েছে।

ভাইয়ের বউ কপালকুণ্ডলাকে পেয়ে সে যে নিঃসঙ্গ জীবনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, হাসিতে রসিকতায় ছড়া বলায় তার চিহ্ন আছে। সন্ন্যাসিনীকে গৃহবধূ করে তোলায় তার যত্নের চেষ্টার শেষ নেই। নিশ্চয় ননদ-বৌদির এই মধুর চিত্রটি বাঙালি সংসারের কতক সত্য। সহজ বুদ্ধিতে সে জানে নারীর জীবনে পুরুষ 'পরশপাথর' – সোনা হয়ে উঠেছে যে-মন তারই পেখম ছড়িয়ে দেবার মতো তার সাজ প্রসাধন, আর তারপরে চরিতার্থতা মাতৃত্বে, 'সোনার পুত্তলি' কোলে পাওয়ায়। একটি ছড়া–

বাঁধার চুলের রাশ, পরাব চিকন বাস
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সীঁথির ধার, কাঁকালেতে চন্দ্রহার,
কানে তোর দিব জোড়া দুল।।
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া, বাটা ভরে পান গুয়া,
রাঙ্গামুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোনার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে,
দেখি ভালো লাগে কিনা লাগে।।[৬]

৬. সন্দেহ নেই খারাপ কবিতা। কিন্তু শ্যামার মুখে ঠিক কবিতা, নূরহাহানী ফরাসি বয়েৎ নিশ্চয় তার জন্য নয়।

এর মধ্যে অনেক আদর অনেক কৌতুক আছে। কিন্তু এর ভিতরে আছে চাপা দুঃখ, যা সে নিজেও জানেনি, অথচ বলেছে। তথাকথিত 'পরশপাথর' সেও পেয়েছিল–কিন্তু 'সোনা' হতে পারেনি–তার সাজসজ্জা কাজে আসেনি–সোনার পুত্তলির খোঁজ মিলল না।

পরের অংশে যখন তার স্বামীসাক্ষাৎ ঘটেছে, এই কৌতুক-হাসি আর নেই। একটা তীব্র ব্যাকুলতা, আশঙ্কা বড় হয়ে উঠেছে–কি করে বহুভর্তৃক স্বামীকে বশ করবে তার চিন্তা। তার ব্যথায় বড় মাপের দুঃখের গৌরব নেই, সংসার জীবনের একান্ত বাস্তব কান্না আছে। আর সর্বোপরি কপালকুণ্ডলার চূড়ান্ত প্রণয়হীনতার পটভূমিতে তার মৃদু গুঞ্জন গভীর বৈপরীত্যে বেজেছে।

কাপালিক চরিত্রটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও উপন্যাসের আরম্ভে এবং শেষে মাত্র দুবার হাজির করা হয়েছে। যেন কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের পরিচয়ের আরম্ভে এবং সব পরিচয়ের চূড়ান্ত পরিণতিতে দ্বারে দাঁড়িয়ে এই কাপালিক একটা পথচিহ্নের মতো, যদিও ঐ পথের খোঁজ সে জানে না। তার সব সচেতন অভিপ্রায় দুবারই ব্যর্থ হয়েছে, যে জাতীয় ভবিষ্যতের কথা সে ভাবেওনি–যেমন কপালকুণ্ডলার আগন্তুকের সঙ্গে বিয়েতে অথবা গঙ্গাবক্ষে লীন হয়ে যাওয়ায়, তাই ঘটেছে। কপালকুণ্ডলায় মানব-সংসারের ঊর্ধ্বচারী আদ্যাপ্রকৃতি-তত্ত্বের যে ব্যঞ্জনা তার চারধারে বৃথাই ঘুরেছে কাপালিক, সে সত্যে প্রবেশ করতে পারেনি। কপালকুণ্ডলাই কি কাপালিকের শক্তি সাধনার চূড়ান্ত সিদ্ধি নয় – ভ্রান্তসাধক যা জানেনি এবং কপালকুণ্ডলাকে যার জন্য সাধনা করতে হয়নি?

কাপালিকের চারধারে লেখক একটা ভয়াল পরিবেশ তৈরি করেছেন। আরম্ভে তার যে-রূপ নবকুমারের চোখে পড়েছিল সংযত ভাষায় এবং উপকরণ নির্বাচনে তা অসূচিভেদ্য, '...কটিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত শার্দুলচর্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষ মালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল...জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছে। ...সম্মুখে নরকপাল..., তন্মধ্যে রক্ত বর্ণ দ্রবপদার্থ রহিয়াছে – এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড প্রথিত রহিয়াছে।'

কাপালিকের ভীষণ রূপ, বীভৎস উদ্দেশ্য, শবসাধনার জন্য নবকুমারকে বলি দেবার চেষ্টা – এ সব সত্ত্বেও লেখক তাকে সাধারণ স্তরের এক নরঘাতক করে তোলেননি। অধিকারী সম্পূর্ণ ভিন্ন মতাবলম্বী হলেও যেমন তাকে 'মহাপুরুষ' বলে আখ্যাত করেছে, তেমনি পাঠকের তাকে এক ব্যক্তিত্ববান বিশাল মানুষ বলে মনে হয়; একটা গম্ভীর আভিজাত্য, স্বল্পবাক–প্রায় মৌন (মাত্র কয়েকটি কথা প্রথম পর্যায়ে সে বলেছে, তাও বেশি সংস্কৃতে), নিজের অভিপ্রায়ে অবিচল, নিঃসংশয়, অবজ্ঞায় চারপাশের জীবমাত্রকে একান্ত ক্ষুদ্র তুচ্ছ শক্তিহীন মনে করা (নবকুমারের প্রতি তার উক্তি : 'মূর্খ। কি জন্য বল প্রকাশ কর? তোমার জন্ম আজি সার্থক হইল। ভৈরবীর

পূজায় তোমার মাংসপিণ্ড অর্পিত হইবেক, ইহার অধিক তোমার তুল্য লোকের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে?')–সব মিলে একটা বৃহৎ ব্যাপার চরিত্রটিতে রয়েছে।

যে মুহূর্তে তার পরিকল্পিত ঘটনাধারায় ছেদ পড়ল, সে কিন্তু আর অবিচল রইল না। অপ্রত্যাশিতভাবে নবকুমারের ন্যায় একট 'বলি' হাতে পেয়ে সে উল্লাস বোধ করেনি। ভৈরবীপ্রেরিত বলে সহজচিত্তে গ্রহণ করেছে। সে বলি হাত ছাড়া হলে সে কিন্তু ভৈরবীর ইচ্ছা বলে তাকে মেনে নেয়নি। কপালকুণ্ডলাকে মুক্তিদায়িনী বলে বুঝেছে–এই মুক্তিদান মহাভৈরবীর নিজ হাতের কাজ বলে অনুভব করেনি। কপালকুণ্ডলাকে সে চেনেনি। অথবা পালিতা যুবতীর এই সক্রিয়তায় সে অন্তরের গভীরে ভাবিত এবং সে কারণে বিস্মিত হয়েছে। নরবলিতে ঐ নারীর চিরকালের অরুচি, কিন্তু কাপালিকের খাঁড়ার তলা থেকে এই যুবককে বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সাহায্য করা – তাহলে কপালকুণ্ডলার মধ্যে নারীচিত্তের স্ফুরণ ঘটল কি? কাপালিকের মনের ভাবনার বিচিত্র তরঙ্গ বঙ্কিম আমাদের জানাননি–এই পর্যায়ের উপন্যাসে তিনি মনের গভীরে স্তরের বিশ্লেষণের দায়িত্ব পাঠকের উপরেই প্রায়শ ছেড়ে দিতেন।

বাইরে কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা ব্যাপার–কাপালিকের সব স্থৈর্য বিপর্যস্ত হয়েছে, এমন কি মনের ও কার্যের স্বাভাবিক ভারসাম্য সে হারিয়ে ফেলেছে। এত সহজে বালিয়াড়ির স্তূপ ভেঙে তার সঙ্গে অতিপরিচিত কাপালিকের অতিপরিচিত মূর্তি। কপালকুণ্ডলার মৃত্যুভয় যেমন দেহগত সত্য, তেমনি তার নিজের মুখ থেকে বেরুনো 'নিমগ্ন কর' কথা দুটি তার স্বভাবজ নির্বিকারত্বের নিদর্শন – স্বপ্নে আতঙ্ক ও নির্ভয় সংলগ্ন হয়েছে।

কপালকুণ্ডলার জীবনে কোনো গ্রন্থি নেই, কিন্তু দেহধারী জীবের যে জৈব বন্ধন তা ছেঁড়াও সহজ নয়। কাপালিকের স্বপ্ন-কথা এবং অনন্ত আকাশজোড়া কালীমূর্তি দর্শনে সে সূত্রও লুপ্ত হলো। কপালকুণ্ডলা নির্বিকার চিত্তে বলি হতে চলল, সে বলি নবকুমারের হাতে বলেও মনে কোনো প্রশ্ন জাগল না। নিত্যকার স্নানযাত্রার মতো শান্তভাবে শ্মশানের মধ্যে দিয়ে অর্ধদগ্ধ শবটি ঘিরে সে চলল (বলিদাতা নবকুমার কিন্তু শবদেহ মাড়িয়ে গেল), সামান্য কম্পনও তার ছিল না, বরং নবকুমার কাঁপছিল বলে মৃদু কণ্ঠে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল। যাকে বলি দেওয়া হবে সে শান্ত নির্বিকার সান্ত্বনাদাত্রী, যে বলি দেবে সে কিন্তু ভীষণ উত্তেজিত উন্মাদবৎ। অবশ্য অল্পক্ষণের মধ্যে প্রমাণ হয়ে গেল, কপালকুণ্ডলা বলি নয়, বলি-গ্রহণকারিণী। সে তো গঙ্গার ভাঙনে ডুবে গঙ্গায় ভেসে অনন্তে লীন, তার পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়ে নবকুমার আত্মঘাতী।

সর্ব কর্ম, চেষ্টা, পৌরুষ, সাধকের সাধনা, বাসনার আগুন, রাজকীয় মহিমা অনায়াসে হারিয়ে যায়, ফুরিয়ে যায়, চিহ্নও রাখে না। অনাসক্ত প্রকৃতি ভীষণে-মধুরে অনন্ত কল্লোলিনী। কপালকুণ্ডলায় মানব-প্রবৃত্তির নিষেধ এবং নিয়তি।

৫ মৃণালিনী :
অনভিপ্রেত প্রাপ্তি

এক

তৃতীয় উপন্যাস মৃণালিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি নতুন উপাদানের সমাবেশ ঘটালেন, আগের লেখায় যাদের দেখা মেলেনি। যেমন –

১. ক. হিন্দু ইতিহাস। আকবর থেকে জাহাঙ্গীরের আমল ধরে মোগল ইতিহাসের পথে প্রথম দুটি উপন্যাস কালানুক্রমিক এগোচ্ছিল। হঠাৎ কয়েকশ বছর পিছিয়ে বক্তিয়ারের বাংলা জয় নিয়ে বই লিখলেন। এই প্রথম এবং একমাত্র উপন্যাস যাতে হিন্দুযুগের রাজা লক্ষ্মণসেনের কথা আছে।

খ. সিংহাসন-দখল ও হারেমের চক্রান্তের বাইরে একটা দেশব্যাপী উত্থান-পতনের সুর অল্প হলেও এই প্রথম বাজল বঙ্কিমে।

২. জাতীয়তাবাদের সুর এই প্রথম শোনা গেল। হিন্দুর স্বাধীনতা রক্ষা মুসলমান আক্রমণকারীদের হাত থেকে। হিন্দু স্বাদেশিকতা বলে একে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না, বিদেশি আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে জাতির স্বাধীনতা-রক্ষার চেষ্টা, সে বিষয়কে আশ্রয় করে আদর্শবাদ ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জন, আবার ব্যক্তিগত স্বার্থে স্বাধীনতা-বিক্রয়–এই সব বিষয় বঙ্কিমের সমকালে উপলব্ধ স্বদেশচেতনায় বেশ বড় মাপের ভাবনা – খুব সুলভও ছিল না।

৩. সন্ন্যাসী-মহাপুরুষ শ্রেণীর মানুষ আগের দুটি উপন্যাসে দুই ভিন্নরূপে এসেছে। এই প্রথম জাতীয় আদর্শের ধারকরূপে মাধবচার্যের আবির্ভাব।

না। স্বামীর চেহারা নয়, তবে নাম তার মনে ছিল। এটুকুই পদ্মাবতীর উত্তরাধিকার। আর একটু আছে–কিশোরী বয়স থেকেই চরিত্রমূলে ছিল অতি তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধ। 'একদিন নবকুমার তাঁহার প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এমনই তাহার চক্ষুঃ প্রদীপ্ত হইয়াছিল, এমনই ললাটে রেখাবিকাশ হইয়াছিল; এমনই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল; এমনই মস্তক হেলিয়াছিল।'

স্বভাবের অন্তর্লীন এই দর্প পরে বেড়েছিল, তার কার্য ও ভাবনার এক প্রধান নিয়ামক শক্তি হয়ে উঠেছিল।

মতির কথা বঙ্কিম বুঝিয়েই বলেছেন,– পরিণত যৌবনে সে চরিত্রের কি রূপ দাঁড়াল তার বিবরণ দিয়েছেন, পাঠকের আবিষ্কার করার অবকাশ রাখেননি, কারণ পরে সে কাজ মুহুর্মুহু তাকে করতে হবে। একটু দীর্ঘ হলেও মূল থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি–ব্যক্তিত্বের ভিতরে ঢোকার জন্য গোড়ার পরিচয়টুকু যথাযথ পাওয়া চাই।

'আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা হইলেন। রাজধানীর অসংখ্যা রূপবতী গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যাসম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই হয় নাই। লুৎফউন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাঁহার মনোবৃত্তিসকল দুর্দম বেগবতী। ইন্দ্রিয়দমনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি, এ কার্য সৎ, এ কার্য অসৎ এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না, যাহা ভালো লাগিত, তাহাই করিতেন। যখন সৎকর্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত তখন সৎকর্ম করিতেন; যখন অসৎকর্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন অসৎকর্ম করিতেন; যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দম হইলে যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফউন্নিসা-সম্বন্ধে জন্মিল। তাঁহার পূর্বস্বামী বর্তমান,–ওমরাহেরা কেহ তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না। তিনিও বড় বিবাহের অনুরাগিনী হইলেন না। মনে ভাবিলেন, কুসুমে কুসুমে বিহারিণী ভ্রমরীর পক্ষচ্ছেদ কেন করাইব?'

এই নারীর চরিত্রে অতি তীব্র উচ্চাশা দেখা দেবে এটাই স্বাভাবিক। যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হৃদয় সম্পর্ক ঘটল। সে দিল্লীশ্বরী হবার স্বপ্ন দেখতে লাগল, কিন্তু স্বপ্ন ঘোরে বা প্রেমমোহে হতচেতন হলো না। তার প্রেম বা বেগম হবার স্বপ্ন কোনোটাই মিথ্যা নয়, কিন্তু সমান সত্য তার সতর্ক দৃষ্টি আর হিসেবী মন। আসলে মানুষের মনের গতি-প্রকৃতির হিসেবটা তার নখাগ্রে ছিল। সেলিমের সঙ্গে মেহেরুন্নিসার পরিচয়-ঘটার পরেই সে বুঝে গেল মেহেরের সঙ্গে যুদ্ধে তার পরাজয় ঘটবেই। বাদশাহ হলে সেলিমকে কেউ মেহের থেকে দূরে রাখতে পারবে না–মতি তাই সেলিমকে বাদশাহী থেকে দূরে রাখার চক্রান্তে একটা বড় ভূমিকা নিল। চক্রান্ত সফল হলে দিল্লীশ্বরী সে হবে না ঠিক, প্রতিদ্বন্দ্বিনী মেহেরুন্নিসাও হতে পারবে না–মেহেরপ্রেমিক সেলিমকে।

রাজনৈতিক চক্রান্ত বা ঐ জাতীয় সুকুশল কর্মোদ্যম ছাড়া মতির পক্ষে বাঁচা সম্ভব ছিল না। ঘরের শান্তি নয়, প্রেমের তৃপ্তি নয়, আত্মনিবেদনের মাধুর্য নয়। কামনার গলিত ধাতু উদ্বেল তার ভিতরে, বিস্ফোরণ না ঘটিয়ে তার রেহাই নেই।

কিন্তু এই চক্রান্ত ব্যর্থ হলো। সেলিম এখন দিল্লীর বাদশাহ। এই সময়ে আরও যে ছোট ঘটনাটি ঘটল, মতির চিত্তবৃত্তির দিকে থেকে তা খুব সামান্য নয়। নবকুমার-কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তার দেখা হলো। নাম শুনে চিনতে পারল এই তার স্বামী। বাদশাহী রূপের আড়ম্বর-দেখা চোখও মুগ্ধ হলো। পেষমনের কাছে তার উক্তি (পেষমন। আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে?' ... সুন্দর পুরুষ বটে কিনা?) অতি সংক্ষিপ্ত এবং আপাত-দৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিকও, কিন্তু ভিতরে তাৎপর্য আছে। নবকুমারের প্রতি মতির চিত্ত যে যে কারণে আকৃষ্ট হয়েছিল –

১. *নবকুমার তার পূর্বস্বামী এটা কোনো সংস্কার হিসেবে নয়–মতির ক্ষেত্রে তা* থাকতে পারেও না, কিন্তু দিল্লী-আগ্রার অতি নাগরিকতায়, উচ্ছৃঙ্খলতায়, চক্র-চক্রান্তের নিত্য আবর্তে, ক্লান্তিকর প্রতিযোগিতার অন্তরালে চিত্তের না জানা গোপন স্তরে যে শান্তির তৃষ্ণা তৈরি হয়েছিল, হয়তো কিশোর বয়সের স্মৃতিকে জড়িয়েই তা পল্লবিত

হচ্ছিল। নবকুমার যখন বলল তার বাড়ি সপ্তগ্রামে, 'বিদেশিনী কোনো উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, 'দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?' নবকুমার বলিলেন, 'নবকুমার শর্মা'। প্রদীপ নিবিয়া গেল।'

রচনার বিশেষ ভঙ্গি বলে দিচ্ছে কৈশোরের স্মৃতিটুকু হঠাৎ মনের গহ্বর থেকে উঠে এল, মতির জীবনের বর্তমানের আলোকোজ্জ্বল প্রদীপের উৎসবকে নিভিয়ে দিল।

২. নবকুমার সুন্দর পুরুষ। সে সৌন্দর্যে রাজধানীর কলুষ নেই।

৩. নবকুমার তার রূপে বিহ্বল, যদিও ওমরাহ-সমাজের নির্লজ্জ লালসা থেকে সে দৃষ্টি পৃথক। (নবকুমার নিমেষশূন্য চক্ষে এই নতুন নতুন শোভা দেখিতে ছিলেন। '... আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছি কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।')

৪. স্বামীর স্ত্রী কপালকুণ্ডলার অপার্থিব রূপ দেখে মতি বিস্মিত হলো। তার মতো গর্বিতা নারীও মনে মনে স্বীকার করে নিল এ অতুলনীয়া। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ তার স্বাতন্ত্র্যে। যদিও তার স্বরূপ মতি জানে না। মতি শুধু এটুকু বুঝল এই অসংস্কৃত অমার্জিত গ্রাম্য রূপে (আসলে আরণ্য) এমন কিছু আছে যার তুলনা রাজার হারেমে মিলবে না। নিজের গায়ের অলঙ্কার খুলে দেওয়ার মধ্যে শুদ্ধ সৌন্দর্য-স্তুতি আছে, সঙ্গে আছে রূপে যে-পরাজয় স্বর্ণ-রত্নে তাকে ঢেকে দেবার অহংকার। কপালকুণ্ডলা তার স্বামীর জীবন ও মন জুড়ে–এ তার কাছে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান মনে হলো। রূপের পরাজয়ের বদলে যদি হতো তার প্রেমের জয়।

৫. অপরিচিত নূতন জীবন, নূতন ধরনের মানুষ সম্পর্কে রোম্যান্টিক আকর্ষণ।

কিন্তু এই সব মানসিক ব্যাপার মিলে তাকে হয়তো ব্যাকুল করত, দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে দিত না, যদি না তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হতো, যদি না দেখত মেহেরুন্নিসা যুবরাজের প্রেমের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছে। মেহেরের অধীন হয়ে থাকা নয়, এবার তার পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের দিকে, নাগরিক প্রতিযোগিতা যার নাগাল পাবে না।

মতিবিবির মনে এত সব সূক্ষ্ম বক্র ভাব ও ভাবনার তারগুলো বুনট হয়ে গেলেও নবকুমারকে সে ভালোবেসেছিল–এবং ঐরকমই তার প্রেম। সব মানুষের প্রেম এক নয়। কামে-প্রেমে লোহা-সোনার মতো স্বরূপ বিলক্ষণও নয়। ছিল রাজধানী জুড়ে প্রেম-প্রেম খেলা। তার মধ্যে সেলিমের সঙ্গে তার সম্বন্ধ। কিন্তু আমি তাকে প্রেমই বলব–যদিও তা স্বার্থান্বেষী, তাতে হৃদয় গলেনি। বুদ্ধিতে উচ্চাশার জীগিষার ধার পড়েছে। নবকুমারের প্রতি যে প্রেমের উন্মেষ তা তৈরি করেছে তার নিজের মন, অনেক হিসেবের পথ ধরে এগুলেও এখানে পার্থিব প্রাপ্তির–ধন-মর্যাদা-রাজ্যাধিকারের কোনো প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন শুধু তার মনের উপরে সর্বময় কর্তৃত্বের, শুধু নিবেদিত নিজের হৃদয়টি যেন প্রিয়তম ভালোবাসায় গ্রহণ করে এই বাসনা। এখানে মতিবিবির নতুন জন্ম। লেখক তৃতীয় খণ্ডের নাম দিয়েছেন 'আত্মমন্দিরে।' মতির আত্মবিশ্লেষণ কাব্যিক ভাষায় প্রকাশিত। তার নিজের কথায় 'আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণ-রত্নাদিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয় সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি-যদি পাষাণমধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।'

দিল্লীর বাদশাহ থাকতে ভালোবাসার জন্য অন্য সামান্য মানুষের খোঁজ কেন, এর উত্তরে মতি বলেছে 'আকাশে চন্দ্রসূর্য থাকিতে জল অধোগামী কেন? ...ললাটলিখন।' এ সমস্যার সমাধান নেই, বিশেষ এক জনকে না ভালোবেসে পারা গেল না। কোনো মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এ রহস্য ভেদ করেনি।

লেখক সিদ্ধান্ত করেছেন, 'পাষাণমধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইয়াছিল।' মতির হৃদয় গলে গেলেও তা তরল পাঁক নয়, গলে যাওয়া পাথর যার অন্য নাম লাভা। তাই তার আত্মনিবেদনেও গর্ব আছে, জয়ের বাসনা তীব্র। নবকুমারকে সে জয় করে নিতে চায়, তার জন্য যুদ্ধে সে পিছ-পা নয়। সে যে নবকুমারের জন্য আগ্রার সিংহাসন ত্যাগ করে এসেছে প্রেমের এই গর্ব সে উচ্চকণ্ঠে বলতে জানে, এবং এই প্রতিজ্ঞাও–এ জন্মে সে আশা ত্যাগ করবে না।

হতাশার বেপথু মূর্তি মতির নয়। সে অবিলম্বে তৎপর হয়ে ওঠে। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। তার বিশ্লেষণে কপালকুণ্ডলার রূপ ও প্রেমের বন্ধনই তাদের মিলনের বাধা। নবকুমারের নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্নটি তার মনে আসেনি।

মতিবিবির পরিণতি কিন্তু অদ্ভুত। এত সরব উজ্জ্বল কর্মতৎপর নারী হঠাৎ নীরবে হারিয়ে গেল। কপালকুণ্ডলার সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিন্ত হয়ে সে বাড়ি ফিরেছে। কামনাসিদ্ধির প্রত্যাশায় তার প্রতীক্ষা–ঔপন্যাসিক সে দিকে নিমেষের জন্য তাকালেন না–এত তুচ্ছ অনুল্লেখ্য বিবর্ণ ও সম্পূর্ণ আবাস্তর হয়ে গেল মতিবিবি।

নবকুমার উপন্যাসের নায়ক। তার চরিত্রে গোড়াতে বেশ সক্রিয়তা ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় মেলে; নৌকোযাত্রীদের বিপদে আশঙ্কায় ধীরভাবে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা তার ছিল। সাহসের সঙ্গে নির্জন বনে একাই কাঠ আনতে গিয়েছিল। ধর্ম ও জীবনাচার সম্পর্কে নিজের কালের তুলনায় বেশ উদারচিত্ততার পরিচয় মিলছে। তীর্থদর্শনে ধর্ম নেই, যদি মন পড়ে থাকে স্বার্থ-চিন্তায়–একথা প্রতিবেশী বৃদ্ধকে সে বলেছে। নিজে সাগরে এসেছিল তীর্থ করতে নয়, সমুদ্র দেখতে। এই সৌন্দর্যমুগ্ধতার দিকে লেখকের বিশেষ তর্জনী তার আবেগতপ্ত কণ্ঠস্বরে, রঘুবংশের শ্লোক উচ্চারণে। যুবক নবকুমারের বিশেষ ভাবে নিসর্গ-সৌন্দর্যে আত্মসমর্পণের মধ্যে তার প্রথম ব্যর্থ নারী-সংসর্গের কোনো বিপরীত প্রভাব আছে কিনা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কিশোরী পদ্মাবতী অবশ্য সুন্দরী ছিল। প্রথম তারুণ্যের সেই মিলন সামাজিক কারণে চূড়ান্ত বিচ্ছেদে শেষ হলো। সেই তিক্ত স্মৃতি নবকুমার ভুলতে পারলে নিশ্চয় আবার বিয়ে করত, কারণ বিয়ে সেকালের বাঙালি পুরুষের সবচেয়ে সহজ এবং সর্বজনীন কাজ ছিল। নবকুমারের স্মৃতির বিষ গোপনেই ছিল–বঙ্কিম তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার কথা বলেননি। কিন্তু ঘটনাটির উল্লেখও করেছেন। নিশ্চয়ই তা অকারণে নয়। লেখকের বিবরণ 'রাজমহলে যাওয়ার পরে শ্বশুরের বা বনিতার কি অবস্থা হইল, তাহা নবকুমারের জানিতে পারিবার কোনো উপায় রহিল না এবং এ পর্যন্ত কখন কিছু জানিতেও পারিলেন না। নবকুমার বিরাগবশতঃ আর দার-পরিগ্রহ করিলেন না।' নায়কের মনের কুট অংশ সম্বন্ধে পাঠককে সতর্ক করে।

নবকুমার সমুদ্র দেখতে এসেছিল। প্রথমবার সমুদ্র দেখছে, কালিদাস তার মুগ্ধতার ভাষা যুগিয়েছেন। দ্বিতীয়ার সে সমুদ্র দেখল এবং কপালকুণ্ডলাকে। সমুদ্র দেখে নবকুমার দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেছিল, লেখকের বক্তব্য, হয়ত তার মনে ভূতপূর্ব কোনো সুখের উদয় হয়েছিল। এ ইঙ্গিত পাঠকদের পড়ার জন্য। এ কি নবকুমারের ব্যর্থ দাম্পত্য জীবন তথা রমণী-সংসর্গের ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্মৃতি? নবকুমারকে পদ্মাবতী একেবারে ছেড়ে যায়নি। কোথায় কিভাবে আছে তা তার নিজেরও অজানা।

লক্ষণীয়, এবারে সমুদ্র দেখতে দেখতে সে কপালকুণ্ডলাকে দেখল। তার বাক্যস্ফুর্তি ঘটল না। তার সক্রিয়তা–কি ভাবনায়, কি কার্যে বা বাক্যে, স্তম্ভিত হয়ে গেল। কাপালিক যখন তাকে বলি দেবার জন্য নিয়ে গেল তার আত্মরক্ষার চেষ্টা আরও প্রবল হয়ে ওঠার কথা। মৃত্যুভয়ে তার আরও বেশি কাতর হবার কথা। পরে অধিকারীর বাড়িতে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাবে তার অনেক বেশি রোমাঞ্চিত হবার কথা। এই নারী-সংসর্গের শুরু থেকেই নায়ক নিষ্ক্রিয়, বিমনা, প্রায় নীরব। তার সব পৌরুষ, যৌন ভাবাবেগ, সব অনুভূতি কোন্ অপার্থিব শক্তির দ্বারা গ্রস্ত হল?

অথচ পথে কিন্তু ভগ্নযান মতিবিবিকে নিজের কাঁধে ভর রেখে সে নিঃসঙ্কোচে নিরাপদ পান্থশালায় পৌঁছে দিয়েছে। তার অলঙ্কৃত সজ্জিত নারী রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছে, নিশ্চয়ই ভিতরে চঞ্চলও হয়েছে। তার সৌন্দর্যের স্তবই করেছে–'আমি স্ত্রীলোক দেখিয়াছে; কিন্তু এরূপ সুন্দরী দেখি নাই।' এ নবকুমার যেন অন্য মানুষ।

আর একটি কথা। নবকুমার স্পষ্টই মতিকে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা বলেছে। পরমুহূর্তে কপালকুণ্ডলার সৌন্দর্য যে অদ্বিতীয় তাও বলেছে। আসলে দুটি উক্তিই সত্য। মতিবিবি যদি শ্রেষ্ঠা সুন্দরী হয় তাহলে কপালকুণ্ডলার রূপ সব তুলনার ঊর্ধ্বে, মানবিক বাসনার অতীত। নবকুমার তার থই পায় না, পেতে চায় না বা চাইবার ক্ষমতা রাখে না।

মতিবিবির সংস্পর্শে নবকুমার সহজ স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। তার আবেদনে সে বারবার সাড়া দিয়ে দেখা করতে গিয়েছে। প্রণয়-নিবেদন শুনেছে। অস্বীকার করেছে; আবার গিয়েছে। চরম কথা যেদিন বলল, নৈতিক মূল্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে–সে 'যবনীজার' হতে রাজি নয়। কিন্তু যবনী যদি পত্নী হয়–তার উত্তর দিতে পারেনি। নবকুমারের মনে কি মতি প্রবেশ করেছিল? নবকুমার তা জানে না, মানতে রাজি নয়, তার গোটা অস্তিত্ব অনুভূতি গ্রাস করে আছে কপালকুণ্ডলা, তার স্ত্রী হলেও যাকে সে পায়নি। তীক্ষ্ণধী মতির কি মনে হয়েছিল কপালকুণ্ডলার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারলে কালে নবকুমারকে সে জয় করে নেবে? সব অস্বীকৃতির ফাঁক দিয়ে সে কি মনের মধ্যে একটি পা ফেলবার সাফল্য অনুভব করেছিল?

আর একবার তুলনা। মতিবিবির ক্ষেত্রে পৌরুষ ও নীতির আস্ফালন দেখিয়ে নায়ক তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে। শুধু অধিকারীর কথায় অজ্ঞাতকুলশীলা পোর্তুগিজ-অপহৃতা, কাপালিকলালিতা কপালকুণ্ডলাকে গ্রহণ করার সময় মনে কোনো প্রশ্ন আসেনি কেন? শুধু কৃতজ্ঞতায়? আসলে কপালকুণ্ডলার সংস্পর্শে নবকুমারের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, সর্বদাই পেত।

কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের এক বছরের দাম্পত্য জীবন কিভাবে কেটেছিল তার স্পষ্ট বিবরণ নেই। কিন্তু মনে বা দেহের নৈকট্য ঘটেনি এটুকু বুঝে নেওয়া সহজ। আসলে অনন্ত তৃষ্ণা বুকে নিয়ে অসীম রূপ-সমুদ্রের পাড়ে সে দাঁড়িয়ে–তবুও দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কোনো অসামান্য রূপসী তার জন্য আগ্রার সিংহাসন ছেড়ে এসেছে, কিন্তু নিজের বিবাহিতা পত্নী এই সরল বনবালার মনের কোনো দরজা এই এক বছরেও খুলল না। তারা দুজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, কিন্তু একে অন্যের ভাষাও বোঝে না। কপালকুণ্ডলা রাতে জঙ্গলের মধ্যে ওষুধ খুঁজতে যাবে। নবকুমার সে বিষয়ে দু-একটি মমত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিল। কপালকুণ্ডলা যে উত্তর দিল তা একেবারে অপ্রত্যাশিত ও স্বতন্ত্র। এত দূরত্ব।

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে ভালোবাসতে চাইছিল, তার প্রেমে সন্দেহ করতে চাইছিল, তার অন্যপ্রণয়ী সম্বন্ধে ঈর্ষান্বিত হতে চাইছিল। নবকুমার এক বৎসরে নিশ্চয় করে বুঝেছিল কপালকুণ্ডলা তাকে ভালোবাসে না। কিন্তু কেন? অন্য কাউকে ভালোবাসে? যদি ভালোবাসার সুযোগ না মিলল, সন্দেহ করা যাক–অবিশ্বাস করা। প্রেমের সঙ্গে এগুলি সংশ্লিষ্ট, প্রেমের মতো মানবিক। নবকুমার হৃদয়ে গভীরে জেনেছিল, কোনো মানবিক বৃত্তির আত্মীয়তা নেই এই রমণীতে। এই ভীষণ শীতল গহন গভীর অজ্ঞাত অপরিচিতা নারীর সংসর্গে প্রতিক্ষণ তার পৌরুষ নির্জিত। প্রচণ্ড বেগে সে জেগে উঠতে চায়। অন্তত সন্দেহে, যখন কিছুতে প্রেমে জাগরণ ঘটল না। রক্তমাংসের নারীর মতো কপালকুণ্ডলা অবিশ্বাসিনী হোক, নিসর্গ-শক্তির মতো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ঊর্ধ্বচারী নয়। এখানেই নবকুমারের দীর্ঘস্থায়ী স্তব্ধতা থেকে আকস্মিক বিস্ফোরিত জাগরণ।

নবকুমারের সন্দেহ ব্যাপারটি তাই আকস্মিক, আর সেটাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। তবে ব্রাহ্মণবেশীর চিঠি, কাপালিকের চক্রান্ত দিয়ে একটা আপাত বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। নবকুমার ক্রোধে ক্ষোভে যন্ত্রণায় হতচেতন, সব বিবেচনাবোধ সে হারিয়ে ফেলেছে। সে বারবার মদ্যপান করে নিজের নিশ্চেষ্টতাকে উত্তেজিত করতে চাইছে। আসলে এক বছরের মনের জট হঠাৎ খোলার চেষ্টায় বিপর্যয়। সে কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে চলেছে। কিন্তু এ সবই তার চিত্তজাগরণের পথ, নিজের মনোকুট দিয়ে গড়া একটা আবরণ ভাঙা। সে মুহূর্তে হৃদয় খুঁড়ে বেরিয়ে এল সেই একটি আর্তনাদ, বাকি সব যার প্রসাধন, 'কাঁদিব কেন? তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ি। তুমি ত কখনও রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই–(নবকুমার মনের গভীরে জেনেছে এ নারী পূর্ণ হৃদয়হীনা)...তুমি ত কখনও আপনার হৃৎপিণ্ড আপনি ছেদন করিয়া শ্মশানে ফেলিতে আইস নাই।'

কিন্তু বিশ্বাসে-অবিশ্বাসে সমান নির্বিচার কাপালকুণ্ডলা গঙ্গার ভাঙনে কোথায় ভেসে গেল। আর নবকুমারও–তার উত্তপ্ত বাসনা নিয়ে, প্রণয়-জিজ্ঞাসার উত্তরে একটি মধুর কোমল শব্দও না শুনে সেই অপ্রাপনীয়ার সন্ধানে মৃত্যুর গভীরে নেমে গেল।

নবকুমারকে কপালকুণ্ডলা প্রথম দেখায় প্রশ্ন করেছিল 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ? ভ্রষ্টপথ সেই পথিককে কাপালিকের খড়্গের মুখ থেকে বাঁচিয়ে, স্বামীরূপে গ্রহণ করে আজ নদীগর্ভে কোথায় নিয়ে চলল? নবকুমার ভাগ্যের হাতে এত দিন বলি হলো।

কপালকুণ্ডলাকে মৃন্ময়ী নাম দিয়েছিল তার শ্বশুরবাড়ির লোক। সযত্নে তার এলোচুল বেঁধে তাকে মৃৎময়ী করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে মৃন্ময়ী করা যায় না, সংক্ষেপে এটাই তার চরিত্র-রহস্য।

কপালকুণ্ডলার নির্জন সৈকতে অরণ্য-মধ্যে কাপালিকের দ্বারা পালিতা জনসংসর্গ না ঘটায় সাংসারিক মানুষের বোধ এবং মূল্য কোনোটাই তার স্বভাবে বর্তায়নি। অধিকারীর সঙ্গে মাঝেমাঝে সাক্ষাতের ফলেই সম্ভবত করুণার জন্ম, কাপালিকে তার লেশমাত্র ছিল না। অথবা নিসর্গ থেকেই সে পেয়েছিল নির্বিকার নিরাসক্তি এবং নির্মম হৃদয়হীন কারুণ্য। কিংবা এসবই তার চরিত্র, স্বভাবমূল্যের রহস্য, কোনো উৎসের খোঁজ মেলে না।

কপালকুণ্ডলা মানবীরূপে ও স্বভাবে সংশয় রাখেননি লেখক, মোটারকম ইতিহাস বিবৃত করেছেন। তার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের সরল যুক্তিসিদ্ধ একটা ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। তাকে নিসর্গের প্রতীক–আদি প্রকৃতির নারী-রূপ বলে মনে করার কারণ নেই। কিন্তু তার চরিত্রের জানালা দিয়ে পাঠককে প্রকৃতি-রহস্যের মুখে দাঁড়াতে হয়। এ উপন্যাসে মানবজীবনের সে-ই নিয়তি।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে দেখে উদ্বিগ্ন হলো। নরবলি তার ভালো লাগত না। তান্ত্রিকাচারে অভ্যস্ত হলেও তার মনের যোগ ছিল না তাতে–কোনো কিছুর সঙ্গেই যেমন ছিল না তার মানস-সম্পর্ক। আগেও এখানে নিশ্চয় নরবলি হয়েছে। কিন্তু নবকুমারকে এতে যত্নে সে বাঁচাল কেন? তার যৌন চেতনার গভীরে সামান্যতম আলোড়ন কি জাগেনি? এই প্রশ্নটিই শুধু মনে আসে। উত্তরের আভাসটুকুও নেই।

কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের বিয়ে–তার মনের উপর প্রায় প্রতিক্রিয়াহীন। শুধু অধিকারীর উপদেশে জীবনরক্ষার জন্য। আর নিজের জীবনরক্ষায়ও কি তার গভীর আগ্রহ ছিল?

অধিকারীর অনুসরণে অন্ধ বালিকার মতো সে কালীর পায়ে ত্রিপত্র দিয়েছিল। কি তার মানস-অভিপ্রায়? সত্যি কি কিছু ছিল? ভবিষ্যৎ ভালো-মন্দের হদিস যদি প্রার্থনা করে থাকে, কি ভালো কি মন্দ জানত কি? যে মন ভালো-মন্দের পার্থক্য করে সে মন কি ছিল কপালকুণ্ডলার? অধিকারীর দেওয়া ত্রিপত্র পড়েনি, কপালকুণ্ডলার দেওয়া ত্রিপত্র পড়ল কেন– একই উদ্দেশ্যে তো অর্পিত হয়েছিল। কপালকুণ্ডলা পরেও শ্যামার কাছে এ ঘটনার উল্লেখ করেছিল। কিন্তু নেহাত সংস্কার ছাড়া আর কিছু এখানে মিলছে না। সাংসারিক বা দাম্পত্য জীবনের কোনো মঙ্গলই তো তার কাম্য ছিল না।

মতি তাকে অলঙ্কার দিল কেন–সে প্রশ্ন তোলেনি, আনন্দিত হয়নি, ঈর্ষাবোধ করেনি, বিস্ময়ও নয়। ভিখারিকে সে সব কিছু দিল নিরুদ্বেগ চিত্তে, দানের গর্ব নেই, অলঙ্কারে বিতৃষ্ণার জন্যও নয়; ঠিক যেমন পরবর্তী কালে মতির এক কথায় স্বামী এবং নিজের জীবন দুটোই দিতে সহজেই রাজি হয়েছিল। ভিখিরির গয়নার বাক্স নিয়ে ছোটা দেখে সে বরং অবাক হলো।

ননদ শ্যামা তাকে সাজিয়ে শিখিয়ে গৃহবধূ করে তুলতে চেয়েছিল। এক বছরের সংস্পর্শে ও অভিজ্ঞতায় তার বাইরের দিকে কিছু বদলও ঘটেছিল। কিন্তু প্রথম থেকেই

এ জীবনে সে আকর্ষণ বোধ করেনি, সমুদ্র সৈকতে বনে একাকী ঘুরে বেড়াবার অকারণ স্পৃহা বোধ হয় তার কাম্য ছিল। অথবা বর্তমান অবস্থায় অতৃপ্তিই সে ব্যক্ত করেছে। সেজেগুঁজে ঘরসংসার করে সকলকে আনন্দ দিয়ে কিসের সুখ? কিসের সুখ সাধনে রূপে পুরুষকে আকর্ষণ করে? সে একটি মোক্ষম উদাহরণ দিয়েছে, সুন্দর ফুল দেখে যদি মানুষের সুখ তো ফুলের কি? আসলে যে হৃদয়পুটে সুখ-দুঃখ জন্মে কপালকুণ্ডলায় তা একান্ত সঙ্কীর্ণ ছিল, অথবা এত বেশি বিস্মৃত যে মানুষের হিসেব মেলে না।

তবে সংসারে থেকে একটা ব্যাপার তার মনে লেগেছিল, স্ত্রীলোককে বিশ্বাস না করবার একটা ঝোঁক পুরুষদের। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে যৌনতার যে সম্পর্ক সে ঠিক বুঝত না। কিন্তু নবকুমারের মৌন ভেদ করে সে অনুভব করত একটা মূঢ় প্রশ্ন সেখানে উদ্যত। এখানেই কি অবিশ্বাস? কিছু বুঝে কিছু না বুঝে এই শব্দগুলির ব্যবহার, আর শ্যামাসুন্দরীর বা কারুর উপকার যদি কিছু করা যায়–যদিও সে জানত না সেই উপকার কি, কেন, আর সত্যি উপকার কিনা। ভিখারির উপকারে গয়নার বাক্স দিয়ে দিতে, শ্যামার উপকারে ওষুধ আনতে, মতির উপকারে স্বামীদান করতে বা কাপালিকের উপকারে প্রাণদানে তার সমান আগ্রহ। এই পৃথিবীর সঙ্গে এটুকুই তার বন্ধন। কারণ মনের মধ্যে তাকিয়ে দেখল, ব্রাহ্মণকুমার নবকুমারকে দেখতে পেল না।

কিন্তু মানবমনের গোপন অন্তঃপুর তো তার জানা থাকে না। কখনও তা স্বপ্নে এসে এঁকে-বেঁকে ভিড় করে। কপালকুণ্ডলার স্বপ্নটি বিশ্লেষণের যোগ্য।

কপালকুণ্ডলার দেখা স্বপ্নটি কতক রূপকধর্মী, কিছুটা সঙ্কেত-গূঢ়। প্রথমাংশে একটি সৌন্দর্য ও আনন্দের ভাবানুসঙ্গ। বাসন্তী রঙের পতাকা, রাধাশ্যামের প্রণয়গীত, নায়িকদের ফুলের মালা প্রভৃতি প্রণয় ও যৌবনের যে সুর বাজাল, নায়িকার মনে তার শিকড় কোথায়? গোটা উপন্যাসে তো সে কথা মিলল না, বরং কপালকুণ্ডলা তার মনের মধ্যে খুঁজে কাউকে পায়নি– ব্রাহ্মণকুমারকেও নয়। সেটাই স্বাভাবিক ! কারণ ভাবনায় নয়, গহন অবচেতনায় যৌনচেতনার অতি সূক্ষ্ম যে তন্তু জড়িয়ে যাচ্ছিল–এখানে তার প্রকাশ বাঁকা পথে। ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্বে' বিষয়টি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, ' সেক্স-অ্যাট্রাকসন' নৈসর্গিক প্রবৃত্তিজাত নয়, নারী-প্রকৃতির মৌলিক অঙ্গ নয়, কৃত্রিম সমাজ ও সভ্যতার ফল। বঙ্কিমেরও অভিপ্রায় কি তাই ছিল? বঙ্কিম কিন্তু অনেক বড় সত্যদৃষ্টা ছিলেন, তাই অপ্রকট যৌনতা প্রকাশের কিঞ্চিৎ পথ করে রেখেছেন। নারীর অবিশ্বাসিনী হবার ব্যাপারটিকে না বুঝেও তা নিয়ে বারবার কথা বলায়ও এই বোধ, সামাজিক সংস্পর্শের ফলে কিছুটা বিকৃত ভাবে প্রকাশিত–কিংবা যুবক নবকুমারের প্রাণ বাঁচানোয় শুধুই করুণা নয়, নারী-প্রকৃতির মৌল যৌন-চেতনারও কিছু প্রতিফলন। কপালকুণ্ডলায় নারীসুলভ চেতনা অন্তত অবচেতনারও কোথাও বীজাকারে আছে – তা বোঝাবার জন্যই এ ধরনের ব্যঞ্জনার প্রয়োজন ছিল। স্বপ্নের তৃতীয়াংশ মৃত্যুভয়ের রূপক–পঞ্চভূতাত্মক দেহের বন্ধন। পড়ে যাওয়াটা প্রায় প্রতীকের মতো। অধ্যায় শীর্ষের উদ্ধৃতিতে উপমা বলেও ধরা যায় 'a thundersmitten oak.' এই বজ্রপাত আসলে তার আত্মবিস্মরণ।

কাপালিকের দ্বিতীয় স্তরটি এই 'বজ্রপাত মহাবৃক্ষের' ছবি। তার দুই বলিষ্ঠ বাহু ভেঙে অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছে, দেহধৃত আত্মারও নির্মম পতন হয়েছে। কাপালিক আর

সরল ঋজু ভীষণ নেই, সে চক্রান্তকারী হয়ে উঠেছে। প্রতিহিংসাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য আজ। কাপালিক বামাচারী তন্ত্র সাধনার যে সিদ্ধি কামনা করেছিল তার স্বরূপ উপন্যাসে বিবৃত হয়নি। তার কতটা পার্থিব উচ্চাশা, কতটা অপার্থিব মোক্ষ-মুক্তি তা পাঠক জানে না। কিন্তু বাহু ভেঙে যাওয়ায় সেই আয়ত্তপ্রায় সিদ্ধি স্খলিত। তন্ত্র-সাধনা পঞ্চকায়াত্মক শরীরের পূর্ণাঙ্গ বলিষ্ঠতা ছাড়া অসিদ্ধ। কাপালিক এর জন্য কপালকুণ্ডলাকে অর্থাৎ নবকুমারকে নিয়ে তার পলায়নকেই দায়ী করে, নিজের অপ্রকৃতিস্থ অনুসন্ধানকে নয়। কাপালিকের মনের গভীরে কোনো স্তরে কপালকুণ্ডলা-সংশ্লিষ্ট এক নিগূঢ় বিদ্বেষ জমা হয়েছে। সেখানে বহুকাল পোষিত ও অচরিতার্থ সূক্ষ্ম যৌন বাসনা থাকা সম্ভব। সাধনমার্গ থেকে ভ্রষ্ট হবার ক্রোধ–যা কোনো ব্যক্তিবিশেষকে দোষী করে মানসিক স্বস্তি পেতে চায় তাও কপালকুণ্ডলার প্রতিই মনের তর্জনী তুলল। কারণ কাপালিকের সব সাধনার অন্তরালে মানবিক ভাবাবেগ কপালকুণ্ডলা– মাত্র কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধেই জাগ্রত। সুপ্ত সেই ভাবনার প্রকাশ আগে ঘটেনি, কিন্তু তার স্বপ্নে বাঁকা ভাবে ছায়া ফেলেছে। স্বপ্নে ভবানী অবির্ভূতা হয়ে তাকে বলেছে, 'রে দুরাচার, তোরই চিত্তশুদ্ধিহেতু আমার পূজার এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্যন্ত ইন্দ্রিয় লালসা বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এতদিন আমার পূজা করিস্ নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্বকৃত ফল বিনষ্ট হইল। ...সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে।...'

কাপালিক এই স্বপ্নের কথা তৈরি করে বলেনি, কারণ অতটা কল্পনাশক্তি তার ছিল না, তা ছাড়া লেখক বলেছেন 'স্বপ্নের কথা বলিতে বলিতে কাপালিকে শরীর রোমাঞ্চিত হইল।' এরূপ অভিনয় তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এবং এ স্বপ্ন তার মনোকূটের, তার ধর্মবিশ্বাসের, এ প্রশ্ন তার প্রতিহিংসা বাসনার বিশ্বাস্য ভগ্ন-প্রতিমা (distorted image)।

কাপালিক নবকুমারকে 'মাংসপিণ্ড' বলে মনে করেছিল–তাকে বলি দেবার পিছনে দ্বেষ-হিংসা-ক্রোধাদি ছিল না। কপালকুণ্ডলাকে তার একদা ইন্দ্রিয়লালসার পাত্রী এবং সম্প্রতি অনায়ত্ত নারী বলে ক্রোধে ঈর্ষায়(?) প্রতিহিংসায় বধ করতে চেয়েছে। 'ভবানীর কৃপা লাভের বাসনা' বা দেবীর প্রত্যাদেশ আসলে তার নিজের ব্যক্তিগত অভিলাষ। কিন্তু মিথ্যা করে ভবানীর উপরে নিজে অভিপ্রায় চাপায়নি। তার মনের গঠনই দেবীর আদেশে আর নিজের উদ্দেশ্যে এক করে ফেলেছে।

কাপালিকের পরিণাম বিস্ময়ের। পূজার ও বলির সব আয়োজন নিয়ে সে নিশ্চিত বসে রইল। কার বলি? কে দেবে, কে গ্রহণ করবে–অজ্ঞাত অন্য উৎসে তার যে মীমাংসা ঘটে গেল–কাপালিককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে, অস্বীকার করে, সে জানতেও পারল না, তা বোঝার ক্ষমতাও তার ছিল না এখানেই চরিত্র-কল্পনায় লেখকের অশিথিল দৃঢ়মুষ্টি।

সাত

মতিবিবি এই উপন্যাসের উজ্জ্বল চরিত্র। মোগল ইতিহাস থেকে বিকিরিত ঐশ্বর্য, রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং লোভ, কাম-ঈর্ষা-হিংসাদি বৃত্তি তাকে বৈদ্যুতি দিয়েছে। তীক্ষ্ণ

বুদ্ধি, চাতুর্য, কর্মতৎপরতা, নাগর বৈদগ্ধা তার স্বভাবের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ। পদ্মাবতী-মতিবিবি-লুৎফউন্নিসা নামে যেমন পরিবর্তন, চরিত্রেরও তেমনি বিচিত্র রূপ, কিন্তু একই ব্যক্তিত্ব।

মতির বয়স যখন তের তখন তার বাবা ধর্মান্তর গ্রহণ করে। তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, শ্বশুরবাড়ি থেকে সে পরিত্যক্ত হয়। তখনকার কিছু স্মৃতিমাত্র ছিল, সে স্মৃতি মধুর কিনা জানা যায়।

৪. হেমচন্দ্রকে একটু ক্রুদ্ধ নায়ক (angry hero) রূপে কল্পনা করা হয়েছিল, যদিও চরিত্রটি বিকশিত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত অতি সাধারণ 'ধীরোদ্ধত' শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ হয়ে থেকেছে।

৫. কপালকুণ্ডলার এক প্রান্তে গুটি দুয়েক ছড়ার ব্যবহার ছিল, মৃণালিনীতে অনেকগুলি গান উপন্যাসের নানা অংশে বিন্যস্ত হয়ে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা এনেছে।

৬. মূলকাহিনী এবং উপকাহিনীর মধ্যে নতুন ধরনের সম্পর্ক আবিষ্কারের চেষ্টা। দুর্গেশনন্দিনী বা কপালকুণ্ডলার যে কোনো প্রসঙ্গ বা উপবৃত্ত মূল কাহিনীর সম্পূর্ণ অনুগত। এই উপন্যাসে মৃণালিনীর কথা প্রত্যক্ষমত মুখ্য হলেও, মনোরমার কথা আদৌ তার অনুগামী বা সাহায্যকারী নয়। বরং শেষ পর্যন্ত কোনটি মুখ্য এ প্রশ্নের মীমাংসা কঠিন হয়ে পড়ে। এই উপন্যাসে প্রায় স্বাধীন দুই অংশের সংযোগ সাধনের এক নতুন পরীক্ষা।

কিন্তু সে সঙ্গে দৃষ্টি এড়াবার নয় যে পূর্বানুবৃত্তি সমানে চলেছে। আগের দুটি লেখা যাতে হাত পাকানো হয়েছে তার অনেক কিছুই আছে এখানেও–

১. ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে মানবিক হৃদয়বৃত্তির কাহিনী পরিবেশন – যদিও পরপর তিনটিতে মিশ্রণের রীতি এবং ফল তিন রকম।

২. আলোচ্য দুটি কাহিনীই প্রেম নিয়ে।

২. ক. প্রণয়-বিষয়ে নৈতিকতার প্রশ্ন গুরুত্ব পেয়েছে। নায়িকার সতীত্বে নায়কের সন্দেহ, এবং সন্দেহ নিরসন ঠিক আগেরই মতো।

খ. প্রেমের তৃষ্ণা যে পাপ নিয়ে আসে তার কথা।

৩. রহস্যময়ী, সংসার-সীমায় আবদ্ধ নয় এমন নারীর কথা – কপালকুণ্ডলার অনুবর্তন।

৪. যত পৃথক ধরনের হোক আগের দুই উপন্যাসের মতো সন্ন্যাসী-মহাপুরুষের চরিত্রের গুরুত্ব।

৫. জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী (কেশব-কন্যার সহমরণ শেষ পর্যন্ত ফলে যাওয়া)।

৬. বিন্যাসরীতি এবং সম্বন্ধ অন্য রকমের হলেও মূল কাহিনীর সহযোগী কাহিনী সংযোজন প্রথম উপন্যাস থেকে এ পর্যন্ত সমানে চলেছে। তবে এখানে লেখক প্রশ্নটা নিয়ে সংশয়ান্বিত।

৭. বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যধর্মী প্লট সাজানো এবং আভ্যন্তর নাটকীয়তা সৃষ্টি প্রথম উপন্যাস থেকে অব্যাহত রয়েছে।

কিন্তু সব মিলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসে দৃষ্টি স্থির রাখতে পারেননি। নতুন থেকে নতুনতর জীবনে ও রূপসিদ্ধিতে এগিয়ে চলার বদলে পুরনো রচনা দুটির উপরে বেশি

নির্ভর করেছেন। কতগুলি বিশিষ্ট প্রবণতা, এমন কি মুদ্রাদোষ হিসেবেও ঐতিহ্যানুসরণে আপত্তি করছি না। কিন্তু নিজের পুরোনো লেখার মডেল নিয়ে কাজ, তাও শিল্পী জীবনের প্রথম পর্যায়ে, প্রশ্ন জাগায়। পূর্বোক্ত নতুন ব্যাপারগুলিও অনেকটা নেহাৎ বিষয়গত উপস্থাপনা, মর্মভেদী নয়।

এইসব কারণে মৃণালিনীর সাফল্যের মান উঁচু নয়। পশুপতি-মনোরমার কাহিনী, আরও নির্দিষ্টভাবে পশুপতির চরিত্রের ঐ বিশিষ্টতা না থাকলে, উপন্যাসটিকে একান্ত সাধারণ রচনা বলে সিদ্ধান্ত করতে হতো।

দুই

মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের কাহিনীই লেখকের সচেতন অভিপ্রায়ে মুখ্য প্রসঙ্গ, সেইভাবে গ্রন্থের নাম দেওয়া হয়েছে মৃণালিনী। কিন্তু ঔপন্যাসিকের পরিকল্পনা এবং রচনায় মিল ঘটেছে কি?

আদর্শ–দুর্গেশনন্দিনী সচেতন অভিপ্রায় হল হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর কাহিনী– তথাকথিত মূল কাহিনী	আদর্শ–কপালকুণ্ডলা শিল্পে প্রতিষ্ঠা পেল পশুপতি-মনোরমার কাহিনী– তথাকথিত উপকাহিনী
১. আকার। অধ্যায় ২২টি।	১. আকার। অধ্যায় ২৩টি।[১]
২. ইতিহাস–পটভূমি।	২. ইতিহাস–পটভূমি।
৩. জাতীয়তাবোধ–বহিরঙ্গে।	৩.স্বজাতি-বিরোধী বিশ্বাসঘাতকতা–চরিত্র ও ঘটনার কেন্দ্রে।
৪. নায়ক। হেমচন্দ্র–সরল ও আদর্শবান নীতিনিষ্ঠ।	৪. নায়ক। পশুপতি–জটিল পাপী নীতি-বিষয় ভ্রূক্ষেপহীন।
৫. নায়িকা। মৃণালিনী–সরল প্রেমময়ী	৫. নায়িকা। মনোরমা–জটিল ও রহস্যময়ী।
৬. স্বাদ। ফিকে কমেডি।	৬. স্বাদ। গাঢ় ট্র্যাজেডি।
৭. দুই কাহিনীর মূলেই নরনারীর প্রেমসম্পর্ক	

উপরে তুলনামূলক যে ছকটি দেওয়া হল তা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে, লেখক যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন উপন্যাসটি সেভাবে লেখা হয়নি। উপকাহিনী হিসেবে যে অংশটিকে দাঁড় করাবেন ভেবেছিলেন সেটি যেমন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তেমনি শিল্পসফল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, লেখার সময়ে আপনার সৃষ্টি-ক্ষমতার উপরে লেখকের সম্পূর্ণ অধিকার ছিল না। মৃণালিনী রচনাকালে বঙ্কিম কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। পর পর দুটি লেখায় নতুন সৃষ্টি এবং শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির কাজে মনের জ্যা এমন টান-টান বাঁধা হয়েছিল যে মৃণালিনীতে এসে তাকে শ্লথ না করে উপায় ছিল না। ফলে পশুপতির কাহিনীও যতটা আশা জাগায় তা পূরণ হয় না। স্বয়ং মনোরমারও চরিত্রকল্পনায়

১. একটি অধ্যায়কে দুই কাহিনীর মধ্যে ফেলা হয়।

রয়েছে ভারসাম্যের অভাব, – চরিত্র বেপথু হোক, স্রষ্টার মুঠো আলগা থাকা চলবে না। মনোরমা সম্পর্কে লেখক কখনই নিশ্চিত হতে পারেননি।

তিন

মৃণালিনী উপন্যাসের ত্রুটি অনেক। সেগুলি ব্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে অনেকগুলি চরিত্রের বিশিষ্টতাও জানা যাবে। প্রথমত, নায়ক হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্রের সঙ্গে যবন-বিতাড়ন অর্থাৎ লুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধারের সম্পর্ক অল্পই। গুরু মাধবাচার্য এই বিষয়টি তার চরিত্রের গভীরে যতই প্রবিষ্ট করার চেষ্টা করুক, তা চামড়া ভেদ করেনি। পিতৃরাজ্য উদ্ধার বা মুসলমান রাজশক্তির প্রতি বিদ্বেষ তার ভাবনায় বা কর্মে যথার্থত ছিল না। লেখকের বিবরণটুকু দুয়ে জোড়া দেবার বাইরের চেষ্টা মাত্র। গোটা ব্যাপারটায় হেমচন্দ্র এত অনাগ্রহী ও নিরুৎসুক যে গল্পকার অনায়াসে ঐ অনাগ্রহ ও ঔৎসুক্যহীনতা মেনে তার চরিত্রে একটা অন্য ভঙ্গি আনতে পারতেন, কিন্তু হেমচন্দ্রের যৎকিঞ্চিৎ উদ্যোগকে ফাঁপিয়ে দেখে তৃপ্ত থেকেছেন। এটা লেখকের ব্যর্থতা।

হেমচন্দ্রকে উপন্যাসের আরম্ভে মৃণালিনীর প্রেমে উগ্র ও হিতাহিত জ্ঞানশূন্য যুবকরূপে হাজির করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তিরূপ দেবকার্য, রাজ্য-শিক্ষা-গর্ব সে সরবে অস্বীকার করেছিল। গুরুর প্রতি তার এই উক্তি স্মরণ করা চলে, 'আপনার দেবকার্য উদ্ধার করুন, আমি এই পর্যন্ত।' বা 'রাজ্য-শিক্ষা-গর্ব অতল জলে ডুবিয়া যাউক।'

মাধবাচার্য মৃণালিনীকে বধ করেছে সন্দেহে সে গুরুহত্যায় উদ্যত হয়েছিল। যে চরিত্রের ভিত্তিতে প্রেমে-প্যাসনে এই ক্রোধ ও ঔদ্ধত্য ছিল, তাকে একটু পর থেকেই অতি মামুলি ধরনের নায়কে রূপান্তরিত করা হয়েছে। সে গুরুর নির্দেশে নবদ্বীপে এসেছে, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে তার একটুও মন ছিল না। কিছু করেছে–এবং তা একেবারেই অর্থহীন। সর্বদাই মৃণালিনীর চিন্তা, বেশির ভাগই তার সতীত্ব নিয়ে। প্রকৃতি প্রস্তাবে মৃণালিনীর দেহগত শুচিতাই তাদের মিলনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং এ সবই ঘটনাগত মাত্র, স্বভাবগত নয়। ফলে চরিত্রের দিক থেকে এর কোনো মূল্য নেই। লেখকের সতীত্ববিষয়ক চিন্তা একটা মুদ্রাদোষের মতোই গুরুত্ব পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, নায়িকা মৃণালিনী। মৃণালিনী তিলোত্তমার চেয়ে কঠোর। তার স্বভাবে প্রথম দিকে কৌতুকের সহযোগ ছিল। কিন্তু বেশির ভাগ বেদনা-বিষণ্ন চিত্রপটে আঁকা স্থির ছবি। কোনো বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক বাঁক না থাকায় চরিত্রটি পাঠকের চিত্তহরণ করতে পারে না। আসলে যে সব উপাদানে মৃণালিনীকে গড়া হয়েছে তা বাঙালি নারী চরিত্রের সুলভতম সামগ্রী। সতীত্বে দৃঢ়, প্রেমে একনিষ্ঠ, বেদনায় অধীর। এ কারণেই সমালোচকের বলবার কিছু নেই,–চরিত্রটি জড় পদার্থ নয়, কিন্তু এর ভিতরে ডুবে দিয়ে তুলে আনার মতো কোনো মানবিক রহস্য নেই।

তৃতীয়ত, মনোরমার চরিত্রে অপরিচয়ের রহস্য আছে। তার মধ্যে বালিকার সারল্য ও প্রৌঢ়ার প্রজ্ঞা মিলে গিয়েছিল। ক্ষণে ক্ষণে তার মনোভাবের পরিবর্তন; এবং সব মিলে বিশ্লেষণের অতীত অপার্থিব লোকের কিছু ছায়াবিস্তার ঘটেছে।

আসলে সদ্যগড়া কপালকুণ্ডলার কথা লেখক ভুলতে পারেননি। মনোরমা সংসার-বন্ধনের কেউ নয়। পশুপতির তার হারানো স্বামী, সম্ভবত এ খবর পাবার আগে থেকেই এই পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক। কিন্তু সম্পর্ক পুরুষকে আকৃষ্ট ও লুব্ধ করার, তার কাছে আত্মসমর্পণের নয়। স্বভাবের দিক থেকে এটাই তার প্রেম। যদি আত্মসমর্পণে নীতিঘটিত বাধা থাকে, পশুপতিকে স্বামী বলে জানার পরেও সে ধরা দিল না–বোধ হয় পশুপতি রাজ্যলোভী পাপী বলে। লেখক ব্যাখ্যানে সে রকমই কিছু বলতে চেয়েছেন। কিন্তু রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে এরূপ সচেতনতা মনোরমার স্বভাবসিদ্ধ নয়, আরোপিত বলে মনে হয়। হেমচন্দ্রের সঙ্গে প্রেম নিয়ে আলোচনায় মনোরমার মানবচিত্ত বিষয়ে গভীরে জ্ঞানের নিদর্শন আছে। এ কি শুধুই অনুভূতি-জাত? তার ভিতরে অত গভীর চাপা যন্ত্রণা কেন–কেন মধ্যরাতে চান করে দেহের জ্বালা জুড়াবার চেষ্টা? তার ব্যক্তিগত জীবনের অপ্রাপ্তিই কি এর কারণ? পশুপতির ভালোবাসাকে সে সম্পূর্ণ গ্রহণ করে না, অথচ তার ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যার সমাধান হাতের কাছেই ছিল। জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ-বাণীর প্রভাবে তার অন্তরাত্মা এত বিষণ্ন হয়ে থাকত–এ কথা বলার মতো তথ্য হাতে নেই। তার মধ্যে জীবন বিষয়ে এই নিস্পৃহতা কিভাবে জন্মাল? সে তো প্রকৃতি-দুহিতা, কাপালিক-সহযোগিনী কপালকুণ্ডলা নয়। এবং সত্যই সে নিরাসক্ত নয়, পশুপতির প্রতি তার ভালোবাসা ছিল। বারংবার পশুপতির আকর্ষণে তার কাছে যাবার মধ্যে এর নিদর্শন। একবার তো পশুপতির বেদনাকাতর রূপ দেখে সে তার সামাজিক মূল্যবোধ ত্যাগ করে আত্মসমর্পণে মধুর হয়ে উঠেছিল।–

'মনোরমা কহিলেন, 'পশুপতি, কাঁদিতেছ কেন?'

পশুপতি চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন 'তোমার কথায়।'

ম। কেন আমি কি বলিয়াছি?

প। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।

ম। আর আমি এমন করিব না।

প। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে?

ম। হইব।'

মনোরমা কোনদিক থেকেই কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তুল্য নয়। যদিও তার জন্যই স্বামী পশুপতির পতন ও ধ্বংস। অনেকটা সীতারাম উপন্যাসের শ্রীর প্রাক্-রূপ। মনোরমাই পশুপতির নিয়তি। কিন্তু তার চরিত্রে কপালকুণ্ডলার মতো জীবনমুখি নৈসর্গিক মহিমা নেই। তার স্বভাবের অসংলগ্নতাই বড়। কোনো পাত্রের চরিত্রে অসংলগ্নতা থাকতেই পারে – কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক ঠেকনা না দিলে শিল্পে তা উতরোয় না। মনোরমা সম্পর্কে লেখক শেষ অবধি মন স্থির করে উঠতে পারেননি। চরিত্র যতই

অসংলগ্ন মানুষের হোক – শিল্পীর মুঠোয় শিথিলতা থাকলে চলবে না। এখানে তা-ই ঘটেছে। মনোরমার রহস্য তাই বিশ্বাস্য নয়।

মনোরমা ব্যর্থ হলেই পশুপতিকে কেন্দ্র করে যে ট্র্যাজিক উপকাহিনী তৈরি হয়েছে তার গাঢ়তা অনেক কমেছে। মৃণালিনী-হেমচন্দ্রের মূলকাহিনীকে প্রথম থেকেই আমার হিসেবের বাইরে রেখেছি, মনোরমার ফাঁকা আওয়াজ অন্য গল্পকেও যথেষ্ট সমুন্নত করতে পারল না।

চার

এই রচনার শক্তি ইতিহাসের ব্যবহারে এবং পশুপতির চরিত্র সৃষ্টিতে। এতেই বোঝা যায় এটি বড় হাতের কাজ, যতই স্খলন থাক। আর একটি ছোট চরিত্রেও কিছু বিশিষ্টতা আছে–সে মাধবাচার্য। দেশকে যবনমুক্ত করার ব্রত তার। কিন্তু এ কার্যের নেতা নির্বাচনে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কর্মীর তৎপরতা এবং তাত্ত্বিকের তীক্ষ্ণধার নিপুণবুদ্ধি তাঁর ছিল না। আসলে তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা। সে স্বপ্ন অন্য কাউকে, এমন কি হেমচন্দ্রকেও তিনি দেখাতে পারেননি। তাই নানাভাবে একরূপ জবরদস্তি করে হেমচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁর সব চেষ্টা, সব ভবিষ্যৎ-বাণী ব্যর্থ হয়েছে। হেমচন্দ্র ধন ও প্রেয়সী স্ত্রী নিয়ে প্রস্থান করেছে। গৌড়ের পতন হয়েছে। মাধবাচার্য আরও পূর্বদিকে সরে গিয়েছেন–মনের আশা নিভে যায়নি। নেহাতই আবাস্তব অলীক আশা–কিন্তু তার অস্তিত্বই ঐ কল্প-ভবিষ্যতে ন্যস্ত।

এইবারে উপন্যাসে ইতিহাসের দিকটা লক্ষ্য করা যাক।

দুর্গেশনন্দিনীতে গড়মন্দারণ দখলের কোলাহলমুখর এক ছবি ছিল। কতলুর গুপ্ত হত্যার ফলে পাঠান-প্রাসাদে বিশৃঙ্খল বিপর্যয়েরও। কপালকুণ্ডলায় হারেম-রাজসভার চক্রান্তের দুরাগত পরোক্ষ বিবরণ ছিল। মৃণালিনীতে মহামন্ত্রীর গোপন ষড়যন্ত্রের ব্যাপার এবং রাজনৈতিক রাষ্ট্রবিপ্লবের একটি ব্যাপকতর রূপ আছে। নবদ্বীপ-কেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুরাজত্বের অবসান, লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন, বিশ্বাসঘাতক প্রধান অমাত্যের সহায়তার কৌশলে বকতিয়ারের রাজ্যজয়–এই বিবরণের মধ্যে অনেকখানি ইতিহাসানুগত্য আছে। কয়েকজন মাত্র সৈন্য নিয়ে বকতিয়ারের সাফল্যের যে কাহিনী মিনহাজউদ্দীনের পুঁথিতে পাওয়া যায় তার সত্যতা ও সম্ভাব্যতা নিয়ে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন এই বইতেই, 'ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখতিয়ার খিলজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল। ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিবেত্তা মিনহাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রের সিংহ পরাজিত মনুষ্য সিংহের অপমান-কর্তাস্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।'[২]

আধুনিক গবেষণা কি বলে এখানে তা অবান্তর। বঙ্কিম মিনহাজকে মেনে নেননি, তবু তৎকাল-প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত হিসেবে অবলম্বন করেছেন এবং ঘটনাজালে তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য করে তুলেছেন। মুখ্য অমাত্য যেভাবে সব বিষয়টা সাজিয়ে তুলেছিল, স্বভাবদুর্বল ও জরাগ্রস্ত রাজাকে যে কৌশলে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছিল, সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করেছিল তাতে সতের জন অশ্বারোহীর পক্ষে দূতের মতো নগরে প্রবেশ করে রাজপুরী দখল করা পুরোই সম্ভব ছিল। এবং নগর-উপান্তে তাদের বিশ হাজার সশস্ত্র পুরুষ অপেক্ষা করছিল।

কিন্তু এর চেয়েও বড় ব্যাপার লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ লুণ্ঠনের যে চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন তা হাজার বছর আগের এক রাষ্ট্রবিপ্লবের – তার অনেকটাই লেখককে কল্পনা করে নিতে হয়েছিল।

চতুর্থ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বকতিয়ারের পুরী-অধিকার, রাজা লক্ষ্মণসেনের নদীপথে পলায়ন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ধর্মাধিকার পশুপতি বন্দী হল। সপ্তমের প্রথম চার অনুচ্ছেদের নগর মধ্যে বিশ হাজার মুসলমান সৈন্যের লুঠতরাজের বর্ণনা। চতুর্দশ পরিচ্ছেদের গোড়ায় লুণ্ঠন ও নির্বিচার হত্যার পরে রাজপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এবং পরের প্রভাতে 'যবনেরা নগর লুঠ করিয়া তৃপ্ত হইলে, বখতিয়ার খিলজি অনর্থক নগরবাসীদের পীড়ন নিষেধ করিয়া দিলেন।' (পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ)

সংক্ষিপ্ত এবং কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে-দেওয়া এই বর্ণনা ও বিবরণে সেকালে সম্ভব এক রাষ্ট্রবিপ্লবের চেহারা ধরা পড়েছে।

প্রথমত, এক হাজার বছর আগে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে নগরবাসীরা থাকত সম্পূর্ণ অনবহিত এবং নির্বিকার। বিদেশী সতের জনকে প্রাসাদের দিকে যেতে দেখে তারা দৃশ্য-দর্শনের আমোদ পেয়েছে – আতঙ্কগ্রস্ত না হোক, কৌতূহলীও হয়নি। বেলা একপ্রহরে প্রাসাদ অধিকার এবং রাতে নগর লুণ্ঠন। জনসাধারণ এই দীর্ঘ সময় ধরে আত্মরক্ষা বা পলায়নে তৎপর হয়নি। সেকালের সাধারণ মানুষ এবং রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্যে যে সম্পর্কের ইঙ্গিত লেখক করেছেন তা ঐ যুগের পক্ষে স্বাভাবিক এবং উৎকৃষ্ট ঐতিহাসিক কল্পনার নিদর্শন।

দ্বিতীয়ত, বখতিয়ার যে কৌশলে তার আক্রমণের স্তরগুলি বিন্যস্ত করেছে এবং জয় সম্পূর্ণ করেছে তা তৎকালীন রণনৈতিক বিশিষ্ট পদ্ধতিরূপে স্বীকার্য। ধর্মাধিকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের ফলে সে অবাধে প্রাসাদ অধিকার সুনিশ্চিত করেছে। নগর প্রান্তে বিশ হাজার সৈন্য সজ্জিত রেখেছে। যবনদূত রূপে রাজপুরীর তোরণে এসেছে, রক্ষীদের হত্যা করে পুরী অধিকার করেছে। রাজাকে হত্যা করতে চেয়েছে, কিন্তু রাজা পলায়িত। ধর্মাধিকারকে বন্দী করেছে। মুসলমান সেনার বিপুল বাহিনী রাজধানীতে প্রবেশ

২. বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' বাংলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে বসে এ বিষয়ে নানা যুক্তি জাল বিস্তার করেছেন।

করেছে। প্রতিরোধ আর সম্ভব নয়, এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে সারারাত সৈন্যদের লুঠতরাজ ও হত্যাকাণ্ড করতে সুযোগ দিয়েছে। এর ফলে সৈন্যদের ব্যক্তিগত লোভ চরিতার্থ হয়েছে এবং মুসলমান শাসকদের সম্পর্কে ভয় জেগেছে দেশবাসীর মনে। পরের দিন থেকে প্রজাপীড়ন নিষিদ্ধ হয়েছে – রাজ্য শান্তি এনে অধিকার সুস্থির ও স্থায়ী করার পথ খুলে দেওয়া হয়েছে। অতি উচ্চস্তরের রণনৈতিক-রাজনৈতিক নেতৃত্ব – এবং প্রাচীন কালের পরিস্থিতিতে যেমনটি সম্ভব।

ইতিহাসের এই বিশেষ ব্যাপারটিকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের সঙ্গে একদিকে শিথিলভাবে অন্যদিকে অচ্ছেদ্য গাঢ়তায় যুক্ত করেছেন। হেমচন্দ্র এই ইতিহাসে যে ভূমিকা নিয়েছিল তার একটা সংযোগ দেখাবার উদ্দেশ্য ছিল। তাকে অল্প চেষ্টায় ইতিহাস থেকে ছেঁটে বাদ দেওয়া যায়। হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর মিলন ও বিচ্ছেদের সঙ্গে ইতিহাসের ঘটনাক্রম যে ধরনের বাধা এনেছিল বা যেভাবে তা সরে গেল সে সবই একেবারে বাইরের। হেমচন্দ্র মুসলমানদের পরাজিত করবে, তার প্রণয়ের অবকাশ নেই – তাই বিচ্ছেদ; বখতিয়ার গৌড় দখল করল – হেমচন্দ্রের উদ্দেশ্য বিপর্যস্ত হল, তাই তার ছুটি, এবারে নিশ্চিত মিলন। রাষ্ট্রবিপ্লবের উচ্চরব ও সুতীব্র ঘটনাস্রোতের মধ্যে কাহিনীকার কয়েকটি অধ্যায় জুড়ে বিচ্ছিন্ন নায়ক-নায়িকার মিলনের ব্যবস্থা করেছেন। ইতিহাস ও ব্যক্তি প্রেম এই দুইয়ের মধ্যে কোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক তো নেই-ই, স্বাদের ভাবের দিক থেকেও কোনো ঐকতান বাজেনি।

অন্যদিকে পশুপতি এই ইতিহাসের এক প্রধান পুরুষ, একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সে ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হয়। ইতিহাসের নিয়তি তার বুকের মধ্য দিয়ে যুগান্তরের রথের চাকা চালিয়ে নিয়েছে। বিমূঢ় জাতি এই পতনে নয়, লুণ্ঠনে বিপর্যস্ত; পশুপতি ব্যক্তিত্বে এর সব যন্ত্রণা বহন করেছে। ধ্বংস ও হত্যার রক্তস্নানে স্বাধীনতার অবসান তার ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির সঙ্গে মিলে একটা বড় ও গম্ভীর সুর বাজিয়েছে। মুসলমান সেনাবাহিনীর রাজ্যজয়ের পর্যায়গুলো এবং পশুপতির বিনষ্টির ক্রম – পর পর বিন্যস্ত হওয়ায় ওতপ্রোত হয়ে পড়েছে। এই অংশে ইতিহাস আর ব্যক্তিত্বে আত্মীয়তা নিবিড়।

হেমচন্দ্রের দিক থেকে দেখলে পশুপতি ভিলেন। করদ রাজা হবার লোভে স্বদেশকে মুসলমান আক্রমণকারীর হাতে তুলে দেবার চক্রান্ত করেছে, গৌড়ের ধর্মাধিকার হওয়া সত্ত্বেও গোপনে রাজদ্রোহ করেছে, নায়ক হেমচন্দ্রকে হত্যা করে বখতিয়ারকে খুশি করতে চাইছে। আর পশুপতির মনে চোখ রেখে ভাবলে সে তার কাহিনীর নায়ক। সুতীব্র প্রণয়তৃষ্ণা, প্রেমিকা এত কাছে তবু অপ্রাপনীয়া, – তাই সে রাজা হয়ে সামাজিক রীতির বদল ঘটাবে, বিধবা-বিবাহ ধর্মানুমোদিত করে মনোরমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করবে, সে কারণে রাজা তাকে হতেই হবে। এত তীব্র বাসনা তাই রাজদ্রোহ, বখতিয়ারকে আমন্ত্রণ জানানোর পাপ যদি বর্তে – সব পাপ সে বহন করবে। একবার রাজ্য হাতে পেলে মুসলমান বাহিনী বিতাড়ন করা তার পক্ষে কঠিন হবে না – এতটা আত্মবিশ্বাস, অথবা আত্মপ্রতারণা বিদেশীকে আমন্ত্রণের অনুশোচনা ঢাকবার জন্য।

যখন মনোরমা পশুপতিকে নিজের আসল পরিচয় দিয়ে বলল, 'এ দেশ ছাড়িয়া চল, আমরা কাশীধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি তোমার চরণ সেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব।'

পশুপতি তাতে রাজি হলো না। যদি মনোরমাকে ধর্মমতে স্ত্রীরূপে পাওয়াই তার সব রাজকীয় চক্রান্তের মূল হয়, তবে এই প্রস্তাব সে মেনে নিল না কেন? তার উক্তি 'মনোরমা, আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম – তোমাকে লইয়া সর্বত্যাগী হইয়া কাশীযাত্রা করিতাম। কিন্তু অনেক দূর গিয়াছি আর ফিরিবার উপায় নাই–সে গ্রন্থি বাঁধিয়াছি তাহা আর খুলিতে পারি না – স্রোতে ভেলা ভাসাইয়া আর ফিরাইতে পারি না। যাহা ঘটিয়াছে তাহা ঘটিয়াছে।'

মনোরমাকে নিয়ে সে-রাতে পশুপতির গোপনে পালিয়ে যাওয়া তখনও হয়ত অসম্ভব ছিল না। পরের দিন যবনবিপ্লব ঘটে। তখন পর্যন্ত ধর্মাধিকারের স্বাধীন গতিবিধি রুদ্ধ হয়নি। আসল বাধা ছিল তার স্বভাবের মূলে। মনোরমাকে সে চায়, শাস্ত্রানুমোদিত পত্নীরূপেই পেতে চায়–যথাধর্ম তার তীব্র বাসনাকে নিবৃত্ত করতে চায়। কিন্তু যার কামনায় আগুনের শিখা, তার কাম্য নিভৃত, প্রশান্ত দাম্পত্যজীবন নয়, কাশিবাসী সেবা-স্নিগ্ধতা নয়। রাজকীয় ঐশ্বর্য ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার আসনে স্বর্ণনির্মিত-অষ্টভুজা (এই দেবীই তার আরাধ্য) তার প্রেমভক্তির উজ্জ্বল প্রতিমা। মনোরমাকে সে সেখানে বসাতে চায়–যে মনোরমা তারই কল্পলোকের সৃষ্টি। এই গ্রন্থি সে নিজে বেঁধেছে – তার চরিত্রের জটিল জালে বদ্ধ তা। খুলবার শক্তি কোথায়?

পশুপতির মোহভঙ্গ হলো কঠিন আঘাতে। তার সব আশা-কামনা নিঃশেষে নিভে গেল। দেশব্যাপী রক্তপাত লুণ্ঠন অগ্নিসংযোগ আর সে পটভূমিতে তার ব্যক্তিগত নিগ্রহ-আসন্ন মৃত্যুভীতি, সব মিলে অনুচ্চারিত গভীর অনুশোচনায় ট্র্যাজেডির নিষ্করুণ গম্ভীর রব উঠতে লাগল। লেখক চরিত্র-রচনায় প্রায় বিশ্লেষণাত্মক হয়ে উঠেছেন। পশুপতি 'রাজপথে যাহা দেখিলেন, তাহাতে আপনার মনোমধ্যে আপনি মরিলেন। তাঁহার প্রতিপদে মৃত নাগরিকের দেহ চরণে বাজিতে লাগিল; প্রতিপদে শোণিতসিক্ত কর্দমে চরণ আর্দ্র হইতে লাগিল। পথের দুই পার্শ্বে গৃহাবলী জনশূন্য বহু গৃহ ভস্মীভূত; কোথাও তপ্ত অঙ্গার এখনও জ্বলিতেছিল। গৃহান্তরে দ্বার ভগ্ন–গবাক্ষ ভগ্ন–প্রকোষ্ঠ ভগ্ন–তদুপরি মৃতদেহ। এখনও কোনো হতভাগ্য মরণ-যন্ত্রণায় অমানুষিক কাতরস্বরে শব্দ করিতেছিল। এ সকলের মূল তিনিই। দারুণ লোভের বশবর্তী হইয়া তিনি এই রাজধানীকে শ্মশানভূমি করিয়াছেন। ... মনে মনে তখন ইষ্টদেবীকে স্মরণ করিলেন – কিন্তু কি কামনা করিবেন? কামনার বিষয় আর কিছুই নাই।'

পশুপতির ট্র্যাজেডিকে একটা বিশালতা দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। তার ক্লাইম্যাক্স ইষ্টদেবী বিসর্জনের সঙ্কল্পে, – অবশ্য রঘুপতির মতো প্রতিমাকে জলে ডুবিয়ে দেবার আগেই দেবীসহ সে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে, যে আগুন সে নিজে জ্বেলেছিল তাতে। মনোরমা তার নিয়তি – যে মনোরমাকে পশুপতি নিজে অনেকটাই সৃষ্টি করেছিল আপনার বাসনা দিয়ে।

মৃণালিনী উপন্যাসে পশুপতিই পাঠকের একমাত্র প্রাপ্তি – মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী লেখকের অভিপ্রায় অন্য যা কিছু হোক না।

৬ বিষবৃক্ষ : কে ভালবাসিতে চায়/কে বাঁচিতে চায়

এক

বিষবৃক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক, এই অর্থে যে সমকালীন। উনিশ শতকের সামাজিক মননে স্থিত না হলে আগের তিনটি উপন্যাস লিখতে পারতেন না। তবু সেখানে বিষয় ছিল ইতিহাস-আশ্রয়ী। যেটুকু পরিবারজীবনের কথা এসেছে কোথাও কোথাও তাকে সেকালের (বা একালেরও) সত্য বলে বোধ জন্মে। বিষবৃক্ষের সমাজ জাতে আলাদা।

অবশ্য সমাজ-জীবনের সরাসরি পরিচয় দেবার ইচ্ছা তাঁর মোটেই ছিল না। এমন ভাবে ঘটনাকে সাজাননি যাতে নিজ-সময়ের নানা শ্রেণীর আচরণ, শিক্ষা বিয়ে কাছারি পুলিশ হাটবাজার যানবাহনের ছবি আঁকার সুযোগ মেলে। যদি কখনও এরা গল্প-সূত্রে সামনে পড়েছে প্রয়োজনীয় সংক্ষিপ্ততায় দায়িত্ব সেরেছেন তিনি। কাহিনীর সীমার বাইরে যেতে দেননি। বিষবৃক্ষে এ রকমের দু-চারটি প্রসঙ্গ এসেছে। বঙ্কিম তাদের কি কৌশলে বিন্যস্ত করেছেন লক্ষ্য করা যাক। –

১. ক. সেকালের ধনী গৃহস্থের বাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার বিষয়ে একটি মাত্র বাক্য 'নগেন্দ্রের পিতা মিস টেম্পল্ নাম্নী একজন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া কমলমণিকে এবং সূর্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখা-পড়া শিখাইয়া ছিলেন।' এই সূত্রে তখনকার মেয়েদের লেখাপড়া শেখার রীতিনীতির বিস্তৃত পরিচয় দেবার প্রয়োজন আগের সামাজিক গল্পের কথকেরা সবাই বোধ করতেন। আলাল-ফুলমণি-চন্দ্রমুখী-সরলা, যে কোনো বইয়ের সাক্ষ্য নেওয়া যেতে পারে। সামাজিক বাস্তবতা প্রকাশের ঐ রীতিতে তাঁদের আস্থা ছিল, বঙ্কিমের নেই।

খ. তারাচরণের পরিচয় দিতে গিয়ে বর্ধিষ্ণু পল্লীতে নব্যরীতির ব্রাহ্ম যুবকের আচরণের ছবি আঁকা হয়েছে। বেশ বিস্তৃত। 'তারাচরণ একপ্রকার মোটামুটি ইংরাজী শিখিয়াছিলেন। ...সূর্যমুখী, নগেন্দ্রকে প্রবৃত্তি দিয়া গ্রামে একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন। তারাচরণ তাহাতে মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। ... তৎকালে সচরাচর 'মাষ্টার বাবু' দেখা যাইত না। সুতরাং তারাচরণ একজন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন। বিশেষত তিনি Citizen of the World এবং Spectator পড়িয়েছিলেন, এবং তিনি বুক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথাও বাজারে রাষ্ট্র ছিল। এই সকল গুণে তিনি দেবীপুরনিবাসী জমিদার দেবেন্দ্রবাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদ মধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে তারাচরণ বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিক বিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন, এবং 'হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর!' এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। তাহার

কোনটা বা তত্ত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন, কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন। মুখে সর্বদা বলিতেন, 'তোমরা ইট পাটকেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জ্যাঠাইমার বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।'

লেখক যদিও ব্যাঙ্গের ফ্রেমটি বজায় রেখেছেন– কিন্তু এই সমাজ-বাস্তবতার পটভূমিগত তাৎপর্য আছে। তারাচরণের স্বল্পস্থায়ী চরিত্রের সঙ্গে এই বিবরণকে বঙ্কিমচন্দ্র মিলিয়ে দিতে পেরেছেন, ঘটনার জট পাকাতে এর কিছুটা সহায়তাও আছে। তার চেয়েও বড় কথা যুগের বিশিষ্টতা এই পথ দিয়েই উপন্যাসে ঢুকতে পেরেছে। কাহিনী পাত্রপাত্রীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য না হলে কোনো সমাজবিবরণই উপন্যাসে প্রশ্রয় পাবে না–এটাই বঙ্কিমের রীতি। অথচ এই গল্পে সমকালের সমাজ-আন্দোলনের অনুষঙ্গ থাকা দরকার। কারণ প্রত্যক্ষত বিধবা-বিবাহ এবং আরও গভীরে নতুন মানবিক মূল্যবোধ এর আশ্রয়–তার জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।

গ. তারাচরণ-প্রসঙ্গে উন্মার্গগামী যুবকদের গ্রামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে দেবেন্দ্রনাথের সূত্রে তার সংক্ষিপ্ত পুনর্কথন রয়েছে। এখানেও ব্যঙ্গের রঙ লেগেছে। তারাচরণ অল্পেই কাহিনী থেকে চিরবিদায় নিয়েছে, কিন্তু অন্যতম প্রধান চরিত্র দেবেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে এই সমাজসত্য ব্যবহৃত।

ঘ. বিধবা-বিবাহ বিষয়ে নগেন্দ্রের চিঠিতে মন্তব্য, 'যদি কেহ বলে যে, বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্ম-বিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কি ইহা অশাস্ত্র বলিবে?'

কিছুদিন আগে সূর্যমুখীর চিঠিতে বিরূপ বক্তব্য ছিল, 'ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত তবে মূর্খ কে?'

এই সূত্রে ন্যায়াচার্য ও সার্বভৌমের তর্কবিতর্কের কথাও বলা হয়েছে। এখানেও বিধবা কুন্দের বিয়ে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা। সেদিক থেকে প্রসঙ্গটির উত্থাপন অপরিহার্য ছিল। কিন্তু লেখক সংযমে সুস্থিত। অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখে, এবং সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রীর ভাবনায়ই মাত্র তা প্রকাশিত। এ জাতীয় উত্তেজক সামাজিক আন্দোলন অনেক বিস্তৃত বিবরণ হয়ে উঠতে পারত। বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক কোনো আন্দোলনকেই পৃথক হতে দেননি, কাহিনীর অন্তরঙ্গ করে রেখেছেন। কিন্তু যত সংক্ষিপ্তই হোক উপন্যাসের ভিতর থেকে উনিশ শতকী একটা বাজনা শোনা যাচ্ছে।

২. পারিবারিক জীবনের ছবি যা আছে তা প্রধানত নগেন্দ্রের জমিদারি-বাহুল্যের সঙ্গে যুক্ত। একটা দাসদাসী-আশ্রিত আত্মীয়সমন্বিত বিরাট সংসারের যে বিবরণ আছে তার বিপুল আয়োজনে কৌতুকের রঙ লেগেছে, কিন্তু বিশ্বাস্য বাস্তবতাও আছে।

৩. লেখক যে সব পুরুষকে সামনে এনেছেন তাদের শ্রেণী (অর্থনৈতিক) পরিচয়ে সমসাময়িক যুগসত্যের প্রতিফলন আছে। এরা উচ্চ ও মধ্য বিত্তবান। বিত্তহীন পুরুষের গুরুত্ব নেই। নায়ক নগেন্দ্রনাথ ধনী জমিদার। দেবেন্দ্রনাথ জমিদার বংশের, সম্প্রতি

অনেকটা হীনাবস্থায় পড়েছে। কিন্তু তাকে ঘিরে বাইরে রিফর্মিস্ট ব্রাহ্ম কিন্তু ভিতরে উচ্ছৃঙ্খল একটা গোষ্ঠী, সমাজ-বাস্তবতার বিশেষ একটি দিককে প্রকট করে তুলেছে। শ্রীশবাবুর ভূমিকা তুলনায় গৌণ। সেও ধনবান, কিন্তু জমিদার নয়, চাকুরে শ্রেণীর লোক। ইংরেজের হৌসে কাজ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কাহিনীর মানুষদের শ্রেণীগত ভূমিকাকে যুগোচিত বিশিষ্টতায় স্থিত করেছেন। অবশ্য এদের পাপ-পুণ্যের বা সুখ-দুঃখের সঙ্গে ঐ শ্রেণীভিত্তির কোনো সম্বন্ধ নেই এবং তার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিকের শ্রেণী-বিশেষের প্রতি সমর্থন বা বিরূপতার হদিসও মিলবার কথা নয়। কারণ মানুষের চূড়ান্ত পরিচয় তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যে–শিল্পী হিসেবে বঙ্কিমের সেদিকেই অনুসন্ধান।

উপরে আলোচিত সূত্রগুলি বলে দেয় বঙ্কিম তাঁর আগের সমাজ-আশ্রয়ী ঔপন্যাসিকদের রীতিতে বিশ্বাসী না হলেও সামাজিক উপন্যাস লিখতে বসে সময়কে অবজ্ঞা করেননি। যুগের অন্তরে প্রবেশ করেছেন। তার আবহাওয়া গড়ে তুলেছেন এবং সংযত সংক্ষিপ্ততায় তাকে এমন কৌশলে ব্যবহার করেছেন যাতে গল্পের সঙ্গে তা ওতপ্রোত থাকে। উপন্যাসের নাম করে সমকালের বিবরণ বিস্তারে নকসার কাছে আত্মসমর্পণ করার একটুও ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসও অনেকখানি রোমান্স এ রকম ধারণা ঠিক নয়। ঘটনার কিছু তীব্রতা বিষবৃক্ষেও আছে, নাটকীয় চমক আছে, চমৎকারিত্বও। যেমন, অনাথা কুন্দকে নিয়ে নগেন্দ্রর কলকাতা যাওয়া, দেবেন্দ্রনাথের ছদ্মবেশ, কুন্দের পলায়ন, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, মৃতা বলে কথিত সূর্যমুখীর হঠাৎ ফিরে আসা, হীরার চক্রান্তে কুন্দের মৃত্যু, দেবেন্দ্র-হীরার শেষ সাক্ষাৎ। আধুনিক ঔপন্যাসিকেরা অনেক লেখায় নাটক বাদ দিচ্ছেন, প্রতিদিনের সাংসারিক সামাজিক ঘটনার সাহায্যেই মনের জট বাঁধছেন ও খুলছেন। তাও কি সবাই? এখনও সব দেশের অনেক লেখক, অনেকে বেশ শক্তিশালীও, ঘটনার প্রবলতা চমকের মোহ এড়াতে পারেননি, উনিশ শতকের লেখকেরা তো নয়ই। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষের সামাজিক বাস্তবতা দৈনন্দিন নিস্তরঙ্গ জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণের নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাব্যতার। সেখানে তাঁর সাফল্য।

কিন্তু বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসেও ঘটনাবিন্যাসে নাটকীয় রস আছে – সেখানে তাঁর শিল্প-বিশিষ্টতা; এবং সেগুলি অতি নাটকীয় নয়, কারণ মাত্র ঘটনানির্ভর নয়, চরিত্রগতও–সে কারণে পাঠকের অভিযোগ নেই।

দুই

বিধবার বিয়ে নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় নাটক অনেক লেখা হয়েছিল, ব্যঙ্গাত্মক প্রহসনই বেশি। উমেশ মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' রচনা হিসেবে তুচ্ছ হলেও মতামতে বলিষ্ঠভাবে সংস্কারপন্থী। সেই আন্দোলনের উত্তাপ আর ছিল না সত্তরের দশকে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ঔপন্যাসিক, যাঁর প্রথম তিন রোমান্সধর্মী উপন্যাস অতি উচ্চস্তরের সাহিত্যকে তুলে নিয়েছিল, সামাজিক উপন্যাসে হাত দিয়েই ঐ বিধবাবিবাহকে প্রত্যক্ষ বিষয়রূপে নির্বাচন করে নিল।

এই সামাজিক সমস্যা এবং বিদ্যাসাগরের আন্দোলন সম্পর্কে চিন্তাবিদ বঙ্কিমচন্দ্রের সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল। তাঁর নিজস্ব যুক্তি যা-ই হোক তিনি বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। তাঁর সেই বক্তব্যের বিচার এখানে করা অর্থহীন। নগেন্দ্র-সূর্যমুখী নিজের ব্যক্তিগত ভাবাবেগের দিক থেকে প্রশ্নটিকে দেখেছে। সেখানে লেখকের মত খুঁজব না। শুধু এটাই ভাববার, বঙ্কিমের বিধবাবিবাহ-বিরোধী রক্ষণশীল মতবাদ বা নীতিবাগীশ দৃষ্টিভঙ্গি এই উপন্যাসে মানব হৃদয়কে নির্জিত করেছে কিনা, এর স্বাভাবিক পরিণতিকে বিঘ্নিত করেছে কিনা।

আরও স্পষ্টভাবে অভিযোগ করা হয়েছে, কুন্দকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়েছে, বিধবা-বিবাহের অপরাধেই। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের হৃদয়ের চেয়ে, বেশি দাম দিয়েছেন সনাতনী নৈতিক মূল্যবোধকে।

সমস্যাটি তলিয়ে বোঝা দরকার। বিধবার বিয়ে আপাতদৃষ্টিতে বিষবৃক্ষের বিষয়বস্তু। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই সামাজিক বিষয়কে কিভাবে ব্যক্তিগত সমস্যায় বদলে নিয়েছেন সেটা অনেক জরুরি। কেউ সমাজের বাস্তব সমস্যাকে সরাসরি রূপ দিতে চান। কেউ তাকে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে ফেলেন যে প্রশ্নটা আর সর্বজনীন বা সামাজিক থাকে না, হয়ে পড়ে একান্তভাবে ব্যক্তিক। কোন্ পদ্ধতি ভালো, তা বলা চলে না, সেটা লেখার উপরে। প্রথম ক্ষেত্রে বিস্তারের সুযোগ থাকে, বহু মানুষের জীবনজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভিতরে নামার সিঁড়ি থাকে– একের ভিতরে তলিয়ে যাবার। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স লিখতে গিয়েও যেখানে দেশে-কালে প্রসারিত হবার চেয়ে মানুষের ভিতরে ঢুকে যেতে চেয়েছেন সেখানেই চূড়ান্ত সাফল্য এসেছে। সামাজিক উপন্যাসেও ওখানেই তাঁর সার্থকতার চাবি।

এই উপন্যাসে বিধবার বিয়ে নিয়ে সোজাসুজি কিছু কথা বলা হয়েছে, কিছু ভাবনা আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিবেশে স্থাপিত বলে তা সত্য হয়েও উঠেছে। কিন্তু বিষবৃক্ষের মানবিক সমস্যার ভিতরে তার শিকড় নেই। নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে বিয়ে করার জন্য বিধবা-বিবাহের সমর্থন করেছে। কিন্তু তার যন্ত্রণা ও অর্ন্তদ্বন্দ্ব এ কারণে নয় যে 'বিধবা' কুন্দনন্দিনীকে ভালোবেসে বা বিয়ে করে সে সনাতন নীতির লঙ্ঘন করেছে। সূর্যমুখী ব্যক্তিগত কারণেই বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য করেছে। কিন্তু স্বামী 'বিধনা' এক যুবতীকে বিয়ে করতে চাইছে বলেই তার কষ্ট নয়। কুন্দ একবারও এই নৈতিক ভাবনায় পীড়িত নয় যে সে 'বিধবা' হয়েও একজনকে ভালোবেসে বিয়ে করছে, পাপ করছে। অন্য চিন্তায় অন্য ভাবাবেগে এদের মনের সঙ্কট। এদের কষ্ট। এদের নিভৃত চিত্তে বিধবা-বিয়ে সমস্যার অস্তিত্ব নেই। এভাবে নিঃশেষে প্রশ্নটাকে মুছে দেওয়ায় বরং অন্য ধরনের সিদ্ধান্ত করতে হয়–

১. সমকালে পূর্বরাগের নায়িকা হবার যোগ্য বয়সের মেয়ের কুমারী থাকা মোটেই বিশ্বাস্য হতো না। কুন্দ তাই কুমারী না হয়ে বিধবা।

২. এই উপন্যাসে বিধবার বিয়ে একটা সামাজিক সমস্যা মাত্র–গভীর নৈতিক ভাবনার বিষয় নয়। নগেন্দ্রের সমাজ না হয় ভয়ে আপত্তি করেনি,

কিন্তু এ নিয়ে কমলও মাথা ঘামায়নি। ঔপন্যাসিক বিষয়টিকে পাপ-পুণ্যের ব্যাপার বলেই দেখাতে চাননি।

কুন্দের মৃত্যু হল। কিন্তু বিধবা কুন্দ নীতিহীনা পাপিষ্ঠা, তার ভালোবাসা আর বিয়ের শাস্তি হিসেবেই এই অকালে অপঘাত মৃত্যু–এ রকম মনে করার কোনো সুযোগ এ বইয়ে রাখা হয়নি। উপন্যাসাদিতে কোন মুখ্য চরিত্রের বিনাশ তার পাপের প্রত্যক্ষ ফল রূপেই মাত্র চিত্রিত হয় না। কুন্দকে ঘিরে যে কোমল উজ্জ্বল পবিত্রতার ভাব বিচ্ছুরিত, যে প্রীতি ও মমত্ব সর্বব্যাপী হয়ে ওঠে তাকে অনেক সতর্ক যত্নে লেখককে গড়ে তুলতে হয়েছে। আর কুন্দের নিজের স্বভাব, তার চারপাশের লোকজনের মন আর কাজের টানাপোড়েনে এই পরিণতি অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল।[১]

তিন

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র আসলে একান্ত আধুনিক একটি মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে এটা নতুন জিনিস–বাঙালির চেতনায়ও এক নব্য মানব-চেতনা।

ধনী জমিদার নগেন্দ্রনাথের স্ত্রী সূর্যমুখী। কুন্দকে ভালোবেসে সে বিয়ে করল। পুরুষের বহুবিবাহ যেকালে সামাজিক রীতি বলে স্বীকৃত, সে সময়ে নগেন্দ্রের এই কার্য সপত্নীভীতা সূর্যমুখীর দুঃখের কারণ হতে পারে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে নগেন্দ্র একে পাপ বলে মনে করছে। নিজের অসংযত হৃদয়ের জন্য নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছে। প্রসঙ্গত মনে করা চলে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে আর-একটি সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা আলোড়ন এনেছিল, বহুবিবাহ নিরোধের আন্দোলন। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে এই বিষয়টির প্রত্যক্ষ উল্লেখ নেই। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ও সিদ্ধান্ত কি ছিল তাঁর কোনো প্রবন্ধে সে কথা নেই। তাঁর দুটি উপন্যাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর গল্পে নায়কের তিন স্ত্রীর প্রসঙ্গ রয়েছে। অবশ্য তার সাহায্যে লেখকের সামাজিক মতামত বোঝা যায় না। নগেন্দ্রের গল্পে কিন্তু দাম্পত্যজীবনে একনিষ্ঠ না-হওয়াকে পুরুষ অপরাধ জ্ঞান করেছে। নারীর পক্ষেই সতীত্ব, পুরুষের স্বাধীনতা বল্গাহীন এই প্রতিষ্ঠা ধারণাকে বঙ্কিম চরিত্রের মধ্য থেকে ঘা দিলেন। নগেন্দ্রের দ্বিতীয় বিয়েতে সমাজ বিরূপতা দেখায়নি, নগেন্দ্রের চিত্ত দংশনক্ষত হয়েছে। এখানেই নতুন আধুনিক মানুষের জন্ম। নারীর প্রতি প্রেমে পুরুষেরও একমুখিতাকে আদর্শ ও অবশ্যপাল্য মনে করার মধ্যে সনাতনী নীতিবোধের বিনাশ। বিদ্যাসাগরে যা ছিল সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, বঙ্কিমে তাই ব্যক্তিগত চেতনা। বিষবৃক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যবোধে স্থিত নতুন সামাজিক পুরুষের আবির্ভাব।

১. কুন্দর চরিত্র বিশ্লেষণে এই সূত্রটি প্রমাণ করা যাবে।

চার

বিষবৃক্ষের মানুষদের গুরুত্ববিচারে কয়েকটি বর্গে ভাগ করা যায়।

'ক' ১. নগেন্দ্র

'খ' ২. সূর্যমুখী ৩. কুন্দনন্দিনী

'গ' ৪. হীরা ৫. দেবেন্দ্র

'ঘ' ৬. কমল ৭. শ্রীশ ৮. সতীশ ৯. হরদেব

'ঙ' ১০. তারাচরণ ১১. ব্রহ্মচারী ১২. সুরেন্দ্র ১৩. হৈমবতী

'চ' ১৪. মালতী ১৫. আয়ী ১৬. দাস-দাসী ও অন্যান্য পরিজনবর্গ।

ক-খ এই দুই স্তরের তিনটি নরনারীকে নিয়েই কাহিনী। ক-স্তরে মুখ্যপাত্র নগেন্দ্র–নায়ক। খ-স্তরে দুই মুখ্য রমণী সূর্যমুখী ও কুন্দ। গ-স্তরের হীরা ও দেবেন্দ্র উপগল্পের ভিত্তি। জটিল মানুষ হিসেবে এদের জায়গা প্রথম তিনজনের পরেই। এর মধ্যে দেবেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক কুন্দের ও হীরার। হীরার সম্পর্ক সূর্যমুখী কুন্দ দেবেন্দ্রের সঙ্গে–নগেন্দ্র পর্যন্তও কিঞ্চিৎ পৌঁছেছে।

ঘ-স্তর থেকে নরনারী মূল পাত্রপাত্রী পাঁচজনকে এবং গল্পের বিকাশকে প্রভাবিত করার জন্য নিযুক্ত। তবে ঘ-ঙ-চ এই তিনস্তরের গুরুত্ব সমান নয়। ঘ-স্তরের লোকেরা অনেক স্ফুট-ব্যক্তিত্ব। তাদের অল্পাধিক প্রভাব প্রথম তিনজনের উপরে। ঙ-স্তরের নরনারীর সম্পর্ক উপকাহিনীর দুজনের সঙ্গে। চ-স্তরে আছে লোকের ভিড়–তারা নেহাৎই পটভূমি।

আরও নানা ভাবে চরিত্রগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। তাদের সাধারণ পরিচয় নিতে এই বর্গীকরণ সহায়ক হবে।

ক. পুরুষ

১. শিক্ষিত উচ্চবংশজাত সঙ্গতিসম্পন্ন – নগেন্দ্র দেবেন্দ্র শ্রীশ হরদেব সুরেন্দ্র।
২. জমিদার শ্রেণীর – নগেন্দ্র দেবেন্দ্র সুরেন্দ্র।
৩. চাকুরিজীবী – শ্রীশ তারাচরণ।
৪. ব্রাহ্মসমাজের – দেবেন্দ্র তারাচরণ।
৫. লম্পট উচ্ছৃঙ্খল – দেবেন্দ্র।
৬. জ্ঞানী-দার্শনিক – হরদেব।
৭. বিবেক-জাতীয় – সুরেন্দ্র।
৮. সরল – সুরেন্দ্র শ্রীশ হরদেব।
৯. জটিল – নগেন্দ্র দেবেন্দ্র।
১০. গাঢ়-গম্ভীর – নগেন্দ্র।
১১. তরল – দেবেন্দ্র শ্রীশ।
১২. অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষত – নগেন্দ্র।
১৩. ট্র্যাজিক – নগেন্দ্র দেবেন্দ্র।

১৪. পরিবর্তমান – নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র (স্বল্পত)
১৫. স্থির – সুরেন্দ্র শ্রীশ হরদেব তারাচরণ।

খ. নারী

১. সম্ভ্রান্তবংশীয় গৃহবধূ – সূর্যমুখী কমল হৈমবতী।
২. আশ্রিতা বালবিধবা – কুন্দ।
৩. পরিচারিকাশ্রেণীর – হীরা মালতী আয়ী।
৪. সরল – কুন্দ কমল হৈমবতী।
৫. তরল – কমল।
৬. গম্ভীর-গাঢ় – সূর্যমুখী।
৭. গাঢ়-স্নিগ্ধ – কুন্দ।
৮. জটিল – সূর্যমুখী হীরা।
৯. অন্তর্দ্বন্দ্বক্ষত – সূর্যমুখী।
১০. ট্র্যাজিক – সূর্যমুখী কুন্দ হীরা।
১১. পরিবর্তমান – সূর্যমুখী কুন্দ হীরা।
১২. স্থির – কমল হৈমবতী ও অন্যান্য।

গ. দম্পতি

১. নগেন্দ্র – সূর্যমুখী।
২. নগেন্দ্র – কুন্দ।
৩. তারাচরণ – কুন্দ।
৪. শ্রীশ – কমল।
৫. দেবেন্দ্র – হৈমবতী।

ঘ. শিশু

১. সতীশ।

ঙ. সহযোগী-চরিত্র (বন্ধুশ্রেণীর)

১. নগেন্দ্র – হরদেব।
২. দেবেন্দ্র – সুরেন্দ্র।
৩. সূর্যমুখী – কমল।[২]

এই তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিষবৃক্ষে মানুষের সংখ্যা অনেক নয়,কিন্তু বৈচিত্র্য অনেক। তাদের বিন্যাসে আছে চতুরতা; একাধিক পাত্রপাত্রীকে গোষ্ঠীবদ্ধ করায় (গ ও ঙ বর্গ দ্রষ্টব্য) এসেছে বিশেষ তাৎপর্য। সামাজিক শ্রেণীবোধ সমকালের গভীরে অনুপ্রবিষ্ট। পাত্রপাত্রীদের মধ্যে নানা ধরনের সাদৃশ্য, বৈপরীত্য বা সাদৃশ্যে-বৈপরীত্য ও বৈপরীত্য-সাদৃশ্য। এবং এর মধ্য দিয়ে মানবরহস্যের উপরে বিভিন্ন দিক থেকে ঠিকরে পড়েছে আলো।

২. বর্গীকরণ সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক শৃঙ্খলায় সাজাতে গেলে কপালকুণ্ডলায় অনুসৃত রীতি গ্রহণযোগ্য। তবে সাহিত্য-আলোচনায় অনেক সরলভাবে শ্রেণীবিন্যাস করাও চলে। এখানে তার একটি নিদর্শন দেওয়া হল।

উল্লেখ্য পুরুষেরা সবাই উচ্চমার্গের। বংশে কলঙ্ক থাকলেও বা অপরের আশ্রয়ে বড় হলেও তারাচরণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত। কিন্তু একটি প্রধান নারীচরিত্র এসেছে পরিচারিকা শ্রেণী থেকে। বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গের প্রয়োজন ছাড়া গভীর মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসায় এই শ্রেণীর রমণী আগে জায়গা পায়নি। সতীশ বঙ্কিম-সাহিত্যে বলার মতো দুটি শিশুর অন্যতম। আর একটি শিশু আছে ইন্দিরায়। বাৎসল্যের মাধুর্য ও কৌতুক-বর্ষণে সতীশের উপস্থিতি মন কেড়ে নেয়। প্রচুর হাস্যের সংযোগে সন্তান-স্নেহের সরল সেন্টিমেন্টাল আবেদন মার্জিত হয়েছে। মা-বাবার সস্নেহ দৃষ্টির ফ্রেমে সবটাই সানন্দ, যদিও ভাব-ব্যাকুল নয়। তবে সতীশ নকল নয়, তাতে শিশুর স্বাভাবিকতা আছে।

পাঁচজোড়া দম্পতির কথা এই উপন্যাসে। তারাচরণ-কুন্দের দাম্পত্য জীবনের উল্লেখমাত্র আছে, পটভূমি ডিঙিয়ে তাকে সামনে আনা হয়নি। নগেন্দ্রের সঙ্গে তার বিয়ের পরে শুধু প্রত্যাশাদীর্ণ প্রতীক্ষা এবং স্বামীর অবহেলা। দেবেন্দ্র-হৈমবতীর দাম্পত্য জীবনও পরোক্ষ বিবৃতিতে সীমাবদ্ধ, কিন্তু দেবেন্দ্রের মনের জট পাকাতে তার ভূমিকা জরুরী। কুন্দের বেলায় তারাচরণের সে রকম কোনো প্রভাব নেই।

নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর ঘনিষ্ঠ দাম্পত্য ভালোবাসা থেকে তীব্র বিচ্ছেদে এবং সমাপ্তির আপাত পুনর্মিলনে বিবর্তিত। তার একধারে শ্রীশ-কমলের তরল মধুর হাস্যময় সংসার জীবন – শিশুর কলধ্বনিতে মুখর। উপন্যাসের অন্য কোনো দম্পতির সন্তান নেই। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর, অন্যদিকে দম্পতি দেবেন্দ্র-হৈমবতীর, অপ্রেমে বিরূপতায় ঘৃণায় ক্রোধে যে সংসার ভেঙে গিয়েছে। এই তিন জোড়া স্বামী-স্ত্রীর সন্নিবেশ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে একটি তুলনামূলক ছকের সাহায্য নেওয়া যাক।

কমল-শ্রীশ মধুর ও সহাস্য দাম্পত্য + সন্তান	সূর্যমুখী-নগেন্দ্র গাঢ় প্রণয়াবদ্ধ –সন্তান	হৈমন্তী-দেবেন্দ্র অপ্রেম বিচ্ছিন্ন –সন্তান
স্থিরচিত্র || সরল কমেডি শিল্পগুণ অল্প	নগেন্দ্রের পতন দুজনে বিচ্ছেদ || গাঢ় ট্র্যাজেডি শিল্পগুণ উচ্চাঙ্গের	দেবেন্দ্রের পতন || ট্র্যাজেডি শিল্পগুণ মধ্যম স্তরের

বঙ্কিমচন্দ্র দাম্পত্যের বিচিত্রতা এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু বিপরীত-সাদৃশ্যের ভাবও তৈরি করতে চেয়েছেন। প্রথম এবং তৃতীয় দম্পতির ক্ষেত্রে যথাক্রমে সন্তান থাকা বা না থাকা যেমন প্রত্যাশিত, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা নয়। তাদের সন্তান থাকা উচিত ছিল। কিন্তু

নেই। এর প্রতিক্রিয়া বিষয়ে লেখক নিরুচ্চার থেকেছেন, কিন্তু নির্ভুল তর্জনী পাঠক-সমালোচককে প্রলুব্ধ করবে। আবার প্রথমক্ষেত্রে মিলন এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে বিচ্ছেদের কারণ স্পষ্ট, কিন্তু দ্বিতীয় জুটির বেলায় নগেন্দ্রের পতন এবং দুজনের বিযুক্তি বাইরের সহজ যুক্তির আয়ত্ত নয়, সেজন্যই অন্তর্ব্যাপ্ত।

মোটকথা লেখক সূর্যমুখী-নগেন্দ্রের দাম্পত্যের কাহিনীকে কেন্দ্রীয় অভিপ্রায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন – দুধার থেকে সাদৃশ্যে-বৈপরীত্যে অন্য দুটি দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে তাকে অন্বিত করেছেন। আবার এদের সম্বন্ধ কুন্দের সহযোগেই জটিলতর – কুন্দ-নগেন্দ্রের বিয়েকে অবলম্বন করে ত্রিমুখী। এই তিনটি দম্পতির সঙ্গে তারাচরণ-কুন্দর বিবাহিত জীবনের অপরিস্ফুট পরিচয় এবং নগেন্দ্র-কুন্দের প্রায় ক্ষণস্থায়ী দাম্পত্যের পরিস্ফুট ছবিটি মিলিয়ে দেখলে বাঙালি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের একটা বড় অংশ আয়ত্তে এসে যায়।

তারাচরণ-কুন্দের মধ্যে যথার্থ হৃদয়-সম্বন্ধ কি ছিল জানা যায় না। উগ্র নব্যপন্থীর বালিকা-বিবাহ, ঘটনাসূত্রে এটুকু অনুমান করা চলে। তারাচরণের দ্রুত মৃত্যু ঘটায় এ অংশ কুন্দের জীবনে নেহাৎ পটভূমি হয়ে থেকেছে। নগেন্দ্র-কুন্দের সম্পর্ক কিন্তু তীব্র চিত্ত-আন্দোলনে তরঙ্গিত। রোম্যান্টিক প্রণয়ের পরিণতিতে বিবাহ।

কুন্দ-তারাচরণ, কুন্দ-নগেন্দ্র। নগেন্দ্র-সূর্যমুখী, নগেন্দ্র-কুন্দ। আবার নগেন্দ্র-কুন্দের সম্বন্ধকে– তার উন্মেষ ও বিকাশকে দৃষ্টিতে রেখে দেখলে – কুন্দের একধারে তারাচরণ, নগেন্দ্রের অন্যদিকে সূর্যমুখী। তারাচরণকে নিয়ে কুন্দের মনে কোনো সংস্কার বা আকর্ষণ নেই, কোনো ভাবনা বা সেন্টিমেন্টের চিহ্নও ছিল না। কুন্দ-নগেন্দ্রের প্রথম দেখা থেকে পরিণত সংযোগের মাঝখানে তা কুন্দের জীবনের এমন একটা পর্যায় যা নিঃশেষে হারিয়ে গেল। এটা লেখকের দুর্বলতা বলে গণ্য হবে। আরও কিছু জটিলতাকে এড়িয়ে যাবার জন্যই এরূপ করা হয়েছে, অথবা অন্যত্র দৃষ্টি স্থির-নিবদ্ধ রাখার জন্যে। উদ্দেশ্য যাই হোক, কাজটি শিল্পের বিচারে অবৈধ। অন্যদিকে নগেন্দ্রের সঙ্গে তার দাম্পত্য বন্ধন আগে-পিছে নানা মাত্রায় নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সম্পর্কের দ্বারা প্রভাবিত। এবং নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সম্পর্কেও তার জটিল প্রতিক্রিয়া।

উপন্যাসের চারধারে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজের শব্দ-স্পর্শ, আর ভিতরে বাঙালির দাম্পত্যজীবনের এত ভিন্ন ভিন্ন রূপ, বিবিধ সমস্যা এবং তার মধ্য দিয়ে মানবিক সত্যের সন্ধান। সেকালের বিশিষ্ট সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন 'বঙ্গবাণী' বইয়ে বঙ্কিমের তিনটি উপন্যাসকে 'পরিবারতন্ত্রের ত্রিগাথা' বলেছিলেন। সংসার জীবনের নৈতিকতার আদর্শের দিকে চেয়ে এ কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু আর একটু গভীর ভাবেও এ মন্তব্যের সত্যতা বোঝা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালির পরিবার-জীবনকে প্রধানত স্বামী-স্ত্রী-কেন্দ্রিক বলে ভাবতে চেয়েছেন। বঙ্কিমের কল্পিত পরিবার অন্যান্য পুরজন হয় অনুপস্থিত, না হলে একান্ত গৌণ। এমন কি সন্তানও ক্বচিৎ যেখানে আছে, সেখানে লঘুরস বাৎসল্যের কৌতুক ছাপিয়ে ওঠেনি। প্রণয়কেই তিনি নানারূপে দেখতে চেয়েছেন পরিবারের সীমায়, বা সীমা ভেঙেছেন প্রেমের আঘাতেই।

শান্তি ও আনন্দের পূর্ণ আয়োজন যেখানে (শ্রীশ-কমল) তাও তরল – স্বাদু তবে উঁচু কিছু নয়। দাম্পত্য জীবনের আদর্শ যেখানে বিম্বিত বক্র ক্লিষ্ট বিস্ফোলিত সেখানেই মানব-সত্যের রহস্য – বড় শিল্প।

মধুসূদন দত্ত ১৮৬২ সালে 'বীরাঙ্গনাকাব্যে' পুরাণের বেশে কিছু আধুনিক নারীর কথা বলেছিলেন। সেই এগারোটির মধ্যে সাতটিতেই দাম্পত্যজীবনের বৈচিত্র্য আলোচিত। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'ও রাবণ-মন্দোদরী, রাবণ-চিত্রাঙ্গদা, মেঘনাদ-প্রমীলা, রাম-সীতা এই সব দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যেই মুখ্য চরিত্রগুলি স্থিত। দেখা যাচ্ছে এই দাম্পত্য-প্রবণতা বঙ্কিমের কিছু অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য নয়। সমকালের শ্রেষ্ঠ দুজন শিল্পী একই প্রসঙ্গে এত বেশি আসক্ত। বাঙালি নরনারীর সেকালে প্রায় একমাত্র সামাজিক বন্ধন ঐটিই – তাকে নানা রঙের সঙ্গীতে বাজিয়ে তুলতে চেয়েছেন এঁরা। এর মধ্য দিয়ে নৈতিক আদর্শের দিকে নির্দেশ না করে জীবন ও মনের অনেক রহস্যের খোঁজ করাই তাঁদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। তখনকার সমাজধৃত সত্য হিসেবে অন্য রকম সংযোগকে প্রাধান্য দেওয়া একান্ত অস্বাভাবিক হত। এ সবই এঁদের সচেতন সমকালীনতা। মধুসূদনের তুলনায় বঙ্কিম অবশ্যই বৈচিত্র্যে ও জটিলতায় অনেক সমৃদ্ধ। এবং বঙ্কিমের তাবৎ রচনার মধ্যে বিষবৃক্ষে এই জীবনসত্যকে নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নানান রঙের আলো প্রতিফলিত করে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে কোন্ দম্পতি আদর্শ তার খোঁজ নেওয়া বৃথা – বালকোচিত কোনো নৈতিক সিদ্ধান্তে বঙ্কিমের আস্থা ছিল না, তাহলে শ্রীশ-কমলের শান্ত সুখই হয়তো লেখকের মুখ্য আলোচ্য হয়ে উঠত, দেবেন্দ্রের মনোবিকলনে তিনি এত ব্যস্ত হতেন না; জীবনরহস্য আছে দেবেন্দ্রে, অনেক বেশি নগেন্দ্রে – শ্রীশে নয়, এ বিষয়ে লেখক নিঃসংশয়।

সহযোগী পাত্রপাত্রীর সাহায্য নেওয়া বঙ্কিমের পুরোনো অভ্যাস। এর সুব্যবহার কপালকুণ্ডলায়, বিষবৃক্ষেও। এর দ্বারা মূল চরিত্রের মাত্রা বেড়ে যায়, কখনো তাতে বক্রতা আসে, অন্য প্রয়োজনও সিদ্ধ হতে পারে। বিষবৃক্ষে যে তিনটি চরিত্র এই কাজে ব্যবহৃত তারা ধরনে স্বতন্ত্র। যেমন –

হরদেব। অন্তরালবাসী, অস্পষ্ট মানুষ। নগেন্দ্রের আত্মবিশ্লেষণের অবলম্বন–তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ চিঠির প্রাপক। তাকে অবশ্য নগেন্দ্রের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব বলে কখনও মনে হয় না।

কমল। সূর্যমুখীর আবাল্য সখী, ননদ, গোপন বেদনা প্রকাশের পাত্রী। নিজের স্বতন্ত্র স্বভাবে উজ্জ্বল। সূর্যমুখীর গাঢ় বিষণ্ণতার বিপরীত মেরু। আরও লক্ষণীয় কুন্দের প্রতিও সে সস্নেহ।

সুরেন্দ্র। দেবেন্দ্রের জ্ঞাতি ভাই সুরেন্দ্র কিছু সদুপদেশের বাহক। কিন্তু বাইরে থেকে আসা নীতিবাগীশ সে নয়। দেবেন্দ্রের অন্তর্গূঢ় দ্বিতীয় সত্তা সুরেন্দ্র, চিত্তদ্বন্দ্ব প্রকাশের জন্যই দুজন মুখোমুখী; দুয়ের কথাবার্তা আসলে দেবেন্দ্রের আত্মকথন। লেখক যে সচেতনভাবে একাজ করেছেন তার প্রমাণ দেয় নামের অদ্বয় (দেব-সুর)। সুরেন্দ্র ব্যক্তি হিসেবে পরিস্ফুট নয় বলে প্রশ্ন তোলা অর্থহীন – কারণ সে দেবেন্দ্রের

বিবেক-দংশন। বঙ্কিমচন্দ্র আভ্যন্তর হৃদয়-সংঘাত ফোটাবার জন্য যে সব অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন, এটি তার অন্যতম।

এমন কি হীরাকেও একটি সমশ্রেণীর সঙ্গিনী দেওয়া হয়েছে। মালতী বাড়ির পরিচারিকা এবং স্বৈরিণী। তার পাশে রাখায় হীরা প্রেমে এবং পাপে অনেক বেশি ভালো ঠিকরেছে।

পাঁচ

স্বতন্ত্র চরিত্র হিসেবে দেবেন্দ্র হীরা কুন্দ সূর্যমুখী নগেন্দ্রের কথাই বিশেষভাবে আলোচনার যোগ্য। অন্য পাত্রপাত্রীরা তাদের শ্রেণীগত পরিচয়ের মধ্যেই অনেকখানি ধরা পড়ে যাচ্ছে – সূক্ষ্মতর পর্যবেক্ষণের অবকাশ সেখানে নেই। তবে একটি উপন্যাসে যথার্থ বিশ্লেষণ যোগ্য পাঁচটি চরিত্রের খোঁজ পাওয়া বড় রকমের প্রাপ্তি।

লেখক দেবেন্দ্র-হীরাকে সরাসরি পাপিষ্ঠ বলে চিহ্নিত করেছেন। এতে পাঠকদের বিভ্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। লেখক স্বয়ং যেন নৈতিক রক্ষণশীলতার একটা ভূমিকা নিচ্ছেন। নিজেকে বা অন্যকে নীতিভ্রষ্ট মনে করা কোনো চরিত্রের ব্যক্তিগত মতামত। ঔপন্যাসিকের নিজের ভাষায় ও-জাতীয় মন্তব্য কিন্তু প্রায়ই লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিরূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু বঙ্কিমের মতো ঔপন্যাসিকের একটু সতর্ক বিচারই সঙ্গত। সমকাল সহজেই যাকে পাপাসক্ত বলে রায় দেবে, সাধারণ পাঠক পড়তে গিয়ে প্রথমেই যে কথাটা ভাববে তাই লেখক যেন আগ বাড়িয়ে বলে নিয়েছেন। তার পরে ধাপে ধাপে তাদের মনের জট খুলেছেন–মানব-অস্তিত্বের এক বেদনাবিদ্ধ রূপ, ব্যক্তির অনিবার্য নিয়তিকে দেখেছেন।

দেবেন্দ্র লম্পট, নব্যশিক্ষিত এবং নির্লজ্জ। হৈমবতীর সঙ্গে তার দাম্পত্য-জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ বিবরণ দিয়ে লেখক তার স্বভাবের পটভূমি তৈরি করেছেন। 'যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল, তখন পর্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। ...কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহার কাল হইল। যখন দেবেন্দ্র উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন যে ভার্যার গুণে গৃহে তাঁহার কোনো সুখেরই আশা নাই। বয়োগুণে তাঁহার রূপতৃষ্ণা জন্মিল, কিন্তু আত্মগৃহে তাহা ত নিবারণ হইল না। বয়োগুণে দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষা জন্মিল – কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী হৈমবতীকে দেখিবামাত্র সে আকাঙ্ক্ষা দূর হইত। সুখ দূরে থাকুক – দেবেন্দ্র দেখিলেন যে হৈমবতীর রসনাবর্ষিত বিষয়ে জ্বালায় গৃহে তিষ্ঠানও ভার। একদিন হৈমবতী দেবেন্দ্রকে এক কদর্য কটুবাক্য কহিল; দেবেন্দ্র অনেক সহিয়াছিলেন – আর সহিলেন না। হৈমবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন।'

দেবেন্দ্র গৃহিণী ও গৃহ ত্যাগ করল এবং ভোগতৃষ্ণা নিবারণের জন্য সস্তা পন্থা অবলম্বন করল অর্থাৎ 'পাপপঙ্কে' নিমজ্জিত হল। ঔপন্যাসিক সরল কিন্তু অভ্রান্ত মনস্তাত্ত্বিক কারণ নির্দেশ করলেন দেবেন্দ্রের চারিত্রিক অধঃপতনের। এর কি প্রয়োজন

ছিল? এই অনুচ্ছেদটি বাদ দিলে তার লাম্পট্য মাত্র প্রত্যক্ষ থাকলে চরিত্র হিসেবে সে শুধু ভর্ৎসনার পাত্র হত। তার সম্পর্কে দ্বিতীয় চিন্তার কথা উঠত না। এই পাপী মানুষটির মনও যে ভাবনার বিষয়, ব্যাখ্যার বস্তু, তলিয়ে বুঝে নেবার যোগ্য এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ সে বিষয়ে আমাদের সচেতন করে। হৈমবতীর উপরে অনেকখানি দায়িত্ব পড়ায় দেবেন্দ্রের নিম্নগামিতা সামান্য সহানুভূতিও জাগায়।

জীবনে এবং সাহিত্যে কোনো মানুষের প্রতি সদয় হয়ে ওঠা আসলে দুই ভিন্ন বোধ। কোনো চরিত্রের প্রতি সহানুভূতির মানেই হলো নৈতিক পরিচয় বিশেষত সামাজিক ভ্রষ্টতা ডিঙিয়ে তার মনুষ্যত্বে প্রবেশ, ব্যক্তিত্বের সন্ধান – তার সম্পর্কে সকরুণ বা সেন্টিমেন্টাল হয়ে ওঠা নয়। আসলে পাপীতাপী যে কোনো মানুষ সাহিত্যিকারের দৃষ্টিতে এই অর্থে সহানুভূতির পাত্র – বিরূপ চিত্ত নিয়ে মনের ভেতরে নামার সিঁড়ি পাওয়া যায় না। আর বঙ্কিমের ক্ষেত্রে এই করুণা অনেকটাই নিরাসক্তের – এক ধরনের নির্মম মমত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উল্লেখযোগ্য সব সৃষ্টির প্রতি, পাপীতাপী মানুষের প্রতিও এই মমত্ব পোষণ করেন। তা নিরাসক্ত বলে উচ্ছ্বাস-ব্যাকুল নয়, কিন্তু কর্কশ ধিক্কারও নয়। যে চিত্তদৌর্বল্যের বা আত্মিক ব্যাধির অন্য নাম মানব-অস্তিত্ব, এই সহানুভূতিই বাতির মতো তাকে পথ চিনিয়ে দেয় – মনের সেই গহন অন্ধকারে বিচরণের জন্য। দেবেন্দ্রও তা থেকে অবশ্য বঞ্চিত নয়। প্রথম সুযোগে তাই যত সংক্ষেপেই হোক তার ঐ পূর্বকাহিনী উল্লিখিত হয়েছে।

দেবেন্দ্রের বহুনারীসংসর্গে কামাচরণ এ কাহিনীর বিষয় নয়। লেখকের ইঙ্গিতটুকু তার পর্যাপ্ত পরিচয় দেয়। বিষবৃক্ষে সে দুই নারীর সঙ্গে জড়িত। কুন্দনন্দিনীকে সে চেয়েছে, পায়নি; হীরাকে সে চায়নি – পেয়ে গেছে।

কুন্দ সম্পর্কে তার আগ্রহ প্রথম দিকে যে রূপ ধরে আত্মপ্রকাশ করল তাকে নবীন যুবকের রোমান্টিক ব্যবহার বা লম্পটের হীন কৌশল – দুভাবেই ব্যাখ্যা করা চলে। নায়কের ছদ্মবেশে প্রিয়া সমাগমের চেষ্টা সব দেশের প্রেম সাহিত্যে পাওয়া যাচ্ছে। নারীর বেশে বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণ বা আরব্য উপন্যাসের বহু নায়ক অভিসার করেছে। দেবেন্দ্র কুন্দের দেহের প্রতি লুব্ধ ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কুন্দ সম্পর্কে তার মনোভাব সেই লোভেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সুরেন্দ্রের কাছে কুন্দের কথা বলতে গিয়ে সে তাকে 'দেবকন্যা' বলে অভিহিত করেছে। শব্দটির তাৎপর্য আছে। লম্পট নারীকে ভোগের স্থূল উপকরণ বলেই মনে করে, তার প্রতি সশ্রদ্ধ হতে পারে না। 'দেবকন্যা' কথাটিতে অনেকটা শ্রদ্ধা আছে, সঙ্গে মিশেছে 'কাম্য হলেও অপ্রাপণীয়া' এই ভাবটি। দেবেন্দ্রের নিজের ভাষায়, 'আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য আর কোথাও নাই। জ্বরে যেমন তৃষ্ণা রোগীকে দগ্ধ করে, উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরূপ দগ্ধ করিতেছে। সেই অবধি উহাকে দেখিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। এ পর্যন্ত পারি নাই – শেষে এই বৈষ্ণবী-সজ্জা ধরিয়াছি। তোমার কোনো আশঙ্কা নাই – সে স্ত্রীলোক অত্যন্ত সাধ্বী।'

দেবেন্দ্র নিজে একে 'লালসা' বলেছে। দেবেন্দ্রের মতো মানুষের প্রেমে লালসা জড়িয়ে থাকবেই। কিন্তু সে ছদ্মবেশে নগেন্দ্রের অন্তঃপুরে বার বার যাচ্ছে কুন্দের মনজয়ের বা তার দেহপ্রাপ্তির কোনো আশা নেই জেনেও ' কেবল তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহাকে দেখিয়া, তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া, তাহাকে গান শুনাইয়া আমার যে কি পর্যন্ত তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতে পারি না।'

কুন্দের স্বপ্নই দেবেন্দ্রের চিত্তের একমাত্র আরাম। এই স্বপ্নের জন্য সে তার শেষ সুহৃদকে বর্জন করতে, প্রয়োজনে সব বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে দিতেও রাজি। 'তোমাকে যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।' শুধুই তাকে দেখবার আশা – নিজের কাম্যস্বপ্ন দর্শনের প্রার্থনা। কিন্তু তার এই মনোভাবের মধ্যে কোনো আত্মিক শুদ্ধি খুঁজছি না। কারণ নানাভাবেই কুন্দকে পাবার চেষ্টা তার ছিল। হীরাকে অর্থলোভে রাজি করাতে না পেরে তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেও যদি তা সম্ভব হয়। তাই আমার সিদ্ধান্ত, অন্য ভোগ্যা নারীর তুলনায় কুন্দের প্রতি দেবেন্দ্রের মনোভাব অনেকখানি ভিন্ন ছিল – হয়তো কুন্দের অপ্রগল্‌ভ প্রশান্ত স্বভাবের জন্য, সম্ভবত সে অনায়ত্ত থেকে যাওয়ায়। যদি কুন্দকে সে পেয়ে যেত তবে সে সাধারণীতে পরিণত হতো কিনা তা নিয়ে জল্পনা করে লাভ নেই। সব মিলে কুন্দ তার পরম কাম্য রোমান্টিক দীর্ঘশ্বাস– যাকে সে তার লালসার মুঠিতে ধরে নিজের ভূমিতে নামিয়ে আনতে চায়, সেখানে স্থূল প্রমোদ, নারীদেহ, মদ্যের স্রোত, আত্মগ্লানির বীভৎসতা – চৌকাঠে দাঁড়িয়ে মৃত্যু।

হীরা প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রের আচরণ তার স্বভাবসীমার মধ্যেই। সেখানে সে চতুর, স্থূল ভোগে আসক্ত, হৃদয়হীন হৃদয়-ব্যবসায়ী। হীরার চিত্ত-দুর্বলতার খোঁজ পেয়েই দেবেন্দ্র তার সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করল – উদ্দেশ্য তাকে বশ করে যদি কুন্দকে পাওয়া যায়।

লম্পট দেবেন্দ্র হীরার মতো অন্য অনেক মেয়েরও সর্বনাশ করেছিল। কিন্তু হীরার মতো, আসলে হীরা ছাড়া কেউ – তাকে কখনও ভালোবাসেনি। এ কথা ধীর চিত্তে কখনও সে ভাবেনি। মনের কোনো স্তরে এই উপলব্ধির ছায়াও কি পড়েনি? মৃত্যুশয্যায় সে হীরার চরম দুরবস্থা দেখল–বুঝল, জানল তারই কাজের ফল। অন্য অনেক নারীর এমনই দুর্দশা হয়তো সে করেছে – তার খবর সে রাখে না। এবং লোভে-ভয়ে তারা আত্মসমর্পণ করেছিল, হীরার মতো প্রেমে নয়। ক্ষতি করলেও তাদের সঙ্গে ছলনা সে করেনি, করেছিল শুধু হীরাকেই। এ সব ভাবনা কি তার মনের কোথাও কখনো ছিল? না হলে হীরার সঙ্গে শেষ দেখার পরে সে মানসিকভাবে এতটা বিচলিত হবে কেন? 'সেই অবধি দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যায় কণ্টকময় হইল। মৃত্যুর অল্প পূর্বেই জ্বরকালীন প্রলাপে দেবেন্দ্র কেবল বলিয়াছিল, 'পদপল্লবমুদারম্', 'পদপল্লবমুদারম্'।'

দেবেন্দ্রের এই বিনীত প্রার্থনা অবশ্য জীবন প্রেম মনুষ্যত্বের কাছে – যার সামান্যও তার ভাগ্যে জোটেনি। তবে রোগজীর্ণ বিকারের অবস্থায় বলেই এই আত্মসমর্পণের সকরুণ আকুতি – অন্য সময়ে রোগ মৃত্যুভয়কে তুড়ি মেরে দেহনাশী দশা ও লম্পট্যের মশাল জ্বালিয়েছে সে – ওটা ছিল তার প্রতিবাদের ভাষা যা সংসার তাকে দিল না তার বিরুদ্ধে।

শরৎচন্দ্র দেবদাসের জন্য চোখের জল ফেলতে বলেছিলেন, বঙ্কিম দেবেন্দ্রের পাপের শাস্তি দিয়ে নীতির পরকাষ্ঠা দেখিয়েছেন – এরকম সরল ও বহিরঙ্গ সিদ্ধান্তের কোনো সুযোগই চক্ষুষ্মান পাঠকের থাকে না।

হীরা দেবেন্দ্রের চেয়ে, এই উপন্যাসের সকলের চেয়েই জটিল চরিত্র। ঈর্ষায়-প্রতিহিংসায়-আত্মগর্বে-বুদ্ধি চাতুর্যে তীব্র প্যাসনেট, প্রেমে-প্রণয়ব্যর্থতায় ও প্রতিশোধে সে অতি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব।

মনিব সূর্যমুখীকে সে প্রতিদ্বন্দ্বিনী কল্পনা করে নেয়, অকারণেই তার উপরে রাগ। 'বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিল কেন? বিধাতা তাহাকে ফাঁক দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়। হীরাকে সূর্যমুখীর আসনে বসাইলে হীরার কি খলকপট থাকিত? ... আচ্ছা, সূর্যমুখীর উপর আমার এত রাগই বা কেন? সে ত কখন আমার কিছু মন্দ করে নাই; বরং ভালোই বাসে, ভালোই করে। তবে রাগ কেন? তা কি হীরা জানে না? আমি ছোট, – সে মুনিব আমি বাঁদী। সুতরাং তার উপরে আমার বড় রাগ। যদি বল, ঈশ্বর তাকে বড় করিয়াছেন তার দোষ কি? আমি তার হিংসা করি কেন? তাতে আমি বলি, ঈশ্বর আমাকে হিংসুকে করেছেন, আমারই বা দোষ কি?'

যেখানে প্রাপ্তি পূর্ণতা সেখানে তার হিংস্র মনের শরসন্ধান। নিজের ভাগ্যের বিরুদ্ধে এই তার যুদ্ধ। নিজেকে সে সূর্যমুখীর চেয়ে সুন্দরী ও গুণবতী বলে ভাবে। আর কুন্দকে সে তার সঙ্গে তুলনীয় বলেই মনে করে না। তার মতে কুন্দ 'মিন্‌মিনে ঘ্যান্‌ঘেনে প্যানপেনে'। বুদ্ধিতে চাতুর্যে ও তৎপরতায় ম্রিয়মাণ কুন্দকে সে অনায়াসে তুচ্ছ জ্ঞান করে। তবুও সে কুন্দের উপরে বিরূপ হলো যখন দেখল দেবেন্দ্রের ছদ্মবেশ ওরই জন্য। যে ভালোবাসা পেয়েছে, ঐশ্বর্য সুখ মর্যাদা পেয়েছে তাকেই শত্রু বলে ভাবে হীরা, তাকে আঘাত করে এক ধরনের বিকৃত আনন্দ সে পায়। এতকাল যে কুন্দকে সে আক্রমণের যোগ্য মনে করেনি, দেবেন্দ্রের প্রণয়পাত্রী বলে জানামাত্র তার ক্ষতি করতে উদ্যত হলো। দাসীবৃত্তি ও দারিদ্র্যকে সে ভগবানের দান, জন্মান্তরের কর্মফল বলে মাথা নিচু করে মেনে নেয়নি, এক রকম বিদ্রোহ করেছে–এখানে তার সেই বিদ্রোহ।

কুন্দ-সূর্য-নগেন্দ্রের হৃদয়সমস্যাটি অনুমান করে নিতে তার দেরি হয়নি। তাদের মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতার সুযোগে সংসারের স্থিতি বিচলিত করতে তখন থেকেই সে তৎপর হয়ে উঠেছে। লেখক একবার এই সুযোগে হীরার কিছু অর্থ-লাভের ইচ্ছার কথা বলেছেন। সেটুকু অতিরিক্ত কারণ দেখিয়ে চরিত্র-ভিত্তিকে আরও দৃঢ় করার চেষ্টা। কিন্তু তার ভীষণ রাগ, নৈতিক কারণে চুরিতে আপত্তি থাকার মেয়েও সে নয়, কিন্তু অর্থলোভ তার স্বভাবে গুরুত্ব পায়নি। একটা সুখের সংসার ভাঙছে–এতেই তার পরমানন্দ–তাকে পড়ে যেতে আর একটু সাহায্য করায়। অগ্নিকাণ্ডের মূল ওদের স্বভাবে, বাইরে থেকে অনেকটা কাঠ যুগিয়েছে হীরাই। তাকে তাই ভিলেন-জাতীয় চরিত্র বলা যেতে পারে। দেবেন্দ্রের দুর্বৃত্ততা মূল সমস্যাকে বিশেষ স্পর্শ করেনি। তাকে কাহিনীর ভিলেনের মধ্যে ফেলা চলবে না।

হীরা ভিলেন, কোনো স্থূল লোভ বা সহজ লাভের জন্য নয়। এটা হলো তার ভাগ্যের মার জীবনকে ফিরিয়ে দেওয়া–ভাগ্যবানকে ঘা দিয়ে এখানে তার প্রতিশোধ নেবার পালা চলেছে। হীরার পাপের চূড়ান্ত নিদর্শন কুন্দকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে তার হাতে বিষ তুলে দেওয়ায়, কিন্তু সেখানেই তার নারী-পরিচয়ের অন্য এক শীর্ষ বিন্দু।

হীরার চরিত্রের যে মূল বৈশিষ্ট্য তাতে ভালোবাসায় গলে যাবার সম্ভাবনা কম। লেখকের ভাষায় হীরার আত্মবিশ্লেষণ, 'হাঃ কপাল! আর মনকে চোখ ঠারলে কি হবে? ভালোবাসার কথা শুনিলে হাসিতাম। বলিতাম, ওসব মুখের কথা, লোকে একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এখন আর ত হাসিব না। মনে করিয়াছিলাম, যে ভালোবাসে, সে বাসুক, আমি ত কখনও কাহাকে ভালোবাসিব না। ঠাকুর বল্লে, রহ, তোরে মজা দেখাচ্ছি।'

হীরা হঠাৎই লম্পট দেবেন্দ্রকে ভালোবেসে ফেলল। হীরার উগ্র বক্র মন মনের গোপনে এমনই একটি পুরুষের জন্য প্রতীক্ষা করছিল যে নেশাগ্রস্ত গীতিমত্ত বিধিভঙ্গকারী, রমণীর সন্ধানে নারীর ছদ্মবেশে যে ভদ্র গৃহস্থের অন্তঃপুরে যেতে দ্বিধা করে না। চটুল চতুর সরস কথার মোহ বিস্তারে যে অনায়াস। এতদিন প্রেম নামক হৃদয়াবেগ তার কাছে কৌতুকের বিষয় ছিল, এখন তা সব শক্তি নিয়ে লেলিহান হয়ে উঠল। তার কুন্দের প্রতি ব্যবহারে একান্ত ব্যক্তিগত ঈর্ষাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল।

দেবেন্দ্র-হীরার প্রেম– আসলে হীরার প্রেম এবং দেবেন্দ্রের অভিনয় – এর বিকাশ অবিশ্বাস-জিগীষা-সংঘাত-বুদ্ধির প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে যুবতীর বিগলিত আত্মসমর্পণে পরিণত হয়েছে।

হীরা নিঃসন্দেহে বুঝেছিল কুন্দের জন্যই দেবেন্দ্র তার প্রতি প্রীতির ভাব দেখাচ্ছে। দেবেন্দ্রকে চোর বলে দারোয়ানদের কাছে সে লাঞ্ছিতও করেছিল; অপ্রেমিক দেবেন্দ্রের কাছে আত্মদান করায় তার প্রবৃত্তি ছিল না। তবু সে সব ভুলে গেল। 'দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া একপ্রকার চলনসই করিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুর স্বরে ভাবযুক্ত মধুরভাবে গায়িলেন। হীরার চক্ষু আরও জ্বলিতে লাগিল। ক্ষণকাল জন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। ... মনে করিতেছিল, বিধাতা দুই জনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়সুখে উভয়ে সুখী।'

ছত্রিশতম পরিচ্ছেদে লেখক হীরার সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের বর্ণনা দিয়েছেন। সেই প্রণয়বিহ্বল বিবরণে – নৈতিক পাপ যদি কিছু থাকে ত তা আবৃত, রঙিন ও মধুর হয়ে উঠল। দেবেন্দ্র অল্পদিনে তাকে রূঢ় ভাবে বিদায় দিল। শুধু তাই নয়, ঐ প্রেম যে নেহাৎ উদ্দেশ্যমূলক অভিনয় তা সরবে জানিয়ে দিয়ে হীরার স্মৃতির স্বপ্নকেও বিদ্ধ করল। সে কথা হীরার একান্ত অজানা ছিল না, কিন্তু সে তা বিস্মৃতিতে পুঁতে দিয়েছিল। এর আঘাতে হীরা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেল। আত্মহত্যা করতে গিয়ে কিন্তু শত্রু-হত্যা করল কুন্দনন্দিনীকে। লেখক শেষ পর্যন্তও হীরার স্বভাবের বক্রতীব্র সর্পিল গতি ও প্রতিহিংসাবৃত্তিকে সযত্নে বজায় রেখেছেন – তাকে সেন্টিমেন্টাল হয়ে উঠতে দেননি।

হীরার পরিণতিতে দেখা গেল এই শীতল হত্যার মানসিক চাপেরও কিছু প্রতিক্রিয়া আছে। যদিও উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে তার ঐভাবে হাজির হওয়া কিছু অতিনাটকীয়। কিন্তু সে ত্রুটি ভেদ করেও দেবেন্দ্রের প্রতি ঘৃণা ছাপিয়ে তার প্রেম-প্রাপ্তির দিনগুলির 'অবসেসন' স্মরগরলখণ্ডনের গানে ধরা পড়েছে।

হীরার প্রেম খাঁটি ছিল এবং তার স্বভাবের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তার প্রেমে পাপ ছিল, ছিল মানবঘাতী ক্রুর হিংসা। ওসব নিয়েই হীরার প্রেম।

কুন্দের সরল স্বভাব। অতীব্র প্রেম, কিন্তু গম্ভীর। সে সহ্য করে, ভাগ্যের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠে নালিশ করতে জানে না। নীরব সহনশীলতা তার, ঘটনাধারার কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ।

আকৈশোর ঘনিষ্ঠ পরিচিতি আশ্রয়দাতার প্রতি তার হৃদয়কে দ্রবীভূত করছিল, লেখক তা জানাননি। সূর্যমুখী তাকে দ্রুত তারাচরণের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল – এ কার্যের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য বোঝার ক্ষমতা কুন্দের ছিল না। কিন্তু অনুভব করার শক্তি ছিল কি – মনের অজ্ঞাত অন্তঃপুরে যা সঞ্চিত হচ্ছিল?

যখন নগেন্দ্রের মন নিয়ে নগেন্দ্র-সূর্যমুখী এমন কি কমলমণিও তীব্রভাবে আলোড়িত, কুন্দ তার মনের অতলে ভালোবাসা লুকিয়ে রেখেছিল, নিজেই তার খবর পুরো পায়নি। কমল তাকে জিজ্ঞাসা করলে (খুব নিরীহ সে প্রশ্ন – 'তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস – না?' বিশেষত 'বড়' বিশেষণ ব্যবহার করায় সে ভালোবাসা প্রেম না হয়ে প্রীতি-শ্রদ্ধাও হতে পারে এমন সম্ভাবনা রইল) কুন্দের সুপ্ত হৃদয় অশ্রুধারায় আত্মপ্রকাশ করল। 'বুঝেছি – মরিয়াছ। মর তাতে ক্ষতি নাই – কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে?' 'পোড়ারমুখী চোখের মাথা খেয়েছ? দেখিতে পাও না যে –'

এই কথাগুলিতে সরল কুন্দেরও বুঝতে বাকি রইল না যে তার মনের অস্ফুট অস্পষ্ট চাঞ্চল্যের একটা বড় রকমের ভিত্তি আছে। এখানে কমলমণির সংস্পর্শেই তার প্রেমের উন্মেষ।

কুন্দের সারা জীবন দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের। দত্তদের পরিবারেই মাত্র সস্নেহ আশ্রয় পেয়েছিল সে। কৃতজ্ঞতা ছিল নগেন্দ্রের প্রতি, সূর্যমুখীর প্রতিও। অবশ্য সূর্যমুখী সম্পর্কে তার প্রীতির কোনো নিদর্শন নেই, সম্ভবত তার সংযত বিরক্তির প্রতিক্রিয়ায়। সূর্যমুখীকে সে মনে মনে ভয় পেত, অনেকটা নিজের অজ্ঞাতে। মনের কোনো একটা স্তরে এই বোধ তার ছিল যে সূর্যমুখী তাকে পছন্দ করে না। সঙ্গে মিশেছিল কিছু অপরাধ-বোধ, নগেন্দ্র সম্পর্কে নিজের হৃদয়-দৌর্বল্যের জন্য।

অবশ্য উপকারী নগেন্দ্রের সস্নেহ দৃষ্টিতে পড়বার ক্ষমতা একান্ত অচতুর কুন্দেরও ছিল। এই মনোভাব কখন প্রণয়োন্মুখ হয়ে উঠল, কিভাবে ক্রমিক বিবর্তন ঘটল হৃদয়ের বঙ্কিম তা দেখাননি। যা লেখা হয়নি তার খোঁজ করা বৃথা, লেখার ইঙ্গিতগুলিই মাত্র পাঠযোগ্য। কুন্দের প্রেমের হঠাৎ আত্মপ্রকাশ কমলের কথার প্রতিক্রিয়ায় কমলের কাছে, নিজের কাছেও। সে প্রেম দুঃখভোগে। দূর থেকে নগেন্দ্রকে দেখায়ই তার সুখ। নগেন্দ্রের প্রিয়বাক্যে-লঘুস্পর্শে তার প্রেমের বিকাশ। সূর্যমুখী মিথ্যা অপবাদে তাড়িয়ে

দেওয়ায়, প্রতিহত হয়ে হৃদয়াবেগের বৃদ্ধি। নগেন্দ্রের সঙ্গে বিয়ে একান্ত অপ্রত্যাশিত চরম প্রাপ্তি। কুন্দের কাছে তা স্বপ্নের মতো। তার দুর্ভাগ্য-তাড়িত জীবনে এ ছিল কল্পনারও অতীত। যখন সে কল্পনা সত্য হয়ে উঠল তখনই তা বুদ্বুদের মতো ফেটে গেল। নগেন্দ্রকে সে স্বামীরূপে পেল এবং তার ভালোবাসা হারাল।

কুন্দের আত্মহত্যাও ধীর, অনাটকীয়। ঠিক তার প্রেমের মতোই শান্ত। এ রকম নাট্যসম্ভবনাপূর্ণ প্রসঙ্গকে বঙ্কিমের মতো লেখক এত সমতলে ধরে রাখলেন বিশেষ উদ্দেশ্যেই। প্রেমে-মৃত্যুতে-দুঃখভোগে আবেগ-তীব্রতা একবারই মাত্র প্রকাশ পেল, 'আমি অল্প দিন তোমাকে পাইয়াছি–তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম–তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না। ...আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না–...আমার সাধ মিটিল না–'

যে অমর তৃষ্ণার শক্তি সে জীবনে অংশতই মাত্র জেনেছিল।

কুন্দ পাঠকের আরও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ভাবনা জাগায়–

১. প্রণয়পাত্রী কুন্দকে লেখক উদ্যানে বৃক্ষলতাকুঞ্জে, সরোবর-তীরে অর্থাৎ সম্ভবমতো প্রকৃতিনৈকট্যে রেখেছেন, ঘরের ভেতরে নয়। মানব-সংসারের কুটিলতা থেকে কিছু আলাদা করে, রাত্রির বা উষাকালের পুষ্পপল্লবের কিছু আড়ালে তাকে আশ্রয় দিতে চেয়েছেন।

২. আত্মীয়হীন কুন্দ ঘটনাচক্রে দত্ত পরিবারে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। অপরিচয় থেকে এসে অজানা মৃত্যুতে চলে গিয়েছে। তার প্রবেশ-প্রস্থান কোনোটি সহজ বা স্বাভাবিক নিয়মে ঘটেনি। নিজে নিষ্পাপ শান্ত সরল হয়েও দু-দুটি পুরুষের চিত্তে প্রেম ও কামনাকে উদ্দাম করে তুলেছে। যে পুরুষকে সে ভালোবেসেছে তার জীবন-সংসার বিপর্যস্ত করে বিদায় নিয়েছে। যে জাতের রমণী কাম জাগায় কুন্দ আদৌ তা নয়, কিন্তু তার প্রশান্ত গম্ভীর কিশোরী মূর্তিও (দেবকন্যা সদৃশ) সর্বনাশা হয়ে উঠতে পারে। দেবেন্দ্রের পতনের দায় তার নয়, কিন্তু নগেন্দ্রের গৃহদাহের সেই কারণ। কুন্দে মানব-নিয়তির অন্য রূপ।

ঐশ্বর্যে-স্বামীপ্রেমে-গৃহকর্তৃত্বের প্রাপ্তি ও সুখ সূর্যমুখীর। নিশ্চয়ই খুব অল্প বয়সে তার বিয়ে হয়। এ তথ্য অকারণ নয়–'নগেন্দ্রের পিতা মিস্ টেম্পল নাম্নী একজন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত করিয়া কমলমণিকে এবং সূর্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন।' নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর মধ্যে কোনো দূরত্ব নেই, অপরিচয়ের রহস্য নেই। আবাল্য তারা স্বামী-স্ত্রীরূপেই বড় হয়েছে। একে অপরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য হয়ে পড়েছে, প্রতিদিনের অভ্যাসে ওতপ্রোত। দুজনেই কিছু গম্ভীর, অন্তর্মুখী। সন্তানের কলরব নেই। গাঢ় প্রশান্তি। কিন্তু এর মধ্যে তাকালে আরও দু-একটি খবর মিলতে পারে। সূর্যমুখীর পূর্ণ আত্মপ্রত্যয়, স্বামীর উপরে নিশ্চিত অধিকারবোধ (একটি সামান্য নিদর্শন উপন্যাসের আরম্ভেই – 'ভার্যা সূর্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, দেখিও নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না।') এক ধরনের আভ্যন্তর উচ্চমন্যতার সৃষ্টি করেছিল তা কিন্তু স্থূল দর্প নয়। 'কুন্দের কথা প্রথম নগেন্দ্রের চিঠিতে শুনল সূর্যমুখী। তার উত্তরে লিখল, একটি বালিকা

কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিষের কাঁচারই আদর। নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কেবল কাঁচামিঠে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?'

পরের লাইনে এই মন্তব্যকে সে নিজেই 'তামাসা' বলেছে। চিঠির শেষ বাক্য অবশ্য তামাশা–'আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইয়া বসি।' সূর্যমুখী কিন্তু কুন্দের ভবিষ্যৎ এর মধ্যে ঠিক করে ফেলেছে–তারাচরণের সঙ্গে বিয়ে দিতে মনস্থ করেছে। পত্রপাঠ এরূপ নিষ্পত্তি করার পেছনে মনের গোপন কাঁটার ধার দেখা যাচ্ছে। এমন হওয়া সম্ভব সূর্যমুখী স্পষ্টত স্বামীকে সন্দেহ করেনি, সন্দেহ করার মতো কিছু ঘটেওনি। সে অনাথা বালিকার গতি করেছে, তারাচরণের একটা বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু সঙ্গে তার মনের লুকনো অংশ ধরাও পড়ে গেছে–অন্তত পাঠকের কাছে। সূর্যমুখীর মন তার স্বামীর অধিকারে কোথাও কোনো আশঙ্কার ক্ষীণ ছিদ্র রাখতে চায় না। স্বামীকে সে কিছু অবিশ্বাস করে কিনা সে প্রশ্ন আসে না-অবিশ্বাস জন্মাতে পারে এমন ফাঁক সে নিজের বুদ্ধিতে ও কার্যে ভরাট করে দেবে।

তারাচরণ অকালে মারা যাওয়ায় কুন্দ অবশ্য সূর্যমুখীর পরিবারে আশ্রয় পেয়েছে। সূর্যমুখীর তার প্রতি করুণা বা প্রীতি ছিল, এমন প্রমাণ মেলে না বরং কুন্দ তাকে ভয় করত। নিশ্চয়ই তার কোনো নীরব কারণ ছিল। আসলে কুন্দ বিষয়ে নগেন্দ্রের প্রাথমিক সহৃদয় আচরণের জন্য এবং মনের গভীরে কোনো অজানা আশঙ্কায় সে কুন্দনন্দিনীকে কখনও ক্ষমা করতে পারেনি।

প্রেমে, সন্দেহে ও অধিকার রক্ষায় তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নগেন্দ্রের মনের সূক্ষ্মতম বদলের মাপ রাখছিল। তার জীবনে এ শুধু নতুন অভিজ্ঞতাই নয়, এই সমস্যার সামনে সে বেপথু হয়ে পড়ল, না হলে কমলের সাহায্য চেয়ে পাঠাত না। আত্মপ্রত্যয় ও নিশ্চিত গর্ব থেকে তার স্খলন হলো। ঘটনায় এর প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো গোয়েন্দা লাগিয়ে অপবাদ দিয়ে কুন্দকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া। অপবাদটা মিথ্যা কিনা সূর্যমুখীর মতো বুদ্ধিমতী রমণীর পক্ষে অন্য অবস্থায় তা ভাবা বা বোঝা অসম্ভব হতো না। কিন্তু এখন তার মানস স্থৈর্য বিচলিত, কুন্দকে সে তাড়াতেই চাইছিল মনে মনে, সুযোগ মিলে গেল।

কুন্দ চলে যাবার ফল যখন বিপরীত হলো, নগেন্দ্রের মনের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ যখন চূড়ান্ত হলো, ব্যথার সব উচ্ছ্বাস সংযত রেখে সে আপন মহিমায় স্থির থাকতে চাইল–যা অনিবার্য নিজে সক্রিয় হয়ে তাই-ই করল, কুন্দর সঙ্গে নগেন্দ্রের বিয়ের ব্যবস্থা করল। নগেন্দ্রের প্রেম হারিয়েছে সে – তার সমস্যার সমাধান নেই, কমল বা অন্য কেউ তার মীমাংসা করতে পারবে না; তার চূড়ান্ত অমীমাংসা সে নিজের হাতেই করে দিল, স্বামীর সুখে সে স্বেচ্ছায় সব ত্যাগ করল – এই আত্মদানের অহঙ্কারটুকু রইল।

সূর্যমুখী গর্বিতা নারী বলেই, তার সর্বব্যাপী অধিকার (ঐশ্বর্যে কর্তৃত্ব পরোক্ষ, মূলত স্বামীর প্রেমে) চ্যুত বা খণ্ডিত যে সংসারে তা ছেড়ে চলে গেল। অন্য অনুভূতি সহজবোধ্য ও সরল – মনের বাইরের স্তরে তা ঢেউ তুলেছিল – তার আর উল্লেখ করা হলো না।

কিন্তু সে ফিরে এল কেন? কারণগুলি সহজে অনুমেয়। নগেন্দ্রকে ছেড়ে তার পক্ষে থাকা সম্ভব নয় বলে। কোনো ভদ্র রমণীর পক্ষে কোনো অবস্থাতেই রাস্তায় অপরিচিত লোকের সঙ্গে দিন কাটানো সম্ভব নয় – যদিও এই একান্ত বাস্তব ও গদ্যময় কারণটি সেকালের কোনো লেখকের পক্ষে মেনে নেওয়া সহজসাধ্য ছিল না। বঙ্কিমও সে-বিষয়ে কিছু ভাবান না। নেহাত মনস্তাত্ত্বিক কারণটির প্রতিই সবটা ইঙ্গিত। কিন্তু এই ফিরে আসার মধ্যে এক ধরনের দীনতা আছে। প্রেমের দীনতাও, গর্বের সঙ্কোচন, বাস্তবকে মেনে নেওয়া – কুন্দনন্দিনী তার সপত্নী, একথা মেনে নেওয়ায় লজ্জা, পরাজয়। পলায়িতা কুন্দকে সে ' বোন' বলে ডেকে নিয়েছিল–তার সেই প্রথম স্নেহসম্ভাষণের পেছনে হৃদয়ের বিদ্রোহ ছিল। এবার স্বামীগৃহে ফিরে এসে সম্মানে গৌরবে আবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে কমলকে বলল, ' তোমায় আমায় একবার কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোনো দোষ করে নাই বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।'

সূর্যমুখী ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে, অবস্থান্তরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে, নিজের স্বভাববৃত্তিকে সংযমিত করেছে, একক অধিকারের সঙ্কোচন স্বীকার করে নিয়েছে। এর মধ্যে স্বভাবগত যে কারুণ্য ছিল লেখক তার প্রতি শুধু ইঙ্গিতই করেছেন।

কুন্দের মৃত্যু হল। সূর্যমুখী আবার সম্পূর্ণ আগের অবস্থায়, আগের অসপত্ন ভূমিকায় ফিরে এল। তার অধিকারে ভাগ বসাবার কেউ আর রইল না। কিন্তু আগের মন ফিরে পেল কি? তার পূর্ণ সুখ ও প্রাপ্তিতে কুন্দ যে ফাটল ধরিয়ে চলে গেল তা আর জোড়া লাগবার নয়। নগেন্দ্রের ভালোবাসার যে খণ্ডিত বিপর্যস্ত রূপ কুন্দ খুলে ধরে চলে গেল, সূর্যমুখীর কাছে আবার তা নিটোল অখণ্ড হয়ে উঠল না, উঠতে পারে না। এর পরে নিত্য জীবনযাপন–ঐশ্বর্য, গৃহ – সেই পুরাতন দম্পতি, কিন্তু সেই পুরোনো সম্পর্ক শুধুই স্মৃতি–এখন শূন্যতা।

নগেন্দ্র উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তার মন এবং কাজ সমস্যার জন্য দায়ী, সে-ই সবচেয়ে তীব্র যন্ত্রণা পেয়েছে। বেশি এই কারণে যে সূর্যমুখী বা কুন্দের জীবনে বা ভাগ্যে যা কিছু ঘটেছে, যত দুঃখ তারা পেয়েছে তার জন্য নগেন্দ্র নিজেকে অপরাধী মনে করেছে। অন্তর্দ্বন্দ্বে তার হৃদয় বিক্ষত হয়েছে, তার মনুষ্যত্ব ও ব্যক্তিত্বের অবক্ষয় ঘটেছে।

নগেন্দ্র প্রথম যৌবন অতিক্রম করেছে। নিটোল পূর্ণতায় মসৃণ জীবন। সহৃদয় জমিদার, প্রেমিক স্বামী, দয়ালু পুরুষ। পত্নীপ্রসঙ্গে দু-একটি রোমান্টিক মুহূর্তের কথা পরে চিত্রদর্শনসূত্রে উল্লিখিত হলেও তার স্বভাবে লঘু কৌতুকের মধ্যেই এমন গাম্ভীর্যের বীজ ছিল। পত্নীর সঙ্গে বাল্য বয়স থেকেই অচ্ছেদ্য নিবিড়তায় সে বেড়ে উঠেছে – এমন ইঙ্গিত কাহিনীতেই আছে। তার দিক থেকে সূর্যমুখীর মধ্যে আবিষ্কারের কিছু নেই, না পাওয়া কিছু নেই, কোথাও নেই অতৃপ্তি। সম্ভবত এই মানস পরিস্থিতির ব্যাখ্যায়ই বঙ্কিম বলেছিলেন নগেন্দ্রের দুঃখের শিক্ষা হয়নি।

নগেন্দ্রের মতো ধীর অবিচল গম্ভীর ভদ্রলোকের পক্ষে কুন্দনন্দিনীতে আগ্রহ এবং তার প্রেমে পরিণতি অন্তত সাড়ে চার পাঁচ বৎসর ধরে ধীরে ধীরে একটু একটু করে ঘটেছে। দ্রষ্টব্য কমলকে সূর্যমুখীর প্রথম চিঠি। ঔপন্যাসিক কখনও তার আত্মবিশ্লেষণে (বেশির ভাগ চিঠির মধ্যে প্রকাশিত), এবং তার কথায় ও আচরণে এই [illegible]

দিয়েছেন। মনের এই বিকাশ ক্বচিৎ নাটকীয় তীব্রতায় প্রকাশিত হলেও সেই মুহূর্তগুলি নগেন্দ্রের মনস্তাত্ত্বিক চিত্ত-বিশ্লেষণের ফল হিসেবে দেখানো হয়েছে। প্রধানত নগেন্দ্রের চরিত্রাঙ্কনের দিকে তাকিয়ে এই রচনাকে বিশ্লেষণধর্মী মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রূপে গ্রহণ করতে হয়। সূর্যমুখী-কুন্দের চরিত্র-নির্মাণও এই পরিচয়ে সাহায্য করে। এখানেই বাংলা উপন্যাসে নতুন এক প্রজাতির জন্ম হল।

কুন্দের প্রতি নগেন্দ্রের মনোভাবে সাধারণ দয়ার্দ্রতায় মোহের রঙ প্রথম থেকেই লেগেছে। হরদেব ঘোষালের কাছে লেখা চিঠিতে তার সূক্ষ্ম ও আবৃত পরিচয় মিলল। দীর্ঘ একটি অনুচ্ছেদ জুড়ে কুন্দের রূপ-বর্ণনা–নগেন্দ্রের মনে তার যে রূপ প্রতিফলিত। আসলে তা ততটা শুদ্ধ সৌন্দর্যের স্তুতি নয়, যতটা রোমান্টিক হৃদয়-ব্যাকুলতা। কুন্দকে তার অপার্থিব বলে মনে হয়েছে, 'বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্তমাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে।'

এরপর চার পাঁচ বৎসর কেটে গিয়েছে। নগেন্দ্রের মনের কোনো খবর নেই। এই উপন্যাস কুন্দের বিয়ে থেকে বৈধব্য একপায়ে ডিঙিয়ে গেছে। কুন্দ এখন নগেন্দ্রের বাড়িতে আশ্রিতা। সূর্যমুখীর একটি ব্যাকুল চিঠিতে নগেন্দ্রের মন প্রকাশ পেল। কোনো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনায় নয়। প্রতি দিনের ছোট কথায়, দৃষ্টিপাতে, কখনও নীরবতায় নগেন্দ্রের হৃদয়ে কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকর্ষণের একটি স্তর গড়ে উঠেছিল, তা সূর্যমুখীর তীক্ষ্ণ সতর্ক চোখে ধরা পড়ল। সূর্যমুখীর চিঠিটি হয়ে উঠেছে স্বামীর মনের অতি সূক্ষ্ম একটি বিশ্লেষণ। অন্তত এক্ষেত্রে লেখক নিজের কাজের দায়িত্ব এই নায়িকার উপরে দিয়েছেন, সূর্যমুখী দুর্ভাবনা তাতে সত্যের চেয়ে বেশি রঙ লাগায়নি।

সূর্যমুখী ঐ চিঠিতে নগেন্দ্রের বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সমর্থনের কথাও বলেছে,–বিষয়টা আদৌ মতামত ঘটিত নয়, নগেন্দ্রের ব্যক্তিগত গোপন অভিপ্রায়ের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচ্য।

এর পরে একটি অধ্যায়ে (দ্বাদশ পরিচ্ছেদে) তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতার ছবি আছে। তাঁর অকারণ ক্রোধ ও বিরক্তিতে, সম্পত্তিরক্ষায় অনাগ্রহে, হঠাৎ মদ্যপান আরম্ভ করায়, ওষুধ ছুঁড়ে ফেলায়, ভৃত্যকে প্রহার করায়। এর কোনো ঘটনাই রঙ-চড়ানো নয়। কিন্তু নগেন্দ্রের মনের মধ্যে যে প্রবল ঝড় বইতে আরম্ভ করেছে তার পরিচয়বাহী। কুন্দনন্দিনীর প্রতি আসক্ত হৃদয়কে সে সংযত করার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হচ্ছে। একে সে পাপ বলে মনে করেছে, বিবেকদংশনে বিক্ষত হচ্ছে, কিন্তু চিত্তকে নিবৃত্ত করতে পারছে না। সূর্যমুখীকে সে বলেছে, 'আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও। নচেৎ আবশ্যক করে না।' আর হরদেব ঘোষালকে লিখেছে, 'আমার উপর রাগ করিও না – আমি অধঃপাতে যাইতেছি।'

বঙ্কিমচন্দ্র কুন্দের সঙ্গে তার একবারমাত্র স্বল্পস্থায়ী সাক্ষাৎ ঘটিয়েছেন ষোড়শ পরিচ্ছেদে। তার তীব্র যন্ত্রণাদীর্ণ হৃদয়ের ক্ষতমুখ প্রকাশ করেছে – এই-ই তার প্রণয়ালাপ, 'আমি বহু কষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি

কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছি।'

বিধবাবিবাহ মতে সে কুন্দকে বিয়ে করবে। প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসিয়ে সে বাঁচবে প্রতিক্ষণ আত্ম-সংঘাতের অপঘাত থেকে।

কিন্তু এ শুধু মনের অগ্ন্যুৎপাত। এই বিয়ে কার্যকর করার কোনো বাস্তব পরিকল্পনা নগেন্দ্রের ছিল না। এমন সময়ে সূর্যমুখী কুন্দকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়। নগেন্দ্রের বাধাগ্রস্ত প্রণয় অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। দূরগত অপ্রাপণীয়া কুন্দনন্দিনী তখন তার কাছে একমাত্র কাম্য সত্য। ব্যাধিগ্রস্ত মন কবে তার নিজের পুরো খবর রাখে? সাময়িক আবেগই পরম বলে মনে হয়। সে সূর্যমুখীকে যখন বলল, 'তোমাতে আমার আর সুখ নাই।' তখন সে জানেনি যে মনের অর্ধসত্যই মাত্র ব্যক্ত করল। আসলে প্রাপ্তিতে তার সুখ নেই, নেই সুস্থিত জীবনে।

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে নগেন্দ্রের বিয়ে এবং সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ একই সঙ্গে ঘটল। অপার্থিব কুন্দকে সে নিজের করে পেল। কিন্তু তৃপ্তি পেল না। ভেবেছিল চরম সুখ ওখানে। এখন তার হৃদয় পলায়িতা অনায়ত্ত সূর্যমুখীর পেছনে ধাবিত হলো। সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ তার চরিত্রের দিক থেকে স্বাভাবিক, কিন্তু একটু নাটকীয় ভাবে বিন্যস্ত–এবং নগেন্দ্রের স্বপ্নভঙ্গ অতিদ্রুত ও অতিতীব্র ভাবে ঘটল। সঙ্গে প্রবল অপরাধবোধ ও অনুশোচনা। কুন্দের সঙ্গে মিলনের মুহূর্তেই তাকে বুঝতে হলো, 'কুন্দে আমার সুখ নাই।'

হৃদয়ে সম্পূর্ণ অবক্ষয়িত নগেন্দ্রে ট্র্যাজেডি আছে। গাঢ় দীর্ণ ব্যক্তিত্বের ট্র্যাজেডি। এর পরে সূর্যমুখীর সঙ্গে পুনর্মিলন স্মৃতির মন্দিরে স্বপ্ন-মিলনের মতো।

কাহিনীর দিকে থেকে কুন্দের মৃত্যুতে নগেন্দ্রে-সূর্যমুখীর পুনর্মিলন। কিন্তু কুন্দের মৃত্যুর জন্য নগেন্দ্র কি তার নিজের অপ্রেম অবহেলাকে দায়ী করেনি? অপার্থিব কুন্দের প্রতি তার রোমান্টিক প্রেমের সংসার-অতিক্রমী বাসার যন্ত্রণাবিদ্ধ আনন্দের দিনগুলি রইল চিরস্থায়ী হয়ে। নিচের বিবরণটুকুর উদ্দেশ্য স্পষ্ট, 'নগেন্দ্র তখন, সেই মৃত্যুচ্ছায়ান্ধকারম্লান মুখমণ্ডলের স্নেহ প্রফুল্লতা দেখিতে ছিলেন। তাহার সেই আধিক্লিষ্ট মুখে মন্দাবিদ্যুন্নিন্দিত যে হাসি তখন দেখিতেছিলেন, নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স অবধি তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল।'

অন্যদিকে পুনর্প্রাপ্তা সূর্যমুখী বিষয়ে তার অপরাধবোধ, তার প্রণয়ে বিশ্বাসহন্তা হবার সঙ্কোচ তাদের সম্পর্কের পূর্বস্তরটি আর ফিরিয়ে আনতে দেয়নি। যে প্রেম ও সুখের সহজ স্বর্গ থেকে নগেন্দ্র সূর্যমুখী ভ্রষ্ট হয়েছে তা ফিরে পাবার নয়। তারা আবার সংসারে নিয়মমতো জীবনাবর্তন করতে লাগল, কিন্তু এ তো নষ্টনীড়।

৭ চন্দ্রশেখর :
ইতিহাসের পাত্রে সমাজ-সমস্যা

এক

জাতি হিসেবে দেখলে চন্দ্রশেখরকে অবশ্য ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স বলে পরিচয় দিতে হবে। কিন্তু এই বইটির মূল কাহিনী চন্দ্রশেখর-শৈবলিনী-প্রতাপকে নিয়ে। বিস্তারে ও গভীরতায় তার নিঃসংশয় প্রাধান্য। লেখক নানাভাবে এই গল্পের পাত্রপাত্রীদের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করলেও বিষয় একান্ত সামাজিক, সমস্যাও সামাজিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দিকে স্থাপিত গ্রামীণ এই জীবনযাত্রার সঙ্গে রচনাকালের পার্থক্য মাত্র একশ বছরের। এই একশ বছরে অন্য যত পরিবর্তন ঘটুক পল্লীসমাজের রূপান্তর বিশেষ হয়নি। গল্পটি সমকালের হলে প্রতাপ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার এবং চন্দ্রশেখর নবাবের কোষ্ঠি গণনার সুযোগ পেত না, শৈবলিনীকে কুঠিয়াল ফস্টর হরণ করতে পারত না। ঘটনার এই সব জালে জড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক বিষয়টিকে পুরাতন ইতিহাসের অংশ করেছেন। ফলে কিছু বাড়তি ঔজ্জ্বল্য ও যুগান্তরের গতিবেগ এতে লেগেছে। কিন্তু এর মূল সামাজিক প্রকৃতি অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীতে উপলব্ধ সামাজিক-মানবিক সমস্যা ঢেকে যায়নি। আগে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা-নবকুমারদের জীবনে ইতিহাসের যে মাত্রা যোগ করেছিলেন তা রচনার ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। এই রচনায় ইতিহাসের সংযোগ সে গভীরতা পায়নি। আসলে ঐতিহাসিক কালাশ্রয়ের কিছু পৃথক উদ্দেশ্য এখানে ছিল।

কিছুদিন আগে তিনি বিবাহিত পুরুষ নগেন্দ্রের অন্য রমণীতে আসক্তির কথা বলেছিলেন। দুই নারীর মধ্যে এক পুরুষের চিত্ত-আন্দোলন একটি ব্যক্তিক-সামাজিক জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছিল। কিছুকাল পরে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বভাবের এক বিবাহিত পুরুষ গোবিন্দলালকে কেন্দ্র করে সমজাতীয়-সামাজিক-চারিদিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছিলেন। চন্দ্রশেখর এক বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষে হৃদয়-স্থাপনের গল্প। নগেন্দ্র-গোবিন্দলাল ঊনবিংশ শতকেরই মানুষ। শৈবলিনী অষ্টাদশ শতকের এবং বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এভাবে রোমান্সের বাতাবরণ তৈরি হওয়ায় শৈবলিনীর অনেক আচরণ বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। সেই কর্মবহুল ইতিহাসের বর্ণাঢ্য পরিবেশে নারীর পক্ষে যা করা সম্ভব বা সম্ভব বলে মনে হয়, উনিশের শতকে—পরিচিত প্রত্যক্ষ সমাজে তা প্রায় ভাবনার অতীত। অথচ প্রেমের যে স্বাধীনমূর্তি, বিদ্রোহী সত্তা শৈবলিনীতে সত্য তা ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্য ইংরেজী শিক্ষিত মানুষের চেতনার বস্তু। ঐ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীর ভাবের সত্য সমাজ-জীবনের সত্যের সঙ্গে খাপ খায়নি। সেজন্যই শৈবলিনীকে ঐতিহাসিক করে তোলার আয়োজন। লেখকের ইচ্ছা পুরুষের দিক থেকে যে ভাবনা দুটি উপন্যাসে স্বতন্ত্র চরিত্র রহস্যে খোঁজা হলো, নারীর দিক

থেকে অন্তত একটি বইয়ে তা স্থান পাক। না হলে জীবন-শিল্পী হিসেবে একটা বিরাট অপূর্ণতা তাঁর থেকে যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর নায়ক সীতারাম বা ব্রজেশ্বর বহুবিবাহিত কিন্তু এ বিষয়ে তাদের চিত্তের সঙ্কট নেই। সমাজে এবং ব্যক্তি স্বভাবে পুরুষের পক্ষে একনিষ্ঠ প্রেম অজানা প্রসঙ্গ। নগেন্দ্র-গোবিন্দলালের পক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর নায়ক হওয়া অপরিহার্য। তাদের বোধ একেবারে সমকালের, না হলে তাদের মনের শরশয্যা অবান্তর হত। তাদের চরিত্রস্খলনকে সামাজিক দিক থেকে কিন্তু ধিক্কৃত করা হয়নি, আমাদের দেশে সেই তিরস্কারের তখনও জন্ম হয়নি। শৈবলিনীর মতো নারীর অবৈধ প্রণয় সমাজে আঠারো বা উনিশের শতকে সমানভাবে নিন্দিত—এবং পরকীয়া প্রেমের জন্য স্বয়ং নায়িকার মনের পাপবোধও বহুপুরাতন সংস্কারজাত। শৈবলিনীকে একশ বছর আগে রাখায় তাই এদিক থেকেও কোনো অসুবিধা ছিল না।

বিবাহিতা নারীর অন্য পুরুষকে ভালোবাসার পাপ ও অনুশোচনা এবং তাকে ভেদ করেও প্রেমের অমোঘ শক্তি শৈবলিনীর কাহিনীর বিষয়। এই বিষয়ে বঙ্কিম কতটা রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী তার বিচার করা দরকার; সিদ্ধান্ত যাই হোক লেখক যে তথাকথিত পাপিষ্ঠা এই নারীর মধ্যে মানব-চিত্ত-রহস্য খুঁজেছেন, তাকে সরাসরি পতিতাবৃত্তির রাজপথটি দেখিয়ে দেননি, এটাই 'রেনেসাঁ-মানবতা'র এবং বঙ্কিমের জীবন-মনস্কতার বড় প্রমাণ।

দুই

এই উপন্যাসে ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষত কাল্পনিক সূত্রে বদ্ধ যে অংশটি আছে সে-বিষয়ে সংক্ষেপে বলা যায়—

১. স্বয়ং মীরকাশিমের মতো ইতিহাসে-বিশ্রুত চরিত্রকে নায়ক করা হয়েছে। আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ চরিত্র এর মধ্যে স্থান পেয়েছে। নবাবের সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল যথাযথ। অল্প দূরের ঘটনা বলে তথ্যগত সত্যতা মূলত অবিচল। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কার্যকারণ ধারাকে বিকৃত না করেও মানবিক হৃদয়বৃত্তির সংযোগে তাকে প্রাণবন্ত করে তোলা হয়েছে, উপন্যাসে রূপান্তরিত করা হয়েছে। নবাবের সঙ্গে কোম্পানির বিবাদের মূলে যে ঐতিহাসিক কারণ তা সঠিক ও সুস্থির রয়েছে, কিন্তু দলনীর কাল্পনিক সূত্রটি থাকায় তাতে হৃদয়ের তাপ লেগেছে।

২. দলনী-মীরকাশিমের ইতিহাসমুখ্য রোমান্স এই উপন্যাসের উপকাহিনী। শৈবলিনী-কেন্দ্রিক প্রধান অংশের সঙ্গে তার যোগ বেশ শিথিল। তবে উপন্যাসে এ জাতীয় লঘুবন্ধনই মানেই নিন্দনীয় নয়। ঘটনার পাকে এদের যেমন জড়িয়েছেন লেখক, সাদৃশ্যে-বৈপরীত্যে, তেমনি নানা তির্যক শৈল্পিক প্রক্রিয়া ঘটিয়েছেন। একটা

সমগ্রতার বোধে ফাঁক দেখা যায় না, মৃণালিনীর দুই অংশের মতো এ সম্বন্ধকে নেহাৎ নৈমিত্তিক মনে হয় না।

৩. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদের এই উপকাহিনীও শুধুই একটি পুরোনো 'টেল' নয়। নবযুগের কিছু আভ্যন্তর ভাব এ রচনায় ওতপ্রোত। নবাবী আমলের স্বাদ যদিও বর্ণনায়-ঘটনায় ফিকে হতে দেননি, কিন্তু রেনেসাঁর প্রেম এবং জাতীয়তাবাদকে লেখক মিশিয়ে দিয়েছেন। দুই তার একসঙ্গে বেজেছে।

প্রমথ চৌধুরী একটি সনেটে মমতাজকে সম্বোধন করে বলেছিলেন–

জরিতে জড়িত বেণী অধরে তাম্বুল,
বাদশার ছিলে তুমি খেলার পুতুল।

ব্যঙ্গের খোঁচা থাকলেও এর মধ্যে সত্যের ইঙ্গিত আছে। নবাব-বাদশাহের হারেমে শতাব্দীতে বেগমের লালসার রক্ষিতার অভাব ছিল না, অভাব ছিল সেই বস্তুটির ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা যার নাম দিয়েছিলেন প্রেম। মীরকাশিমের ব্যক্তিগত জীবনের এবং মীরকাশিম-দলনী সম্পর্কের যে ছবি এই লেখায় তাতে ঐ প্রেমের প্রকাশ। আধুনিক পাঠকের কাছে এর দাম বেশি নয়। কারণ তথাকথিত ঐতিহাসিক নাটক-উপন্যাসে উত্তরকালের জীবনাদর্শ অনুযায়ী প্রেমের রূপ-অঙ্কন এ দেশের সাহিত্যের প্রথা হয়ে গিয়েছে অনেককাল। বঙ্কিমচন্দ্রকে কিন্তু এটা উদ্ভাবন করতে হয়েছিল।

এই ঐতিহাসিক অংশে প্রেমের চেয়েও আধুনিক মনন জয়যুক্ত হয়েছে জাতীয়তাবাদের প্রকাশে। এ বিষয়ে বঙ্কিম তাঁর অনুগামী লেখকদের তুলনায় কত বেশি তীক্ষ্ণধী, একটু ব্যাখ্যা করলে তা বোঝা যাবে।

বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী উপন্যাসে যবনবিতাড়ন ও দেশোদ্ধারের বাসনায় যে জাতীয়তাবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন তা থেকে এই বইয়ে অনেক স্পষ্ট ইতিহাস-চেতনা লক্ষ্য করা গিয়েছে। মাধবাচার্যের অলীক স্বপ্নদর্শন এবং হেমচন্দ্রের নিরুৎসাহে প্রসঙ্গটি অনেকটা ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হইয়াছিল। এ বইয়ে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের যে বিবাদ তার ঐতিহাসিক ভিত্তি সুদৃঢ় এবং কাল কাছাকাছি বলে তাতে সত্যের উত্তাপ আছে। আঠেরো শতকের নবাবেরা যখন রাজনৈতিক শত্রুর সঙ্গে লড়েন, সে শত্রু দেশী বা বিদেশী যে-ই হোক না, তাঁরা জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেন না। নিজের অধিকার রক্ষা বা বিস্তার করতে চান, অর্থনৈতিক স্বার্থের কথা ভাবেন। ১৯০৫/৬ সাল থেকে বাংলা নাটকে বিশেষ ভাবে বঙ্গদেশের নবাবদের জাতীয় স্বাধীনতার অগ্রনায়ক হিসেবে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধরত দেখানো হয়েছে। সেসব লেখা সাময়িক প্রয়োজন সাধন করেছে, শিক্ষিত জনের ইতিহাস-বোধকে পীড়িতও করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কোনো জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখে এ সব কাহিনী লেখেননি। কিন্তু স্বদেশাভিমান এবং জাতিবৈর যখন বাংলার জীবনে নানাভাবে স্ফুরিত হচ্ছিল তাকে লেখক অবহেলা করেননি, বরং তাঁর রচনা ঐ ভাব জাগিয়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা

নিয়েছিল। কিন্তু মীরকাশিমকে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা করে তোলেননি। তাঁর কোম্পানির সঙ্গে অধিকার ভাগ করে নেবার ব্যাপারে বিবাদ। তা-ই শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াল। উপন্যাসের গোড়াতেই নবাব দলনীকে বলেন, 'ইংরেজরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাঁহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, 'রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর।' কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পারিলাম, তবে যে রাজ্যে ত্যাগ করিব–অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব?'

মীরকাশিমকে যদি প্রজাপালক বলে ধরে নেওয়াও যায় তাহলেও জাতীয়তাবাদী রূপে চিহ্নিত করা চলে না। ইংরেজ-বিবাদের পেছনের বড় রাজনৈতিক কারণ কোম্পানির প্রভাব থেকে মুক্ত ও সম্পূর্ণ স্বাধীন হবার জন্য নবাবের অভিপ্রায়। আর যুদ্ধ বেঁধে উঠবার তাৎক্ষণিক কারণ একান্ত ব্যক্তিগত, দলনী বেগম।

প্রতাপকেও ইংরেজ-বিরোধী বীর রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। সেখানেও বঙ্কিমের যুগচেতনা অভ্রান্ত। প্রতাপ যে যে যুক্তিতে এই যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তা হলো, 'আমি কেন এত করিব? করিব, তাহার অনেক কারণ আছে। প্রথম, ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্বনাশ করিয়াছে; দ্বিতীয়, শৈবলিনী মরিয়াছে; তৃতীয়, আমাকে কয়েদ রাখিয়াছিল; চতুর্থ, এইরূপ অনিষ্ট আর আর লোকেরও করিয়াছে ও করিতে পারে; পঞ্চম, নবাবের এ উপকার করিতে পারিলে দুই একখানা বড় বড় পরগণা পাইতে পারিব।'

ইংরেজের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ ইংরেজ বাঙালায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্স ফস্টরের হাতে পড়িত না।' স্বভাবতই আধুনিক জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে এর অনেক দূরত্ব। এবং নবাবী যুগে এরূপ মনোভাবই কালনুগ, তাই বিশ্বাস্য। অথচ প্রতাপের কাজের ধারা–লাঠিয়াল-ডাকাতদের সংঘবদ্ধ করে অনেকটা গেরিলা রীতিতে লড়াই এবং পরিবেশষে আত্মদান–তাকে স্বদেশ-প্রেমিক বীররূপে সমকালীন পাঠকদের মনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। চক্রান্তকারীরা প্রতাপকে ভয় পেয়েছে। চিত্তসংযমের জন্য সন্ন্যাসী তার অনন্তস্বর্গলাভ প্রার্থনা করেছে–তার ব্যঞ্জনার্থে স্বদেশের জন্য প্রাণত্যাগে অনন্তস্বর্গপ্রাপ্তিও বটে, গ্রন্থপাঠে এই অতিরিক্ত অর্থের অনুরণনও পাঠক চিত্তে বাজতে থাকে।

ইতিহাসকে অস্বীকার না করে তার স্বাদ-গন্ধে সমসময়ের জীবনসত্যের সুর তোলা–অতীত আর বর্তমানের দুটো ঘোড়াকে একমুখী চালানর দুর্লভ কৃতিত্ব বঙ্কিমের। পরের ঔপন্যাসিক-নাট্যকারের দল এই সিদ্ধির কাছেও যাননি, ইতিহাসের পোশাকে বর্তমানের রাজনৈতিক অভিপ্রায়কে জোর গলায় বলেছেন, তাতে শিল্প টেকেনি। ব্যতিক্রম আছে, তবে অল্পই।

চন্দ্রশেখর উপন্যাস নিয়ে নীতি-ঘটিত প্রশ্ন বেশ সোচ্চার। অনেকেই বঙ্কিমের উৎকট রক্ষণশীলতার নিদর্শন পান এই বইয়ে। প্রধানত শৈবলিনীর চরিত্র ও ভাগ্যের সঙ্গে এই সমস্যা জড়িত। সংশ্লিষ্ট অন্য দুই মুখ্য পাত্র প্রতাপ ও চন্দ্রশেখরের কথাও এই প্রসঙ্গ এসে যাবে। কাজেই বিষয়টি চরিত্র-ব্যাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত। গোড়ায় মাত্র বলা চলে যে–

১. শৈবলিনী ফস্টর কর্তৃক অপহৃতা হয়েছে। সেকালে এই শ্রেণীর নারীকে শেষ পর্যন্ত পতিতাবৃত্তিতে নিক্ষেপ করা হতো। বঙ্কিম তা করেননি।

২. নারীর দৈহিক সতীত্বের প্রশ্নকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শৈবলিনী যে ফস্টরের দ্বারা ধর্ষিতা হয়নি তা প্রমাণের জন্য নানারূপ বিশ্বাস্য-অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে।

৩. অন্যের ছোঁয়া খাবার খেয়ে শৈবলিনী জাত গিয়েছে কিনা তা নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা এই বইয়ে আছে।

৪. শৈবলিনী পাপিষ্ঠা বলে লেখক সরাসরি বারবার উল্লেখ করেছেন। শৈবলিনীর প্রায়চিত্ত অতি দীর্ঘ। 'অসতীর পরিণাম' জাতীয় লৌকিক ধারণায় বিবিধ নারকীয় শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে।

৫. প্রায়শ্চিত্ত ও মানস শাস্তিভোগের পরেও শৈবলিনী প্রতাপ থেকে চিত্ত নিবৃত্ত করতে পারেনি।

৬. চন্দ্রশেখর এই শৈবলিনীকে বধূর সম্মানে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়েছে।

মোটামুটি এরকম সিদ্ধান্ত করা চলে, শৈবলিনীর পাপ দেহের নয়, জাতিচ্যুতির নয়। বিবাহিতা নারী অন্য পুরুষে আকৃষ্ট–পাপ এখানে, তার জন্য তার কঠিন শাস্তি–মানসিক এবং মনস্তাত্ত্বিক। এর ফলে আপাতসংযত হলেও শৈবলিনীর প্রেম কিন্তু মূলত নিবৃত্ত হলো না। প্রেমিককে আত্মদান করে সামাজিক সমস্যা এড়াতে হল, এবং স্বামীগৃহে বধূরূপে শৈবলিনীর স্থান বিচলিত হলো না। নীতির দিক থেকে লেখকের যে চিন্তাধারা এই কাহিনী ও চরিত্র-বিকাশের পেছনে সক্রিয় তা মোটেই সরল বা একমুখী নয়, এমন কি সুনিশ্চিতও নয়। বঙ্কিমের শিল্পী-স্বভাব এ বিষয়ে পুরো মনস্থির করতে পারেনি।

দেহের পবিত্রতার চেয়ে মনের শুদ্ধি অবশ্য গুরুতর। অপাপবিদ্ধ দেহ হলেও শৈবলিনী পাপিষ্ঠা কারণ সে অন্যপুরুষে আসক্তা। সে কারণে তাকে নিক্ষেপ করা হলো উন্মাদ রোগে স্বপ্ননরকে। কিন্তু নরকযন্ত্রণা বা মনোরোগের চিকিৎসায় হৃদয়ের অমোঘ শক্তি নিবারিত হল না এই চ্যুতচিত্ত নারীকে চন্দ্রশেখর এবং বঙ্কিম গৃহে স্থান দিলেন, অবশ্যই দগ্ধ গৃহে–সে নীরব দাহ আমরণ। সামাজিক নীতি-বিশ্বাসের প্রবল শক্তি এবং তার কাছে শিল্পীর আত্মসমর্পণ এবং তার প্রতি চাপা পরিহাস এর মধ্যে অবশ্য মিশে আছে। সঙ্গে সঙ্গে আছে সব নৈতিকতা-ডিঙানো মানব-হৃদয়ের স্বীকৃতি অথবা বিধ্বস্ত রমণীর প্রতি নেহাৎ দাক্ষিণ্য?

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে অনেক মানুষ। বর্গীকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী এদের ৮টি বর্গে (১., ২. সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত) এবং ২২টি উপবর্গে (১.১., ১.২. প্রভৃতি সংখ্যায় চিহ্নিত অর্থাৎ প্রথম বর্গের অন্তর্গত প্রথম উপসর্গ বা প্রথম বর্গের দ্বিতীয় উপবর্গ এইরূপ) ভাগ করে দেখানো হয়েছে। এদের মধ্যে ৬টি উপবর্গে আছে মোট ১৫টি অবর উপবর্গ (১.১.১., ১.১.২. এই রূপ চিহ্ন) এবং ২টি অবর উপবর্গ আবার বিভক্ত ২টি করে শাখা-অবর উপবর্গে (১.১.১.১., ১.১.১.২. এরূপ চিহ্ন)। এরূপ সংখ্যা-চিহ্নে শাখা ও শ্রেণী বিভাগ যতদূর প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট করা যায়। সংখ্যাটি দেখেই বিষয়ের সম্পূর্ণ কুলপরিচয় জানা সম্ভব হয়।

এই বইয়ে কোথাও কোথাও বর্গীকরণের এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষ করে যেখানে বহু পাত্রপাত্রীকে নানা শাখা-উপশাখায় ভাগ করে দেখা সম্ভব।

চন্দ্রশেখরের চরিত্রগুলির বর্গীকরণ –

১. সামগ্রিক গুরুত্বের বিচারে

১.১. প্রধান পাত্রপাত্রী

১.১.১. মূলকাহিনীতে : শৈবলিনী, প্রতাপ চন্দ্রশেখর।

১.১.২. উপ-কাহিনীতে : দলনী, মীরকাশিম।

১.২. প্রধান পাত্রপাত্রীর সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত : ফস্টর, গুরগণ, তকি, রমানন্দ স্বামী।

১.৩. গৌণ ভাবে সংশ্লিষ্ট : কুল্‌সম, সুন্দরী, রামচরণ।

১.৪. পটভূমি-আশ্রয়ী : অন্য সব চরিত্র।

২. ইতিহাসাশ্রয়ী অংশ

২.১. নবাবের ব্যক্তিগত জীবন

২.১.১. কেন্দ্র : দলনী, মীরকাশিম।

২.১.২. সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রী

২.১.২.১. সহযোগী : কুল্‌সম, চন্দ্রশেখর।

২.১.২.২. বিরোধী : গুরগণ, তকি।

২.১.৩. গৌণ ভাবে জড়িত : জনসন, গলস্টন, বকাউল্লা, ফস্টর।

২.২. নবাবের রাজনৈতিক জীবন

২.২.১. কেন্দ্র : মীরকাশিম।

২.২.২. অমাত্য প্রভৃতি

২.২.২.১. সহযোগী : ইব্রাহিম, ইরফান, আমীর হোসেন, মসীবউদ্দিন, তকি (পরে বিরোধী), প্রতাপ

২.২.২.২. বিরোধী ও ষড়যন্ত্রী : গুরগণ, স্বরূপ চাঁদ ও মহাতব চাঁদ জগৎশেঠ, তকি (প্রথমদিকে সহযোগী)।

২.২.৩. কোম্পানির সাহেবেরা : অমিয়ট, গলস্টন, জনসন, ফস্টর।
৩. পারিবারিক অংশ
৩.১. কেন্দ্র : শৈবলিনী, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর।
৩. গৌণ সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রী : ফস্টর, সুন্দরী, রামচরণ, রমানন্দস্বামী, মীরকাশিম।

৪. প্রণয়-কেন্দ্রিক চরিত্র
৪.১. দাম্পত্য প্রেম : মীরকাশিম, দলনী, চন্দ্রশেখর।
৪.২. পরকীয়া প্রেম
৪.২.১. নীতিলঙ্ঘী : শৈবলিনী।
৪.২.২. আত্মদমী : প্রতাপ।
৪.২.৩. লালসাপূর্ণ : তকি।
৪.৩. প্রেমের ফল – ট্র্যাজিক : শৈবলিনী, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, মীরকাশিম, দলনী।
৪.৪. প্রেমে বিনষ্টি : ফস্টর, তকি।
৫. চরিত্রের মাত্রা
৫.১. সরল
৫.১.১. সরল ও অগভীর : গুরগণ, ফস্টর, সুন্দরী, কুল্‌সম, সাহেবেরা, অমাত্যরা।
৫.১.২. সরল কিন্তু গভীর : দলনী, মীরকাশিম।
৫.২. জটিল
৫.২.১. জটিল কিঞ্চিৎ, কিন্তু অগভীর : তকি
৫.২.২. জটিল ও গভীর : শৈবলিনী, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর।
৬. স্বভাবের গতি
৬.১. স্থির : দলনী, মীরকাশিম। সব গৌণচরিত্র।
৬.২. গতিশীল : শৈবলিনী, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর।
৭. যুগ্মচরিত্র
৭.১. শৈবলিনী-সুন্দরী, শৈবলিনী-পার্বতী।
৭.২. প্রতাপ-রামচরণ।
৭.৩. চন্দ্রশেখর-রমানন্দ স্বামী।
৭.৪. দলনী-কুলসম।
৮. যৌথচরিত্র
৮.১. নবাবের দল : গুরগণ, তকি প্রভৃতি অমাত্য
৮.২. ***কোম্পানির দল : ফস্টর, অমিয়ট প্রভৃতি।***

চন্দ্রশেখরের ক্ষেত্রে এই বর্গবিভাগ বিশেষ কাজে লাগে নানা ধরনের অনেক নরনারী থাকার জন্য, তাদের শ্রেণীপরিচয় বিভিন্ন দিক থেকে নানা গোষ্ঠীতে ভাগ করা

যায় বলে। এই ফর্দের দিকে চোখ মেলেই বলে যায় কোন্ চরিত্রগুলিকে গুরুত্ব দিতে চাইলে লেখাটির মর্মভেদ করা যাবে, ইতিহাস ও পারিবারিক অংশের মধ্যে যোগ ঘটাচ্ছে কারা। কোম্পানির সাহেবেরা নবাবের রাজনৈতিক জীবনেই শুধু নয় ব্যক্তিগত কাহিনীতেও সামান্যত সংশ্লিষ্ট। দেখা যাবে দলনীর ও শৈবলিনীর প্রণয় সাদৃশ্যে-বৈপরীত্যে কিভাবে বিন্যস্ত। এই বর্গীকরণ গৌণ চরিত্রগুলির পরিচয় প্রায় নিঃশেষে ধরে দিচ্ছে। অন্য পাত্রপাত্রীদেরও প্রাথমিক রূপ ও শ্রেণীভিত্তি এতে জানা যায়। সাধারণভাবে লেখকের চরিত্র রচনাগত কিছু কিছু প্রবণতা ও বিশিষ্টতার নির্দেশও এর মধ্যে পড়া যাবে। যেমন কোনো মুখ্য চরিত্রের পাশে কাউকে বসিয়ে দেওয়া কর্মের সহযোগীরূপে, আরও বেশি করে নিভৃত মনকে বাইরে আনার জন্য।

তবে জটিল চরিত্রগুলির রহস্য বুঝে নেবার জন্য বর্গবিভাগকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

পাঁচ

দলনী মীরকাশিমের স্বভাবে এমন কোনো জট নেই যার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এরা পাঠককে আদ্যন্ত টেনে রাখে, অপাপবিদ্ধ চরিত্রকে লেখক কিছু নতুন মন্ত্রে এতখানি বর্ণাঢ্য করেছেন। দলনী–নিভৃত হারেমবাসিনী বেগম, শুধু ভালোবাসার প্রতি ব্যাকুলতায় তাড়িত হয়ে দুঃসাহসিক পথে পা বাড়িয়েছে এবং ধ্বংস হয়েছে। আর মীরকাশিমও প্রেমের বেদনায় রাজগৌরবকেও তুচ্ছ মনে করেছে। কিন্তু এগুলিও মামুলি ব্যাপার, অন্তহীন কোনো মানবিক প্রশ্নে এরা পাঠককে নিয়ে যায় না। মীরকাশিমের রাজ্য যখন ভেঙে পড়ছে, মুহুর্মুহু কামানের গর্জনে তার উচ্চকণ্ঠ অনুশোচনা একটা বিশালতা পেয়েছে। দলনীর আত্মহত্যাও আকস্মিক ভাবপ্রবণতার ফল নয়, দীর্ঘকাল বিরূপ ঘটনার চাপে– তার প্রতিরোধ-ক্ষমতা যখন ভেঙে পড়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে মনের একমাত্র আশ্রয়কেন্দ্রের আঘাত তার ঐ পরিণতি অপরিহার্য করে তুলেছে। নিপুণ লেখক মামুলি চরিত্রের সরল যদিও গভীর ও ঐকান্তিক দুঃখকে দুর্ভাগ্যতাড়িত করে তাৎপর্যময় করে তুলতে চেয়েছেন। দলনীর জীবনে অনিয়ন্ত্রিত অজ্ঞাত ভাগ্যের অকারণ কোপের কথা বলেছেন ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তার ধ্বংসের বীজ চরিত্রের জটে তেমন নেই অথচ একটা শ্বাসরোধী ব্যাকুলতা পাঠক অনুভব না করে পারে না। ঘটনার পর ঘটনায় আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়েছে দলনী, যতই চেষ্টা হয়েছে গাঁঠ খুলবার ততই তা আরও দুচ্ছেদ্য হয়ে পড়েছে। এবং তাকে আত্মহত্যায় নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও মনে হয়, এর পেছনে অদৃষ্টবাদের যে ভূমিকা তার জিজ্ঞাসা কোনো দুর্জ্ঞেয় জীবনরহস্যে পাঠককে পৌঁছে দেয় না। বিরূপ ঘটনার এই বিন্যাসে মানবভাগ্য, মানবঅস্তিত্ব সম্বন্ধে এমন কোনো নিগূঢ় ভাবনা জাগে না যা কপালকুণ্ডলার সমতুল্য।

চন্দ্রশেখর, প্রতাপ ও শৈবলিনীই বিশেষভাবে বিশ্লেষণের যোগ্য চরিত্র, তাদের মধ্যে বাইরের ও ভেতর মহলের নানা বক্র আসা-যাওয়া আছে।

চন্দ্রশেখরকে যত সরল ও ভালোমানুষ গোছের বর্ণহীন পণ্ডিত বলে মনে করা হয়েছে সে তা মোটেই নয়। সে ভালোমানুষ এবং পণ্ডিত দুই-ই ঠিক, কিন্তু জটিল ও বর্ণবন্ত ব্যক্তিত্ব।

রাজসভায় সম্মানিত উঁচুদরের জ্যোতিষী চন্দ্রশেখর বেশি বয়সে রূপে ভুলে শৈবলিনীকে বিয়ে করল। কিন্তু শৈবলিনীর প্রেম পেল না। এবং সেজন্য নিজেকেই অপরাধী মনে করল। তার আত্মমগ্ন ভাবনা, 'হায়! কেন আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছি। এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পাইত – শাস্ত্রানুশীলনে ব্যস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুটিরে এ রত্ন আনিলাম কেন? আনিয়া আমি সুখী হইয়াছি সন্দেহ নাই। কিন্তু শৈবলিনীর তাহাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাহাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব–অথবা আমার প্রণয়ে তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা নিবারণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষ, আমি ত সর্বদা আমার গ্রন্থ লইয়া বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখ কখন ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলিয়া পাড়িয়া, এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণ – সেই জন্যই ইহাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে আমি কি করিব? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করিব? ছি ছি, তাহা পারিব না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে? এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?'

এই চিন্তা বিশ্লেষণ করা যাক–

১. শৈবলিনী তাকে ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না, বিয়ের আট বৎসর পরে চন্দ্রশেখর সে বিষয়ে নিশ্চিত।

২. এ জন্য সে নিজেকে দায়ী করে। তার বেশি বয়স, প্রেমিক-সুলভ মনোভাব–আবেগ ইত্যাদি অভাব এর কারণ। শৈবলিনীর অন্য আসক্তির খবর সে জানে না।

৩. 'আমি সুখী হইয়াছি' – এ কথা সে বিশ্বাস করে। কিন্তু যে ক্লেশ এই ভাবনায় ধরা পড়েছে তা কি সুখের লক্ষণ? চন্দ্রশেখর নিজের কাছেও স্বীকার করতে চায়নি যে সে ভীষণ অসুখী।

৪. গ্রন্থাদি ফেলে এই 'নবযুবতীয়' মুখপদ্ম জন্মের সারভূত করবার তীব্র বাসনা জাগে, তাকে সংযত করতে হয়। 'ছি ছি তাহা পারিব না।' কেন? স্ত্রৈণ বলে লোকনিন্দা হবে, আত্মগ্লানি জন্মাবে হয়ত তার ভয়ে। এবং নিজের অভ্যস্ত শাস্ত্রচর্চার প্রতি অতিপ্রীতি, যুবতী-প্রণয়ের অজানা পথে অনভ্যস্ত পদচারণায় শঙ্কা। আসলে যে শাস্ত্রচর্চা তার অস্তিত্ব তাকে ত্যাগ করার কথা তো ভাবা যায় না।

৫. 'নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে?' পরে শৈবলিনী কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করেছে – কার পাপের? তার নিজের, আর অনেকটাই কি চন্দ্রশেখরেরও নয়? চন্দ্রশেখরের এই বোধ কি শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত ও পরবর্তী অবস্থায় বর্তমান ছিল না?

অতিগূঢ় অপরাধবোধ অষ্টাদশ শতকের চন্দ্রশেখরকে ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মানুষে পরিণত করেছে। তার কুণ্ঠিত ভালোবাসায় প্রৌঢ় পণ্ডিতের রূপমোহের এবং অসমর্থ পরাভূত প্রেমের আত্মগ্লানি জমেছে। আপাতদৃষ্টিতে যাকে অপাপবিদ্ধ ও নীতিজ্ঞানীর বর্গে ফেলতে হয় তার মধ্যেও এই অসুখ।

শৈবলিনী-হরণের পরে চন্দ্রশেখর 'ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি' আগুনে পুড়িয়ে ফেলল। বস্তুনিষ্ঠ সে-বর্ণনা কিন্তু প্রতীকী–তাৎপর্যে দূরপ্রসারী। 'অগ্নি জ্বলিল। পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, অলঙ্কার, ব্যাকরণ ক্রমে ক্রমে সকলই ধরিয়া উঠিল; মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতি; ন্যায়, বেদান্ত, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শন; কল্পসূত্র, আরণ্যক, উপনিষদ, একে একে সকলই অগ্নিস্পৃষ্ট হইয়া জ্বলিতে লাগিল।'

এ একরূপ আত্মহনন, গূঢ় অপরাধবোধের জাত এক ধরনের মর্ষকাম। তার রূপমোহ বা স্ত্রৈণতা, পরিণতিতে তার উদারতা বা স্ত্রীর দৈহিক শুচিতার প্রমাণ নিয়ে মনকে ভুলানো সব কিছুর ভিত্তি ওখানে।

গৃহত্যাগী চন্দ্রশেখরকে রমানন্দ স্বামীর কাছে উপদেশ গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে একটি পরিচ্ছেদে। ব্যক্তিগত দুঃখ-নিবৃত্তি পরহিতব্রতে–এ জাতীয় প্রাচীন নীতিবাদ একটু বেস্থামী হিতবাদের সঙ্গে মিশেছে সেই উপদেশে। হিতবাদী চন্দ্রশেখর দলনীর কিছু উপকার করতে চেয়েছে এবং তার দ্বারা না জেনে অনেক বেশি ক্ষতিই করে ফেলেছে। আর দুঃখজয়ের সন্ন্যাসীপ্রদত্ত মন্ত্র যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে শৈবলিনী বিষয়ে তার মনোভাব সে প্রমাণ দেয়। রমানন্দের উপদেশ মানবচরিত্র ও ভাগ্যের বিসদৃশ পটভূমি হয়েই থেকেছে। তবু এই গুরুর আদেশ চন্দ্রশেখরের প্রয়োজন ছিল। প্রথমত, তার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত একটি আশ্রয় পেতে চেয়েছে। দ্বিতীয়ত, শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে সে গুরুর নির্দেশে রক্ষণশীল নীতিবাদী স্বামীর তথা উপদেষ্টার একটি ভূমিকা পালন করেছে। ব্যক্তি চন্দ্রশেখর প্রায় রমানন্দ স্বামীর ছায়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু যখন শৈবলিনীর মস্তিষ্ক-বিকৃত প্রকট হয়ে উঠল, চন্দ্রশেখরের চিত্ত সব বিচার-পাপ-নৈতিকনির্দেশ ভেদ করে প্রকাশ পেল। 'চন্দ্রশেখর গদগদ সকাতরে ডাকিলেন, 'গুরুদেব! এ কি করিলে একি করিলে?' ... চন্দ্রশেখরও কাঁদিলেন।'

রোগ-নিরাময়ের মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসায় শৈবলিনী ভালো হয়ে উঠল। সে যে দেহে সতী তা প্রমাণিত হলো। যবনের অন্নজলেও তার জাত যায়নি এসব তথ্য জানবার জন্য অনেক আয়োজন করতে হয়েছে। কিন্তু সম্মোহিতা শৈবলিনীর কাছ থেকেই চন্দ্রশেখর জেনেছে প্রতাপের প্রতি তার গভীর আসক্তির কথা –

চ। তুমি ফস্টরের সঙ্গে গেলে কেন?

শৈ। প্রতাপের জন্য। ...

'প্রতাপ কি তোমার জার?'

শৈ। ছি! ছি!

চ। তবে কি?

শৈ। এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম–ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলেন কেন? ...

'...তুমি ফস্টরের সঙ্গে বাস করিলে কেন?'

শৈ। বাস মাত্র। যদি পুরন্দরপুরে গেলে প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

চ। বাস মাত্র – তবে কি তুমি সাধ্বী?

শৈ। প্রতাপকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম – এজন্য আমি সাধ্বী নহি।

যোগচিকিৎসক চন্দ্রশেখর গুরুর প্রতিনিধি মাত্র, কিন্তু স্বামী চন্দ্রশেখরের কাছে এই সংবাদ কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল? শৈবলিনীর দেহগত শুচিতায় কোনো সান্ত্বনা রইল কি?

কিন্তু শুধু করুণার বশে নয়, রমণীর রূপে মুগ্ধ – নিমজ্জিতব্যক্তিত্ব চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে গৃহে স্ত্রীর পূর্ণ মর্যাদায় – প্রেমে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। বলল, 'যদি লোকরঞ্জনার্থ কোনো প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তবে তাহা করিব। করিয়া ইহাকে গৃহে লইব।'

কিসের প্রায়শ্চিত্ত? প্রতাপকে হৃদয় সমর্পণের? চন্দ্রশেখর জানে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। তাই নিজেকে প্রবোধ দেয়, 'এক্ষণে জানিলাম যে ইনি নিষ্পাপ'। এখানেই চন্দ্রশেখরের প্রেমের–মনুষ্যত্বের ট্র্যাজেডি।

প্রতাপ উপন্যাসের রোমান্টিক প্রণয়-ব্যাপারের নায়ক। চরিত্রটিকে সরল ও আদর্শবাদী বলে ধারণা হয়। একটু ভেতরে তাকালে দেখা যাবে সরলতার গভীরে কিছু বাঁক আছে, যদিও তার খবর সে নিজেই পায় না। তাছাড়া সব কিছুর সঙ্গে একটি বলিষ্ঠ বালকের মন জড়িয়ে থাকায় তার আদর্শবাদ শুদ্ধ ও নিরঞ্জন না হয়ে বর্ণবন্ত হয়ে উঠেছে।

বাল্যসখী শৈবলিনীর প্রতি প্রেম তাকে উদ্দাম করেছিল, দ্বিতীয় চিন্তার কোনো অবকাশ রাখেনি মনের কোথাও। ব্যর্থ প্রণয়ে আত্ম-বিসর্জন–একটা উচ্চকণ্ঠ আদর্শের প্রেরণায় সে তখন অন্ধ বালক। মনের সঙ্গে লড়তে, সামাজিক রীতি ও নিষেধকে ভাঙতে উদ্বুদ্ধ হয়নি, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক সংগ্রামে তিলে তিলে দগ্ধ চিত্তের যন্ত্রণা ভোগ করার ক্ষমতা বা ধৈর্য নেই তার। তাই দ্রুত আত্মহননের প্রবৃত্তি, সে মূলত কর্মী, ভাবুক নয়। শৈবলিনীর বিয়ে হবার পরে তার দিকে হৃদয়কে বাড়িয়ে রাখে নি। সে তালুক-মুলুক করে রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। সে বহুবারই শৈবলিনীকে দেখেছে, শৈবলিনীর মনের ভাষা একেবারে পড়তে পারেনি তা নয়; সেই আয়নায় নিজের লুকোনো স্মৃতি অনুভব করেছে। যে প্রেমকে অন্যায় ও অসহনীয় মনে করে পুঁতে দিয়েছিল মনের অন্ধকারে–নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করছিল, তা মরে যায়নি দেখে ভয় পেয়েছে। তার উক্তি, 'ঈশ্বর জানেন, আমি কোনো দোষে দোষী নহি। ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম।'

আসল ভয়–এ সাপ তার মনের গর্তেই ছিল। আজ দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে প্রতাপ।

প্রতাপ আসলে কর্মী – বলা যায় দুঃসাহসিক কর্মে তার একটু অতিরিক্ত ঝোঁক। বীরত্ব দেখিয়ে বাহবা পাওয়া, অন্যের কাছে না হোক নিজের কাছে হলেই যথেষ্ট। অর্থাৎ সুযোগ মেলার অপেক্ষা, জলে ডুবে আত্মহত্যা করতে যাওয়া, ইংরেজদের নৌকা থেকে শৈবলিনীকে উদ্ধার করা, শৈবলিনীর মন ফেরাতে নদীতে সত্যিই ডুবে যাবার চেষ্টা, যুদ্ধক্ষেত্রে অপ্রয়োজনে (যখন জয় পরাজয় ঠিক হয়ে গেছে তারপরে) প্রাণ বিসর্জন–এ সবেরই মূলে তার শৈবলিনীর প্রতি ভালোবাসা এবং সরল বীরত্ব–বড় মাপের কিছু একটা করার প্রবণতা। বড় করে অনেককাল ধরে কষ্ট পেতে পারে না প্রতাপ–তাই বড় রকম কিছু একটা করে তার গভীর ও প্রবল ভালোবাসা সে প্রকাশ করতে চায়। প্রকাশ করতে এবং যুগপৎ সংযত করতে চায়। মনের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করে নয়, মনের উপরে পুরো বিশ্বাস নেই, নেই নিজেকে নৈতিক সংযমে বাঁধার শক্তির উপরে বিশ্বাস। তাই আত্মহত্যা, বীরের মতো আত্মদান (তাতে গৌরব আছে; এই গৌরবটুকু চাই প্রতাপের – দুঃসাহসিক বীরের কার্যে তার বড় প্রীতি) করে সে সমস্যার সমাধান চায়। বিয়ের আগে বা পরে দু-বার এই চেষ্টা সে করেছে, এবং তৃতীয়বারের কার্যত আত্মঘাতী হয়েছে। তার সরব বাক্য, 'আমার ভালোবাসার নাম – জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।'

তার স্বভাবের প্রতিফলন। রমানন্দ স্বামী একে ইন্দ্রিয়জয়ের পুণ্য বলেছেন, প্রতাপ স্বয়ং এই গৌরবে উল্লসিত হতে চায়। কিন্তু দর্পিত আদর্শবাদের আড়াল দিয়ে এ কি পলায়নও নয়?

শৈবলিনী উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। চন্দ্রশেখর ও প্রতাপের যোগসূত্র সে, তাকে ঘিরে ওই দুই পুরুষের জীবন ও ভাগ্য আলোড়িত। তাকে আশ্রয় করেই উপন্যাসে নৈতিকতার উত্তাল সমস্যা, তাকে নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে রক্ষণশীলতার অভিযোগ। এর কোনো প্রশ্নই একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। এসব মিলিয়ে, এসব ছাড়িয়ে শৈবলিনী লেখকের এক অত্যাশ্চর্য চরিত্র রচনা। শৈবলিনীতে লেখকের দ্বিধা এবং দ্বিধা ভেদ করে চিত্তরহস্যে নেমে পড়া।

অন্তত কয়েকটি ক্ষেত্রে লেখা ভারসাম্য হারিয়েছে। যেমন –

১. প্রতাপ আমার কে – একথা ভেবে শৈবলিনীর ডুবে না-মরা।
২. শৈবলিনীর নরকভোগের বিস্তৃত বর্ণনা
৩. তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই – একথা বলে প্রতাপকে ইংরেজ-যুদ্ধে প্রাণদানে প্ররোচিত করা।

গল্পের আরম্ভে প্রতাপ-শৈবলিনীর তরুণ প্রেমের মধুর ছবি। সামাজিক কারণে মিলন অসম্ভব জেনে এরা দুজনে মিলে আত্মহত্যা করতে গেল। প্রতাপ নদীতে ডুবল, শৈবলিনী শেষমুহূর্তে ডুবতে পারল না। লেখক কি শৈবলিনীর মধ্যে আত্মসুখপরায়ণতার বীজ কত গভীর ছিল তা দেখাতে চাইছেন? প্রতাপের প্রতি তার ভালোবাসা লঘু এবং নেহাৎই বালিকা মনের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস এরকম কিছু ইঙ্গিত করাই কি বঙ্কিমের ইচ্ছা।

প্রতাপ আমার কে – একথা ভেবে কি নিজের কাজের কৈফিয়ত তৈরি করতে চেয়েছে সে? আসলে যে প্রেম আত্মদানে উন্মুখ তার সঙ্গে শৈবলিনীর পরিচয় ঘটেনি–আত্মহত্যার পরামর্শ এবং যথার্থ আত্মহত্যা এক জিনিস নয়। প্রতাপের চরিত্রে কেন তা এতসহজ আগে তার বিশ্লেষণ করেছি। প্রেম মানেই আত্মদান – এ সিদ্ধান্ত সর্বজনীন নয়। তবু লেখক যেভাবে নায়িকার প্রতি কিছু অবিচার করে ফেলেছেন, পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর পাপের বীজ খুঁজেছেন তার স্বভাবের মূলে। কাজটা চরিত্র-শিল্পের দিক থেকে অবৈধ। কিন্তু প্রতাপ আমার কে – এই চিন্তায় এক ধরনের আয়রনি আছে – সারা জীবন দিয়ে অনেক দুঃখে শৈবলিনীকে এর উত্তর পেতে হয়েছে।

শৈবলিনী মানসিক রোগে আক্রান্ত হবার মুখে নরক ভোগের দুঃসহ যন্ত্রণা পেয়েছে। লৌকিক বিশ্বাসে অসতী নারীর জন্য যমালয়ে যেসব বীভৎস শাস্তির ব্যবস্থা আছে শৈবলিনীকে বেঁচে থেকে অর্ধজাগর স্বপ্নে তা ভোগ করতে হয়েছে। শৈবলিনী পুরো পাগল হয়ে যাবার আগে তার মানস-বিকার হিসেবে এই দীর্ঘ অংশ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই পরিকল্পনার গোড়ায় মনস্তত্ত্বের ঠেকনা অনুমান করা যায়। শৈবলিনীকে আপাতদৃষ্টিতে সব সংস্কারের অতীত বলে মনে হয়। কিন্তু মনের প্রত্যক্ষ ভাবনায় না থাকলেও সামাজিক-নৈতিক বোধগুলি নানা গোপন গহ্বরে লুকিয়ে থাকে, চেতনায় ভেসে না উঠলে অন্তর্দ্বন্দ্ব স্পষ্টত অনুভূত হবার নয়। লুকোনো নানা বোধ অস্বাভাবিক মূর্তি নিয়ে কখন-বা বেরিয়ে আসে। শৈবলিনী না জেনে পাপের সংস্কার ও নরক-ভোগের আতঙ্ক চিত্তের ভেতরে এতকাল পুষেছে। আজ তা বাইরে এল অনুশোচনা-পাপভীতি-নরকদর্শন-প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির রূপ ধরে। কিন্তু এরকম যুক্তিতে অত বিস্তৃত প্রত্যক্ষপ্রায় শাস্তিভোগের বিবরণকে মেনে নেওয়া যায় না। মনস্তত্ত্বের সম্ভাবনাকে নৈতিক শাস্তির রূঢ়তায় রূপান্তরিত করেছেন লেখক। সাহিত্য এখানে আহত।

শৈবলিনীর শেষ যে কথাটি (উপরে ৩ নং সূত্র দ্রষ্টব্য) উল্লিখিত তার বিচারে কিছু পরে আসছি। সংক্ষেপে সিদ্ধান্ত – ওখানে নিগূঢ় তাৎপর্য নিহিত।

মোটকথা শৈবলিনীকে নিয়ে লেখক একটা বড় রকম হোঁচট খেয়েছেন– নরকদর্শন প্রসঙ্গে। মানব-চিত্তের গহনচারিতার যে সুযোগ ছিল বঙ্কিম তার সীমা বহু দূরে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। না হলে শৈবলিনী অত্যুচ্চ এবং অসূচীভেদ্য বলে গণ্য হত।

শৈবলিনীকে ভীমা পুকুরে তরল কৌতুকে উচ্ছল হয়ে উঠতে দেখি। আর পাঁচজন গৃহস্থ বধূর মতো সে সংসারধর্ম পালন করছে, স্নানের ঘাটে সখীদের সঙ্গে রসালাপ করেছে – এ রকমও মনে হতে পারে। কিন্তু ঘুমন্ত শৈবলিনী প্রসঙ্গে চন্দ্রশেখরের উক্তি মনে রাখার। নিজের ভাগ্যকে সে মেনে নেয়নি, সংসার-ধর্মের কাছে ভক্তিপূত পাতিব্রত্যে আত্মসমর্পণ করেনি। ফস্টরের নৌকায় সুন্দরীর সঙ্গে তার কথাবার্তা একটু তুলে নেওয়া যাক–

শৈ। ... কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য করিবার জন্য ঘরে ফিরিয়া যাইব? ন পিতা, ন মাতা, ন বন্ধু–

সু। কেন স্বামী? এ নারীজন্ম কাহার জন্য?

শৈ। সব ত জান–

সু। জানি। জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠ আছে, তোমার মতো পাপিষ্ঠা কেহ নাই। যে স্বামীর মতো স্বামী জগতে দুর্লভ, তাহার স্নেহে তোমার মন ওঠে না। ... তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝিতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালোবাসেন, নারীজন্মে সেরূপ ভালোবাসা দুর্লভ...

শৈ। দেখ, গৃহে থাকিতে মনে ভাবিতাম, যদি পিতৃমাতৃকুলে কাহারও অনুসন্ধান পাই তবে তাহার গৃহে গিয়া থাকি।–নচেৎ কাশী গিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব–নচেৎ জলে ডুবিয়া মরিব। অন্য নারীর জীবনাদর্শ ও মূল্যবোধে শৈবলিনীর আস্থা নেই। স্বামীর প্রেম পেয়েও স্বামীকে সে ভালোবাসতে পারেনি, স্বামীগৃহে তার মনের শিকড় এই আট বছরেও গেড়ে বসেনি। শৈবলিনীর হৃদয় স্বাধীন, প্রেম স্বাধীন, দুঃখ আপনার মনগড়া। নীতিধর্মের কাছে নয়, সাংসারিক কর্তব্যের কাছে নয়, অপরের প্রেমের কাছেও নয় – অনন্যপরতন্ত্র তার, অনুগত্য শুধু নিজের হৃদয়ের কাছে। বঙ্কিম তাকে আধুনিক জীবনবোধের উপাদানে গড়েছেন।

তাই শৈবলিনী পুকুরঘাটে যে লঘু রসিকতা করে তা প্রাত্যহিক মৌন দাহ ঢাকবার একটা রঙিন আবরণ।

ফস্টরের সঙ্গে কৌতুকে কোনোরূপ চিত্তদৌর্বল্যের স্পর্শ নেই, দুঃসাহসিক অগ্রগামিনীত্ব আছে, আছে পারিপার্শ্বিককে অস্বীকার করা। গ্রামের নারীরা যা পারে না, শৈবলিনী তাতে কুণ্ঠিত নয়। শৈবলিনীর এ এক বিদ্রোহ – অবশ্য উদ্দেশ্যহীন নিরুপায় বালিকার বিদ্রোহ।

শৈবলিনী কবে প্রতাপকে কতবার বেদগ্রামে দেখেছে তার বিবরণ এ গল্পে নেই। নিশ্চয়ই বহুবার। প্রতাপ তার চোখের ভাষা পড়তে পেরেছে, বেদগ্রাম যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। শৈবলিনীর ব্যর্থ শূন্য বিবাহিত জীবনে প্রতাপের ভালোবাসার স্মৃতি ছিল, যে প্রতাপ তার প্রেমে নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল–যার প্রেমে সে আত্মহত্যা করতে গিয়েও পারেনি। হয়ত সে স্মৃতি ম্লান হয়ে আসছিল। কিন্তু বেদগ্রামে প্রতাপকে দেখার মানস প্রতিক্রিয়া সে নিজেই জ্বলন্ত ভাষায় বলেছে, 'আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়েছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম; আবার কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম তো তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম তো মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না যে তোমারই রূপধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি। এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি?'

শৈবলিনী মনে এই তীব্র উত্তাপ বহন করে ভীমাপুকুরে স্নান করত জল আনত রসিকতা করত ফস্টরকে গালি দিত গৃহকর্ম করত এবং ক্রমে নিভে যেত। প্রতাপের

দিক থেকে সে আগুন জ্বালিয়ে রাখার উদ্যোগ ঘটত না। তাই সমিধ মিলত না। এমন সময় ফস্টর একান্ত ব্যক্তিগত কারণে শৈবলিনীকে লুঠ করে নিয়ে গেল। ফস্টরের লালসা শৈবলিনীর কৌতুকে উদ্দীপ্ত হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু এই ঘটনার নায়িকা শৈবলিনী নয়। অবশ্য সে মনের দিক থেকে এমন অবস্থায় পৌঁছেছিলে যাতে এই গৃহচ্যুতিতে সামান্য দুঃখিত হলো না, দুশ্চিন্তায় কাতর হলো না, স্বামীগৃহে আর স্থান জুটবে না ভেবে ব্যাকুল হয়ে উঠল না, তাই সে সুযোগ পেয়েও বাড়ি ফিরতে চায়নি–যে বাড়িতে তার প্রেম নেই।

শৈবলিনীর প্রণয়জীবনের ক্লাইম্যাক্স 'অগাধ জলে সাঁতার' শীর্ষক পরিচ্ছেদে। প্রতাপের সস্নেহ সম্বোধনে তার চরম প্রাপ্তি ঘটেছে এবং তার পরিণতি গভীর বেদনায় চূড়ান্ত অপ্রাপ্তিতে পৌঁছেছে। প্রতাপের ভালোবাসা শেষ মূল্য আদায় করল ভালোবাসা ভুলে যাবার প্রতিজ্ঞায়। প্রেমিকের প্রাণের জন্য (প্রাণদান প্রতাপের পক্ষে কত সহজ এ কথা নিশ্চিত জেনে) শৈবলিনী প্রেমকে উপড়ে ফেলার সাধনা করল।

প্রতাপকে ভালোবাসা সে পাপ বলে অনুভব করতে চাইল, স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায় তার কাছে আশ্রয় পেতে চাইল–তার পক্ষে এই তো নরকভোগ। এই কঠিন মানসিক সংগ্রামে, এই বিপুল শূন্যতায় নিক্ষিপ্ত সে পাগল হয়ে গেল। শৈবলিনীর নরক-ভোগ লেখকের নীতিবোধের বাড়াবাড়ির ফল, কিন্তু তার উন্মাদরোগ স্বাভাবিক; এমন কি তাকে অপরিহার্য করে তুলেছিলেন লেখক।

অবশেষে মনঃসমীক্ষামূলক চিকিৎসা[৩] এবং শৈবলিনীর রোগমুক্তি। সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত নারীর এই ব্যাধিমুক্ত রূপেও কোথাও আনন্দের স্পর্শমাত্র ছিল না। তবু নরক ভোগের সব লাঞ্ছনা ডিঙিয়ে সব যোগবল ও চিকিৎসা ব্যর্থ করে তার ক্ষীণপ্রাণ আত্মপ্রকাশ করল। প্রতাপকে সে বলেছে, 'স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কত দিন বশে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না।' শৈবলিনীর মনে এখনও আগুন, সে কোনো মুহূর্তে তা লেলিহান হয়ে উঠতে পারে সে বলল, 'তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই–'

অর্থাৎ তুমি মরে গেলেই আমি সুখী হব। শৈবলিনী কি জানত না এই 'তুমি' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'আমার প্রেম', 'আমার অস্তিত্ব', 'আমি–শৈবলিনী'। তার জীবনে বিশ্বে প্রতাপ নেই, প্রেম নেই,–অর্থহীন সেই অস্তিত্ব নিয়ে সে শান্ত দাম্পত্যে কালব্যয় করেছে – সেই 'সুখ' সেই মৌন যন্ত্রণাই তার নিয়তি।

শৈবলিনীর সৃষ্টিতে অল্পস্বল্প যে স্খলন ঘটেছে তা নানা মাত্রায় বহুগুণে পূরণ করেছেন লেখক। কিছু কিছু ত্রুটি সত্ত্বেও এই উপন্যাস তাই বড় লেখা হয়ে উঠেছে।

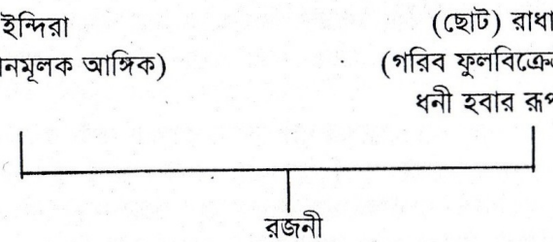
৩. যোগবলে শৈবলিনীর দূরদর্শনে অতিলৌকিকতার স্পর্শ আছে, কিন্তু সম্মোহন-চিকিৎসা য়ুরোপীয় মনোবিদ্যা মেসমার-পদ্ধতির সদৃশ।

৮ রজনী : বিপর্যয়–মানুষে এবং রচনায়

এক

রজনী লেখার রীতিতে অভিনবত্ব আছে, যা বইটি পড়তে গেলেই পাঠককে টানে। সেকালে খুবই নজরে পড়ার কথা। কারণ বাংলায় এই আঙ্গিকের বই আগে লেখা হয়নি, যেখানে লেখক সরে গিয়ে মুখ্য পাত্রপাত্রীদের মনের কথা বলতে দিয়েছেন, সেই পথে গল্পও এগিয়েছে।১ তাছাড়া একটি গরিব অন্ধ তরুণীকে কেন্দ্রে রেখে উপন্যাস গড়ায়ও ছিল চমকে দেবার মতো নতুনত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন সম্পাদনা করছিলেন, প্রবন্ধ লিখছিলেন, বিষবৃক্ষ-চন্দ্রশেখর-কৃষ্ণকান্তের উইল নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। এর মধ্যে কিছু লঘুভাবে ছোট আকারের কাহিনী লিখে নতুন শিল্পাঙ্গিক প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও করছেন। এই ছোট লেখাগুলির মধ্যে ইন্দিরার নিজের ভাগ্য আর চিত্তের কথা তাকে দিয়েই বলানো হয়েছে। রাধারাণীতে একটি গরিব ফুলবিক্রেত্রী মেয়ের প্রেম আর ধনী হবার কথা আছে। রাধারাণীর রূপকথা আর ইন্দিরার আত্মকথন রীতি লেখকের ভালো লেগে থাকবে। এদের দুই আদর্শকে মিশিয়ে আরও কিছু যোগ করে পুরো আকারের উপন্যাস লেখা হলো রজনী।



তবু আগের দুটি গল্পাদর্শের সরল যোগফল অবশ্য নয় রজনী, বাড়তি অনেক কিছু এসেছে। ইন্দিরার একজনের আত্মকথনের জায়গায় চার প্রধান নারীপুরুষ এখানে বক্তা। ফলে আঙ্গিক অনেক জটিল হয়েছে। আবার রাধারাণীর মতো দারিদ্র্যের সঙ্গে অন্ধদশা যুক্ত হয়ে রজনীতে আরও বেশি দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে উঠেছে। ভিখারিণীর রানী হবার রূপকথার সঙ্গে মিলেছে আধুনিক মানুষের মন।

১. এই কথনভঙ্গী কতটা উপন্যাসের প্রাণের অঙ্গ, কতটা শুধুই চোখভুলানো সে-সব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি 'বঙ্গিমচন্দ্রের উপন্যাস ঃ শিল্পরীতি' বইয়ে।

দুই

লিটনের অন্ধ তরুণী নিদিয়ার নাম করে বঙ্কিম ঋণ স্বীকার করেছেন– 'লর্ড লিটন প্রণীত Last Days of Pompeii নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি 'কানা ফুলওয়ালী' আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা হইয়াছে।'

অবশ্য অন্ধত্ব ছাড়া নিদিয়ার সঙ্গে রজনীর মিল কিছু নেই। অন্ধ নারীর অন্য ইন্দ্রিয়গুলির যে সজাগ তীক্ষ্ণতা এবং সূক্ষ্ম আত্মমগ্নতা তার স্বভাবে এনেছেন লেখক সে সবই তাঁর মৌলিক ভাবনার ফল। লেখক মানসিক নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদনের কথা বলেছেন। এ গ্রন্থে অনুরূপ কোনো উদ্দেশ্য খুঁজে পাইনি। রজনীর ভাবনায় মাঝে মাঝে যে দার্শনিকতা দেখা গিয়েছে বঙ্কিম বোধ হয় সেদিকেই ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন। যেমন, 'আমি জানি রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র–শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে – সেই রূপ শব্দও তোমার মনে। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখমাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র, স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র।'

এ ভাষা এবং উপলব্ধি যতটা লেখকের নায়িকার নয়। ইন্দ্রিয় ও মনের সম্বন্ধ নিয়ে যে তাত্ত্বিকতা আছে তা রজনীর মতো সরল অশিক্ষিত মেয়ের হতে পারে না, তার স্বাভাবিক অনুভূতি থেকে ছেঁকে নেওয়া ঔপন্যাসিকের দার্শনিক সিদ্ধান্ত হিসেবেই তা গ্রাহ্য। এই জাতের উচ্চ ও জটিল প্রসঙ্গের বাড়াবাড়ি ঘটলে রজনী চরিত্রের শিল্পগুণটুকু বিনষ্ট হত।

কিন্তু সে অন্ধ বলে কতগুলি পৃথক ধরনের বোধ, কিছু অনুভূতি তার ভাবনায় স্পন্দিত হয়েছে। লেখক তা তাঁর নিজের ভাষায় শুনিয়ে বাস্তব সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন, নায়িকার মনোজগতকে বিশেষ সত্য করে তুলেছেন। কয়েকটি উদ্ধৃতির সাহায্য নেওয়া যাক।

শচীন্দ্র যখন তার চিবুক ধরে চোখের দৃষ্টিহীনতা বুঝবার চেষ্টা করল যুবতী রজনীর মনে যে প্রতিক্রিয়া হলো– ' সেই স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যুথী, জাঁতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেঁউতি–সব ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম। বোধ হইল, আমার আশেপাশের ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল, আমার পরণে ফুল, আমার বুকের ভিতর ফুলের বাঁশি। ... আ মরি মরি-সে নবনীত-সুকুমার–পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ।'

এটি শৈল্পিক ইন্দ্রিয়-বিপর্যয়ের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অন্ধ ফুল-বিক্রেত্রী রজনী স্পর্শের রোমাঞ্চকে ফুলের গন্ধে এবং ক্বচিৎ গন্ধকে বীণাধ্বনিতে রূপান্তরিত করে সম্ভোগ করেছে। ফুলের ভাবাসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। দেখার চোখের স্থান নিল স্পর্শোমুখ সর্বদেহ– স্পর্শ থেকে সুগন্ধ, রমণীয় সঙ্গীত–আসলে ঐ দুই ইন্দ্রিয়াবেদনও সর্বাঙ্গের স্পর্শজনিত শিহরণেই এসে স্থিত হল। রজনীর প্রেম এই ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়েই অন্তরময়। তার এই সব অনুভূতি, এবং বন্ধ রূপমহলের সামনে তীব্র মানস

আর্তনাদ–'বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত পুরুষ জাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, ... যাহার করস্পর্শে এত সুখ সে দেখিতে কেমন? ... এক মুহূর্তজন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না?'

বিশ্বপ্রকৃতির কাছে স্পর্শকে মূর্তিতে ধরে দেবার প্রার্থনা কবিতা হয়ে উঠেছে। রূপমোহগ্রস্ত শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর অন্তরে প্রবেশ করে দৃশ্যময় জগতের উপরে পর্দা টেনে দিয়ে কবির ভাষা ও প্রকাশরীতির খুব কাছে গিয়ে পড়েছেন। তাঁর উপন্যাসে কবিত্বের উপাদান অন্য কোথাও এত গাঢ়ভাবে আত্মস্থ হয়নি।

শেষের উদ্ধৃতিতে 'তোমার হৃদয়ের সারভূত পুরুষজাতি' কথাগুলিতে আর একটি ইঙ্গিত পাঠ করা যায়। রজনীর ইন্দ্রিয়ানুভূতির সঙ্গে অস্পষ্ট যৌন চেতনা জড়িয়ে গিয়েছিল–শচীন্দ্রের প্রতি প্রণয়ের সূচনা এখানেই।

এছাড়া রজনীর প্রেমের জন্য গৃহত্যাগ, দুঃসাহসিক আত্মরক্ষা, উপকারী অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি স্বভাব-বৈশিষ্ট্য একরঙা ব্যাপার–এগুলির কোনো বাড়তি মাত্রা বিশ্লেষণ করে চিনে নেবার প্রয়োজন নেই। লবঙ্গলতার প্রতি তার প্রীতিশ্রদ্ধা থাকার কথা – কিন্তু তার পরিমাণ এত বেশি হলো কেন যাতে সব সম্পত্তি পদপ্রান্তে সমর্পণে উদ্যত হয়েছিল? বোধহয় লবঙ্গ উপলক্ষ মাত্র, এ অঞ্জলি প্রেমের – শচীন্দ্র অভিমুখী। কিন্তু শচীন্দ্রের দিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়েও প্রথম পুরুষস্পর্শের ক্ষণিক রোমাঞ্চকে মাত্র মূলধন করে এতকাল, এত বিরূপ ঘটনাবর্তে সে তার প্রেমকে একনিষ্ঠ রেখেছিল কোন্ মন্ত্রে তার ব্যাখ্যা প্রত্যাশিত ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক কালের রোমান্টিক আকুতিতে ইন্দ্রিয়-বিকারকে (যেমন অন্যত্র করেছেন নৈতিক বিচারকে অবহেলা) ডিঙিয়ে এক গরিব অন্ধ ফুলওয়ালীকে নায়িকা করেছেন, এবং মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতায় তার চিত্তের স্পন্দনগুলির খোঁজ নিয়েছেন, কিন্তু পরিণতিতে তাকে প্রথম প্রভূত অর্থ ও সমাপ্তিতে দৃষ্টিশক্তি দান করে শিল্পকে রূপকথায় অবনমিত করেছেন।

তবুও রজনী-চরিত্রে পাঠক এমন কিছু পায় যা অন্যত্র মেলেনি।

তিন্

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর (বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ সংস্করণ) ভূমিকার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাসের মতে রজনী – ভাষার প্রথম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ ধর্মী উপন্যাস।[২] ওঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া গেল না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সামাজিক উপন্যাস বিষবৃক্ষে রোমান্সের ঘটনাবহুল বর্ণাঢ্য রূপ অনেক ম্লান হয়ে এসেছে। মনের নানা স্তরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আরম্ভ ওখানেই। রজনীতেও ঘটনায় চমক আছে, উত্তেজনা আছে, অসম্ভবকে সম্ভব করানো হয়েছে। সম্ভবত শচীন্দ্র-লবঙ্গ-অমরনাথ-রজনী নিজের মনের কথা বলায় উক্ত সমালোচকেরা বইটিকে বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন ভেবে ভ্রমে পড়েছেন।

---

২. 'রজনী বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণমূলক উপন্যাস।– নায়ক-নায়িকার মানসিক দ্বন্দ্ব এবং ঘাতপ্রতিঘাতকে রজনীতে ঘটনা বৈচিত্র্যের উপরেও প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। সে-যুগের বর্ণনাবহুল রোমান্টিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইহা অভিনব সন্দেহ নাই।'

কোনো পাত্র যখন নিজের মনের মধ্যে ডুব দেয় তখনই হয় মনস্তত্ব-বিশ্লেষণ এ কথা ঠিক নয়। নিজের মনের কোনো স্তর তার স্পষ্ট ভাবনায়, প্রকাশিত আবেগে ধরা পড়ে, আবার কোনো স্তর পড়ে না। কাজে তার প্রতিবিম্ব, হয়ত চিন্তায় তার ভাঙ্গা ছবি – ব্যাখ্যানের বা ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে তাকে ধরে দেন লেখকই। মন-বিশ্লেষণের সরল-জটিল নানা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আত্মকথন বা আত্মভাবনা শ্রেষ্ঠ বা একমাত্র পন্থা – এমন কথা নেই।

ইতিহাসের চোখে বাংলা উপন্যাসে মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ আরম্ভ বিষবৃক্ষে – বিকাশ কৃষ্ণকান্তের উইল প্রথম খণ্ডে। রজনীতেও আছে বৈকি, কিন্তু কোনো স্বতন্ত্র স্তরের নির্দেশ করেনি। তারপরে অনেক কালের ব্যবধান, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' থেকে নতুন করে নতুন ভঙ্গিতে এর আরম্ভ এবং অনুগামীদের রচনায়ও সাধ্যমতো অল্পাধিক অনুসৃত। এই ধারাবাহিকতায় রজনীকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার হেতু নেই।

চার

রজনী উপন্যাসে সমকালের প্রত্যক্ষ প্রতিফলন আছে–হীরালালে এবং অমরনাথে। হীরালালে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজের নব্য শ্রেণীর একটি লোক ব্যঙ্গের ফ্রেমে ধরা পড়েছে। সেই সময়ের প্রহসনে-নক্সায় যাদের বিদ্রূপ করা হতো, তারাচরণ–দেবেন্দ্রনাথে (বিষবৃক্ষ) যার কতক নিদর্শন, হীরালাল সেই দলে পড়বে। লেখকের ভাষায় তার পরিচয় দেওয়া যাক, সমকালের গোষ্ঠিবিশেষের ব্যঙ্গচিত্র হিসেবে এই বিবরণ যথেষ্ট জীবন্ত। লোকরহস্যের নকসাগুলির কথা মনে পড়ে যায়। মদ্যপ এবং গেঁজেল হীরালাল লেখাপড়া শেখেনি। ভালো হাতের লেখার সুবাদে মুরুব্বি ধরে একটি কেরানিগিরি পায়। তারপরে 'মাতলামির দোষে সে চাকরিটি গেল। হরনাথ বসু তাহার দমে ভুলিয়া লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। দোকানে লাভ দূরে থাক, দেনা পড়িল–দোকান উঠিয়া গেল। তারপর কোনো গ্রামে বার টাকা বেতনে হীরালাল মাস্টার হইয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তারপর সে একখানা খবরের কাগজ করিল। দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল–কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিসে টানাটানি আরম্ভ করিল – ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল।'

হীরালাল রজনীকে বিয়ে করতে চাইল টাকার লোভে, মুখে অবশ্য দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট করার বক্তৃতা দিল–'আমি যখন স্তম্ভুম্ভিশ্চশাৎ পত্রিকার এডিটার ছিলাম, তখন আমি মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্য কত আর্টিকেল লিখেছি – পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল। বাল্যবিবাহ! ছি! ছি! মেয়ে ত বড় করিয়াই বিবাহ দিবে।' বঙ্কিম হীরালালের মধ্য দিয়ে সমাজের একটা শ্রেণীর বিদ্রূপ-বিকৃত ছবি এঁকেছেন, কিন্তু তাকে উপন্যাসের প্রয়োজনীয় চরিত্র করে তুলেছেন।

নব্য সমাজের গৌরবের দিকও এই উপন্যাসের একটি চরিত্রে সরাসরি প্রতিফলিত। নায়ক অমরনাথ সেদিক থেকে বঙ্কিমের উপন্যাসে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত হবে।

পাঁচ

অমরনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিস্থানীয়। কোঁত-এর পজিটিভজম এবং বেন্থামের হিতবাদ মিশ্রিত হয়ে তার মনোভূমিকে একটা দার্শনিক ভিত্তি দিয়েছে। বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডর তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে অমরনাথের যে আত্মকথন আছে তার সঙ্গে কমলাকান্তের নানা সাদৃশ্য চোখে পড়ে। তবে অমরনাথের দার্শনিকতা একটা মতবাদ মাত্র নয়, কোনো তত্ত্বের প্রতিরূপ বলে তার স্বাভাবিকতায় অবিশ্বাস জন্মে না। একদিকে এই তাত্ত্বিক প্রবণতা, অন্যদিকে নারীরূপে যৌবনসুলভ তীব্র আসক্তি।

বিবাহপূর্বে লবঙ্গের শয্যাগৃহে কি উদ্দেশ্যে সে ঢুকেছিল? অবশ্যই শুধু দৈহিক আসঙ্গ-লিপ্সায় নয়। লম্পট-স্বভাব হলে প্রয়োজন মেটাবার অর্থ অমরনাথের ছিল। লবঙ্গের প্রতি তার এই প্রবল আকর্ষণের পেছনে লবঙ্গের কি কোনো ভূমিকাই ছিল না? লেখক সে-সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। লবঙ্গের স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় আমাদের বুঝিয়ে দেয় তার পক্ষে অমরনাথকে শাসিত করার জন্য জাল পাতা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এ সবই কাল্পনিক কথা, উপন্যাসে কোনো ইঙ্গিত নেই।

এই গোপন সাক্ষাতের ফলে অমরনাথ যেভাবে লাঞ্ছিত হলো তার ভাবুকচিত্তে তা গভীর প্রভাব ফেলেছে। সে শুধু গৃহত্যাগ করেনি, তাত্ত্বিকতায় চিত্তের আশ্রয় খুঁজছে। এ কারণেই অমরনাথ কোনো দর্শনে মুখপাত্র নয় – তার মনন চরিত্রের ও জীবনের অঙ্গ।

লবঙ্গলতাকে অমরনাথ তারুণ্যের উচ্ছ্বাস নিয়ে ভালোবেসেছিল–সম্ভবত সম্পূর্ণ প্রতিদান ছাড়া নয়। তবে সে বিষয়ে জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। লবঙ্গের হাত দিয়েই তার মনুষ্যত্ব পৌরুষ এবং প্রণয় তৃষ্ণা বীভৎস ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিল। এই লবঙ্গই জীবনের উত্তরপ্রান্তে তার চিত্তের শেষ আশ্রয় সন্ধানকে বিপর্যস্ত করে দিল। লবঙ্গের প্রতি তার ঘৃণা-ক্রোধ-প্রতিহিংসার বাসনা জেগে উঠতে পারত–কিন্তু তা ঘটেনি। লবঙ্গের সাক্ষাৎমাত্র তার হৃদয় সাত সুরে বেজে উঠল। এর পরে দৃষ্টিহীনা রজনীর শান্ত রূপে আত্মমগ্ন হয়ে বাঁচাটা নিরর্থকই হয়ে গেল। বাকি ঘটনার বুনটটা বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় সূত্র যোগাতে চেয়েছে মাত্র।

রজনীর প্রতি অমরনাথের প্রেমের জাতটা স্বতন্ত্র। অন্ধ নারীকে বিয়ে করার মধ্যে এক ধরনের হিতবাদী আত্মপ্রসাদ আছে। সম্পত্তি বিষয়ে তার লোভের কোনো প্রমাণ নেই। দার্শনিক অমরনাথের সাংসারিক নিরাসক্তির গভীরে যে জ্বালা ছিল রজনীর কটাক্ষহীন নির্ভরশীল শান্তরূপে তাতে প্রশান্তি বর্ষিত হবে এরূপ প্রত্যাশা থেকে থাকবে।

রজনীও যখন তার প্রাপ্তির বাইরে চলে যাচ্ছে, যখন আবার গৃহহীন পথের যাত্রী হতে হলো তাকে, তাতে এক ধরনের বিষণ্ন কাতরতা দেখলাম– লেখক দানধ্যানের মহিমা দিয়ে বৃথাই তাকে ঢাকতে চাইছিলেন।

ছয়

শচীন্দ্র এবং লবঙ্গকে নিয়ে বেশ কিছু ভাবার আছে। চরিত্র দুটি সম্বন্ধে, তাদের নির্মাতা সম্বন্ধেও। শচীন্দ্র আধুনিক মনের যুবক। সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপে তার সংশয়বাদী চিত্তের কিছু পরিচয় আছে। শচীন্দ্রকে লেখক সহৃদয় পরোপকারী করে গড়েছেন। অন্ধ রজনী তার করুণা উদ্রেক করেছিল, স্নেহও। রূপবতী রজনী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চিত্তদৌর্বল্য যদি মনের কোনো স্তরে মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়েও থাকে তার দাম কিছু নেই, তাতে যৌনবোধের স্পর্শ ছিল না। শচীন্দ্রের নিজের কথায়–'রজনীকে প্রথম দেখিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই সৌন্দর্য অনিন্দ্যনীয় হইলেও মুগ্ধকর নহে। রজনী রূপবতী, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখন পাগল হইবে না। ... সৌন্দর্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে; বোধ হয়, সে মূর্তি সহজে ভুলিবেও না; কেন না, সে স্থির, গম্ভীর কান্তির একটু অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে। কিন্তু সেই আকর্ষণ অন্যবিধ; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই। যাহাকে 'পঞ্চবাণ' বলে রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধে নাই। নাই কি?' শেষ 'নাই কি?' কথায় অবচেতনার একটু ইঙ্গিত আছে। কিন্তু শচীন্দ্র বিশ্লেষণ-পরায়ণ একালের মানুষ, রজনীর মতো অন্ধ ও 'ইতরবৃত্তিপরায়ণ' ব্যক্তির কন্যাকে সে বিয়ের এবং প্রণয়ের পাত্রীরূপে ভাবতে রাজি নয়, যদিও সে সুন্দরী এবং তার প্রতি করুণা দেখাতে শচীন্দ্রের আগ্রহ আছে।

শচীন্দ্রের এই মনোভাব নানা কারণে প্রেমে রূপান্তরিত হতে পারত। হয়নি। রজনীর সঙ্গে তার বিয়ের কথা তোলা হলো সম্পত্তির লোভে। দেখা গেল শচীন্দ্রের বিরূপ প্রতিক্রিয়া বেশ তীব্র, আর সেটাই স্বাভাবিক। যে কৌশলে লবঙ্গ সন্ন্যাসীর সাহায্যে তার মন রজনীমুখী করে তুলল তাকে 'বশীকরণ' জাতীয় 'অবসকিওর রিচ্যুয়াল' বলে গণ্য করা চলে। হৃদয়বৃত্তির দিক থেকে এ বলাৎকার ছাড়া কিছু নয়।[৩] অর্থলোভে এরূপ পন্থা গ্রহণ করা কূটবুদ্ধি বিবেকহীনা নারী লবঙ্গলতার পক্ষে সম্ভব। তার প্রতিক্রিয়া শচীন্দ্রের মানস-বিপর্যয়ে ও চিত্তবিকারে কিভাবে প্রতিফলিত তা জানার প্রত্যাশা পাঠকের জাগে। কিন্তু শচীন্দ্রের মনোরোগ এবং তার উপশম ও রজনীপ্রাপ্তির সর্বসুখে কাহিনী শেষ হয়েছে।

গোলমেলে চরিত্র লবঙ্গলতার। তার সম্পর্কে পাঠকের মনস্থির করতে অসুবিধা হয়, তার কারণ কোনো অতল রহস্য বা জটিলতা নয়। লেখক নিজের অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেননি।

৩. সন্ন্যাসীর ব্যাখ্যানে (চতুর্থখণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদে) লেখক এর মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সম্ভাবনা দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন।

লবঙ্গকে যে ক'টি প্রসঙ্গে দেখি– ক. বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি মনোভাবে, খ. অমরনাথ সম্পর্কে, গ. রজনী বিষয়ে, ঘ. শচীন্দ্র-রজনীর বিয়ের বিষয়ে।

সুন্দরী যুবতী নারী বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে বিয়ের ঘটনাকে সচরাচর ভাগ্যের বিধান বলে মেনে নেয়, সতীত্বের আদর্শে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু লবঙ্গ একটু বেশি উচ্ছল সরসতা দেখিয়েছে। লেখকের ভাষায়, ' সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল – দর্পণের মতো দুইজনে দুইজনের মন দেখিতে পাইত।'

তাহাদের প্রেমের পদ্ধতিটা এইরূপ –

'রামসদয় বলিত, 'ললিত লবঙ্গলতাপরিশী–?'

লবঙ্গ। আজ্ঞে ঠাকুরদাদামহাশয়, দাসী হাজির।

রাম। আমি যদি মরি?

লব। 'আমি তোমার বিষয় খাইব।' লবঙ্গ মনে মনে বলিত, 'আমি বিষ খাইব।'

লবঙ্গ মনের সব অভাব সব তৃষ্ণা ঢেকে রাখছে বেশি করে স্বামীপ্রেমে – কতকটা সতীত্বের অহঙ্কারে, কতকটা আত্মছলনায়।

লবঙ্গের সঙ্গে অমরনাথের সম্বন্ধ কোনো সময়েই গাঢ় হয়ে উঠতে পারেনি। অমরনাথের আকর্ষণে প্রথম তারুণ্যের উচ্ছল তীব্রতা ছিল। লবঙ্গের মনোভাব কি ছিল বলা কঠিন। বংশের একটি কলঙ্কের জন্য অমরনাথের সঙ্গে তার সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল, বৃদ্ধ রামসদয়ের সঙ্গে বিয়ে হলো। বিবাহিত জীবনে সে কিভাবে মন মানিয়েছিল সে পরিচয় নেওয়া হয়েছে।

বিবাহ পূর্বে অমরনাথ একদিন লবঙ্গের শয্যাগৃহে প্রবেশ করেছিল। এটা তার নীতি-বিদ্রোহী যৌবনধর্মের নিদর্শন, সস্তা লাম্পট্যের নিশ্চয়ই নয় – ধনবান বুদ্ধিমান অমরনাথ শুদ্ধ কাম-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য অন্য সহজপন্থা নিতে পারত। আসলে লবঙ্গলতাকে সে চিনতে পারেনি। হঠাৎ সে তার সতীত্ব প্রচারে ব্যস্ত হল। প্রণয়ীর (প্রণয়পর্বটা হয়তো প্রাথমিক পর্বেই ছিল) পিঠে লোহা পুড়িয়ে 'চোর' লিখে দিল–অনেক লোকজন ডেকে। এর মধ্যে লবঙ্গের এক ধরনের মনোবিকার – ধর্ষকারী প্রবণতা যেন লক্ষ্য করা যায়। গল্পের শেষে ঔপন্যাসিক লবঙ্গকে দিয়ে অমরনাথকে বলিয়েছিলেন, 'তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে–'

অমরনাথ সম্পর্কে মনের কোথাও এ রকম বা যে কোনো রকম ভাবনার জট থাকলে আমার সিদ্ধান্তটা পাকা হয়। অথচ হঠাৎ বলা এই কথার কোনো বক্র সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাও আগে মেলেনি। এটা লেখকের উত্তর-চিন্তার ফসল। সে জন্যই লবঙ্গের অমরনাথবিষয়ক হৃদয়ভাব বিচ্ছিন্ন নানামুখী কতগুলি অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার টুকরো – তাদের মনস্তাত্ত্বিকের মতো সম্বন্ধ করেননি উপন্যাসকার।

রজনী-বিষয়ে একটা করুণার সস্নেহ ভাব লবঙ্গের ছিল। চটুল সকৌতুক বাক্য, বাইরে কিছু ভর্ৎসনার কঠোরতা, ভিতরে দয়ার্দ্রতা এ জাতীয় সুলভ চারিত্রিক প্যাঁচও

আছে। বঙ্কিমের পরিণত বয়সের লেখায় এসব দেখে খুশি হবার কথা নয়। শচীন্দ্র-বিষয়ে অসম মাতৃস্নেহ ও নিপুণ গৃহিণীপনাও আলোচনার যোগ্য নয়।

রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের বিয়ের ব্যাপারটা কিন্তু বিশুদ্ধ স্বার্থবোধ থেকে এসেছে। নিচ ঘরের অন্ধ রজনী যতই তার স্নেহের পাত্রী হোক, খরচ করে তার বিয়ে দেওয়া যায় গোপালের সঙ্গে। শচীন্দ্রের সঙ্গে বিয়েটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ল সম্পত্তির মালিকানা রক্ষার জন্য। চক্রান্তকারী নারীর ভূমিকায় সে অবতীর্ণ হলো। সন্ন্যাসীর সাহায্যে বশীকরণ-উচাটনাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শচীন্দ্রের মন রজনীমুখী করার চেষ্টা করল, অমরনাথের প্রতি রজনীর মনোভাব ঘুরিয়ে দেবার জন্য তার যৌবনকালের সেই ঘটনা সপ্রমাণ হাজির করতে তার দ্বিধা ছিল না। অমরনাথকে ভয় দেখিয়ে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করল না। লবঙ্গের ভাষায় –

আমি। তুমি কুপাত্র। আমি সুপাত্র জোটাইয়া দিব।

অম। আমি কুপাত্র কিসে?

আমি। কামিজটা খুলিয়া পিঠ বাহির কর দেখি?

অমরনাথের মুখ শুকাইয়া কালো হইয়া গেল। অতি দুঃখিতভাবে বলিল, 'ছি! লবঙ্গ!

আমার দুঃখ হইল, কিন্তু দুঃখ দেখিয়া ভুলিলাম না।

লবঙ্গ আবেগের বশ নয়। সে হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে ব্রতী হয়েছে। অন্যের দুঃখ তার কিছু এসে যায় না, নিজের কৃতকর্মের জন্য তার একটুও সঙ্কোচ নেই বরং গর্ব আছে। তাকে মূলধন করে দোকানদারির চেষ্টা আছে। তাই অমরনাথকে সে যে লোকান্তরের কথা বলতে চেয়েছিল তাদের শেষ সাক্ষাতের সময়ে তার কতটুকু অভিনয় তা ভাবার মতো। সব দাবি ছেড়ে যে নীরবে চলে যায় এটুকু দান তাকে দিতেই হয়। সেও একটা হিসেব, কারণ এতে লবঙ্গের কোনো অসুবিধা নেই – জীবনের স্থিতিতে, সতীত্বের খ্যাতিতে, পারিবারিক সম্পত্তিতে কোথাও ছিদ্র হবে না এতে।

এই রূপসী অতি ক্রূর স্বার্থবশ ও চক্রী – আবেগকে প্রয়োজনে শাসিত বা উৎসাদিত করতে সমর্থ এবং সতীত্বের ফাঁকা গর্বে স্যাডিস্টিক। গোলমেলে এই নারী বঙ্কিমচন্দ্রের একটি অনন্য সৃষ্টি হতে পারত– কিন্তু লবঙ্গ যে এ রকম চরিত্র হয়ে দাঁড়াচ্ছে সে বিষয়ে তাঁর স্রষ্টা সচেতন ছিলেন না। তাহলে মাঝে মাঝে তাকে চিত্তদমী, সতীত্বের যূপে উৎসর্গিত-প্রবৃত্তি এক মনোরমা মানবী ভেবে বিভ্রান্ত হতেন না।

সেখানে রচনাটির বড় ব্যর্থতা।

৯ কৃষ্ণকান্তের উইল
'দুইটা ব্যাঘ্রী, মৃতগাভী'

এক

কৃষ্ণকান্তের উইল নিয়ে বঙ্কিম-সমালোচকেরা উচ্চবাক্। কেউ বলেন, এই তাঁর সেরা উপন্যাস। অনেকে এর মধ্যে লেখকের শিল্পবোধকে নীতির দ্বারা কঠিন ভাবে নির্জিত হতে দেখেছেন। এ সবই ভাবার মতো। কিন্তু গোড়াতেই ইতিহাসের দিক থেকে একটা কথা বলে নেওয়া যাক। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাসের আদর্শ বিষবৃক্ষের পরে কৃষ্ণকান্তের আর এক ধাপ এগিয়েছে। লেখক সরাসরি ব্যাখ্যা করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তাঁর মানুষগুলির মনের প্রকাশ্য ও গোপন নানা প্রবাহ– তাদের সংঘাত, তাদের আত্মীয়তা। তারই সঙ্গে ওতপ্রোত কাহিনী। নাট্যমুহূর্ত পরিহার করা হয়েছে, অথবা প্রশমিত। মন যখন বিদীর্ণ, নেহাত আকস্মিক নয় তা – বাড়ন্ত ফাটলগুলো আগে থেকেই অনুসরণ করা হয়েছে। বিষবৃক্ষের থেকেও লেখক অন্তর্গূঢ় হতে চেয়েছেন–এ গল্পের মানুষেরা নিজের গভীরে অনেক তলিয়ে। নগেন্দ্রের ছিল হরদেব ঘোষাল, সূর্যমুখীর কমলমণি। গোবিন্দলাল-ভ্রমর নিজের মধ্যে একা। নিঃসঙ্গ রোহিণীও।

উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের চিত্তলোকে নামবার আগে রচনাটির দেহের কিছু বিশিষ্টতার উল্লেখ করা যাক –

১. এই বইয়ে কোনো উপকাহিনী নেই। তিনটি নরনারীর জীবন স্বভাবনিয়ন্ত্রিত ভাগ্যের পথে একমুখী পরিণতিতে পৌঁছেছে।

২. উপন্যাসের দুটি খণ্ডে সামঞ্জস্যের কিছু অভাব রয়েছে। প্রথম খণ্ডের একত্রিশ অধ্যায় বইয়ের দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে। সেখানে মনের অবাধ বিশ্লেষণ, বাইরের পৃথিবী ধরা পড়ল চিত্তের জানালায়। জটিল হৃদয়ের পাকে অমোঘ নিয়তি। দ্বিতীয় খণ্ডের পনেরটি অধ্যায় এবং একটি পরিশিষ্ট মিলে বইয়ের এক-তৃতীয়াংশ। লেখক এখানে মনোব্যাখ্যানের দায় এড়িয়েছেন। বহিরঙ্গ ঘটনার উপরে বেশি নির্ভর করায় শিল্পের ক্ষতি হয়েছে।

কৃষ্ণকান্তের উইলের পরিণতি পরিশিষ্ট এবং আগের কিছু অংশ প্রথম বই বেরুবার অনেক পরে বদলে গিয়ে বর্তমান রূপ নিয়েছে। এই বদলে শিল্প আরও মার খেয়েছে।

দুই

কৃষ্ণকান্তের উইল দেখতে-শুনতে অনেকটা বিষবৃক্ষের মতো। মিলগুলি সোজাসুজি চোখে পড়ে। যেমন–

ক. পাত্রপাত্রীদের বিন্যাস ও সম্পর্ক। এক পুরুষ, তার পত্নী ও দ্বিতীয় নারী – এই তিনজনের মন ভাঙাগড়া নিয়ে প্রেমের গল্প।

বিষবৃক্ষের নগেন্দ্রের স্থানে কৃষ্ণকান্তে এল গোবিন্দলাল	
সূর্যমুখী	ভ্রমর
কুন্দ	রোহিণী

দ্বিতীয় রমণী নায়কের পূর্ব্বপরিচিতা কোনো সুন্দরী বিধবা।

খ. ঘটনার দিক থেকে মিল।

১. নায়ক বিবাহিত। সুখী দাম্পত্য জীবন।

২. দ্বিতীয় নারী জীবনে এল নায়কের – তার মানসসঙ্কট।

৩. দ্বিতীয়বার সঙ্গে নায়কের মিলন, পত্নীর সঙ্গে বিচ্ছেদ। মোহভঙ্গ।

৪. দ্বিতীয়বার মৃত্যু।

গ. শিল্পাস্বাদের বিচারে দুটি বইয়েই গাঢ় ট্র্যাজেডি – মূল পাত্রপাত্রী তিনজনের জীবনেই।

ঘ. উভয় ক্ষেত্রেই ঔপন্যাসিকের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল নীতিবাগীশতার অভিযোগ সরব।

কিন্তু দুটি উপন্যাস পড়ে পাঠক দুটি পৃথক জীবন-কাহিনীই পাবে। নানা মাত্রার অমিল এদের মধ্যে। যেমন–

ক. বিষবৃক্ষে শাখায়িত বিস্তার। কৃষ্ণকান্তে একমুখী একাগ্রতা

খ. বিষবৃক্ষে দাম্পত্যজীবনের বিচিত্র রূপের সন্ধান। নায়কের অবৈধ আকর্ষণও বিবাহিত জীবনে রূপান্তরিত। কৃষ্ণকান্তে আদৌ তা নয়।

গ. বিষবৃক্ষে বাইরের পাত্রপাত্রীর ভূমিকা কম নয়। দ্বিতীয়া নারীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত ও সাহায্য করেছে এক খল পাত্রী। কৃষ্ণকান্তে নায়কই ক্রিমিনাল – হত্যাকারী।

ঘ. বিষবৃক্ষে স্বামী-স্ত্রীর আপাতমিলনের মধ্যে গভীর দূরত্ব স্তব্ধ হয়ে আছে। কৃষ্ণকান্তে বিনষ্টি নিষ্করুণ ও নগ্ন – কোনো অন্তরাল নেই।

কিন্তু এসব অমিলেও এদের সম্পূর্ণ পৃথক করে দিতে পারত না। মূলে রয়েছে তিন জোড়া মুখ্য চরিত্রের একান্ত স্বাতন্ত্র্য। নগেন্দ্র-গোবিন্দলালে, সূর্যমুখী-ভ্রমরে, কুন্দ-রোহিণীতে অবস্থানগত মিল, স্বভাবে কিছু নৈকট্য নেই। একে অন্যের জায়গায় বসতে পারত না।

তবুও প্রশ্ন, বঙ্কিম বহিরঙ্গে এতটা সাদৃশ্য কেন রাখলেন তার দুটি প্রধান সামাজিক উপন্যাসে? এ কি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তির ক্ষীণতা?

ক্ষীণতা না হলেও সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই। এবং সে সীমা টেনেছে সমকালের বাঙালির সমাজ জীবন। রাধারাণী প্রায়-রূপকথা, ইন্দিরায় লঘুচাপল্য, রজনীতে নতুন ভঙ্গির নিরীক্ষা। বিষবৃক্ষের পরে নিজ কালের মানুষকে আর গভীরভাবে ভেদ করা গেল

না। অমরনাথের হিতবাদী দার্শনিকতায় শিকড় গজাল না। মুচিরামগুড় খসড়া-নক্সার গণ্ডী ডিঙিয়ে উপন্যাস হয়ে উঠল না। বঙ্কিম রোমান্সে এবং সামাজিক কাহিনীতে কেন আধুনিক জীবনকে খুঁজেছেন প্রেমের মধ্যে, তার কারণ আগে নির্দেশ করেছি। যথার্থ সিরিয়াস দ্বিতীয় সামাজিক উপন্যাস লিখতে গিয়ে দাম্পত্য জীবন অবৈধ প্রেম প্রভৃতির মধ্যেই আবার পথ দেখতে হলো। একই ধাঁচের গল্প ফাঁদতে হলো। আবার অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতার দৌলতেই তা সর্বাংশে পৃথক হয়ে উঠল।

বঙ্কিম কালের বন্ধনকে ব্যবহার করলেন, চরিত্র-ব্যক্তিত্বের দুষ্পবেশ্য মহলে ঢুকবার কাজে, – বাইরে ঘটনা-সন্ধিতে এক হয়েও প্রতিটি মানুষ স্বভাবের অন্দরমহলে কত পৃথক সেই রহস্যের সন্ধানে মুক্তির নাগাল পেতে চাইলেন।

তিন

বিষবৃক্ষ-রজনীতে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-জীবনের ছিঁটেফোঁটা প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া গেছে। সেদিক দিয়েও কৃষ্ণকান্তের উইল নিস্পৃহ। যুগের কোনো বহিরঙ্গ পরিচয়, বিধবাবিবাহ আন্দোলন১ বা ব্রাহ্মদের সমাজ-সংস্কার কিংবা ধ্রুববাদী-হিতবাদী চিন্তার প্রভাব–কাহিনীর কোথাও এসব নেই। কিন্তু বাইরে না থাকলেও শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ উপন্যাসের ভেতরে বাসা বেঁধেছে। বঙ্কিমের সময়কার একান্ত আধুনিক মূল্যবোধ ছাড়া এ গল্প লেখা যেত না। মূলত গোবিন্দলাল এবং অংশত ভ্রমর আধুনিক মানুষ। এবং রোহিণীও। এদের স্বভাবের আসল খবর পরে নেব, যেখানে কাল ছাপ গাঢ় হলেও মনুষ্যত্বের নিবিড় ঐক্য সময়কে ডিঙোয়, এখন শুধু সমকালীনতার কথা বলছি।

গোবিন্দলাল তরুণ জমিদার-নন্দন। কামবিলাসিতা শ্রেণীগতভাবে তার রিক্থ বলে বিবেচিত হতে পারত। রোহিণীর মতো সুন্দরী সহায়হীনা বিধবার পক্ষে তার বাগানবাড়ির নর্মসঙ্গিনী হওয়ায় বিস্ময়ের কিছু ছিল না। সে যুগে ধনাঢ্য ভূস্বামীরা রক্ষিতার সংখ্যা ও সম্পদ নিয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে কোনো সামাজিক ইতিহাসে তার বিস্তর বিবরণ আছে। গোবিন্দলালও শেষপর্যন্ত প্রসাদপুরে রোহিণীকে রক্ষিতা হিসেবে রেখেছে। কিন্তু তার এই মোহ প্রতিক্ষণ তাকে বিদ্ধ করেছে গভীর যন্ত্রণায়, পাপরোধে; ভ্রমরের কাছে নিজেকে সে অপরাধী মনে করেছে। পরিণতিকে শাস্তি বলে বিশ্বাস করেছে। নারী সম্পর্কে পুরুষের সব স্বাধীনতাই যেখানে সমাজ-স্বীকৃত, সে ক্ষেত্রে গোবিন্দলালের নীতিদংশনের উৎসে কাজ করেছে নবকালের প্রেমবোধ, সেখানে পুরুষ ও নারীর সমান স্বাধীনতা, সমান দায়িত্ব। নারীই শুধু অসতী হবার মানসযন্ত্রণার শিকার নয়। পুরুষও নৈতিকতাভ্রষ্ট হবার পাপে চিত্তাভ্যন্তরে তাড়িত হয়। নগেন্দ্রে আধুনিক পুরুষকে যেভাবে দেখেছি গোবিন্দলালে তার অন্য রূপ।

---

১. হরলালের কথায় সামান্য ইঙ্গিত আছে।

ভ্রমর হিন্দুকুলবধূর আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে। সতীত্বের গর্বে সে পাতিব্রত্যকে ধর্ম বলে মানেনি। দুশ্চরিত্র স্বামীকে সে অস্বীকার না করতে পারলেও ভক্তিও করেনি। স্বাধীন বিচারবুদ্ধির প্রয়োগে ভ্রমর স্বীকৃত পারিবারিক রীতিকে ডিঙিয়ে গেছে, মধ্যযুগীয় মূল্যবোধে আস্থা রাখেনি। এবং এখানেই এই চরিত্র-ভাবনার গোড়ায় আধুনিকতা কাজ করেছে।

রোহিণীকে কাহিনীর শেষভাগে সাধারণ রক্ষিতার স্তরে নামিয়ে আনা হলেও গোড়ায় তার স্বভাবমূল্যে সমকালের মন্ত্র কিছু ঢুকে পড়েছিল। বিধবার বিয়ে হতে পারে–হরলাল যে উদ্দেশ্যেই এই কথা বলুক, রোহিণীর কাছে তার জানলা দিয়ে নতুন সময় একটা ব্যক্তিগত রূপ নিয়ে ধরা দিল। বঞ্চিত জীবন-যৌবনের জন্য তার নবজাগ্রত ভাবনা বিষবৃক্ষের হীরার সমজাতীয় নয়। অচরিতার্থ প্রাপ্তি অসম্ভব নয় জেনে আজ সব জমানো তৃষ্ণা ব্যথা হয়ে উঠল।

এভাবে প্রধান তিন নরনারীর চরিত্র-পরিকল্পনায় আধুনিক কাল এসেছে এই বইয়ে–তাকে বাইরে বিবরণের ফ্রেমে আটকে রাখা হয়নি।

চার

বঙ্কিমচন্দ্র রোহিণী-চরিত্রের যে পরিণতি দেখিয়েছেন তা চরিত্রের দিক থেকে অপরিহার্য তো নয়ই, স্বাভাবিকই নয়। এ বিষয়ে বিবেচ্য হলো – নিশাকরের প্রতি রোহিণী যে মনোভাব দেখিয়েছে তা লেখক হঠাৎ এবং দ্রুত আরোপ করেছেন কিনা? গোবিন্দলালের পিস্তলের গোড়া টিপেছে তার নিজের মন, না ঔপন্যাসিকের পাপের শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত? রোহিণীর প্রেমই পাপ, তাই তার জন্য প্রায়শ্চিত্তের এই ব্যবস্থা?

এই সমস্যার প্রথম যে উত্তর আমার যুক্তিতে তো রোহিণীর চরিত্র ব্যাখ্যানে মাত্র পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয়ত, গোবিন্দলালের পরিণতি তার পাপের ফল অথবা স্বভাবের? সেখানেও লেখক মানবচিত্ত-রহস্যের সন্ধানী না নীতিশিক্ষা-দানে আগ্রহী?

তৃতীয়ত, সতীসাধ্বী ভ্রমরের শেষ জীবন কি নৈতিক আদর্শের কোনো দিগ্‌দর্শনী? কোন্ আদর্শের?

এদের চরিত্রালোচনায় যে উত্তরই মিলুক, কয়েকটা সহজ কথা বাইরে থেকেই মনে আসে। যেমন–

এক. সামাজিক-নৈতিক পাপে পুরুষ নারীর ভেদ নেই।

দুই. যন্ত্রণাভোগ ও জীবন-বিপর্যয় নৈতিক পাপ-পুণ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। কাজেই পাপ ও তার ফলভোগ বলে কোনো পরিণতিকে চিহ্নিত করা কঠিন। ভ্রমর তো পাপ করেনি, তার এত কষ্ট কেন? এত যন্ত্রণাক্ষত অকালমৃত্যু? আর পাপী (ধরা যাক পাপী) রোহিণীরও অকালমৃত্যু। গোবিন্দলাল হাতে পিস্তল তুলে রোহিণীকে মেরেছে। গোবিন্দলাল কি পিস্তল না তুলে ভ্রমরকে মারেনি? আর নিজেকে? প্রসাদপুরে গোবিন্দলালের দেরাজে সর্বদা যে গুলি ভরা পিস্তল থাকত তাকে প্রতীকী ঘটনা বলে মনে করি।

পাপপুণ্যের ফলাফল কোনো সরল নৈতিক মানদণ্ডে হিসেব করেছেন বঙ্কিম– খুব গভীর বিশ্লেষণে না গিয়েও তেমন অভিযোগ গোড়াতেই বাতিল করতে হয়।

পাঁচ

কৃষ্ণকান্তের উইলে উপন্যাস হিসেবে কতগুলি বড় মাপের ত্রুটি আছে। সংক্ষেপে সে-গুলির উল্লেখ করা যাক–

১. গোবিন্দলাল-রোহিণীর কিছুকাল ব্যাপী যৌথ জীবনের ও মনের কোনো পরিচয় লেখক দেননি। অথচ তাদের সম্পর্কের ক্রমবিকাশ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে আগে পাওয়া গেছে। গোটা প্রথম খণ্ড জুড়ে পাঠককে যেভাবে অভ্যস্ত করে তোলা হয়েছিল ওদের মনের ভেতর মহলের সব স্পন্দন অনুভব করবার জন্য, সে-কথা লেখক উত্তর খণ্ডে এসে পুরো ভুলে গেলেন। অথচ ঐ সম্পর্কের বদল এবং পরিণতি কাহিনীর মুখ্য সূত্র। দ্বিতীয় খণ্ডে মনোবিশ্লেষণে ওরা দুজন ধরা পড়েনি, তেমনি আবার রোমান্স-সুলভ দু-একটি চকিত নাটকীয় পরিস্থিতিতে ওদের গোপন অন্তরে বাইরে ভেঙেচুরে বেরিয়ে আসেনি। রোহিণী-হত্যার কারণ ভেতর থেকে আসেনি বলে অতিনাটকীয়। গোবিন্দলালের সংলাপ নবকুমারের ভাষার সমজাতীয় নয় – সাজানো বক্তৃতার মতো, আভ্যন্তর নাটকের অভাব ঢাকার চেষ্টা।

বঙ্কিমচন্দ্র পাপের ছবিতে সঙ্কুচিত, তাই এই সংক্ষিপ্ততা – এ রকম অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। পূর্বখণ্ডে ওদের সম্পর্ক-বিকাশ তো পাপেরই অসঙ্কুচিত ব্যাখ্যান। বঙ্কিমচন্দ্রের তাৎপর্যপূর্ণ পাত্রপাত্রী সবাই পাপের ছবি।

২. ভ্রমরের কষ্টভোগ খাঁটি হলেও পুনরুক্তি ও অতিকথনে কিছু দুষ্ট; সরল ও একমুখী বলে আরও বেশি। তার স্বভাবের কোনো দুচ্ছেদ্য গাঁট খোলা-বাঁধার ব্যাপার ছিল না। কিছু সেন্টিমেন্টের উপাদান এসে গিয়েছে।

৩. নিশাকর মানুষটিকে রোহিনী-হত্যার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যক্তিত্বে সে কিছুমাত্র সত্য হয়ে ওঠে না।

৪. মাধবীনাথের কাণ্ডকারখানা চমকপ্রদ গোয়েন্দা গল্পের মতো। রোহিণীর ঠিকানা বের করায়, তার সঙ্গে জামাতার সম্পর্কচ্ছেদ ঘটানোর পরিকল্পনায়, খুনের দায় থেকে গোবিন্দলালকে বাঁচাবার চক্রান্তে তার কর্মতৎপরতাকে অনেকটা ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছে। এর বেশির ভাগ অবান্তর–তার একটুও পূর্বখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত রচনার মেজাজের সঙ্গে মেলে না।

লক্ষ্য করার মতো গণ্ডগোল সবটাই দ্বিতীয়াংশে। এর নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। এমন অনুমানে সব বরাত দেওয়া ঠিক নয় যে নৈতিকতার আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রথমাংশের রূপ স্বাদ ভেঙে তছনছ করে দিলেন।

কারণ যাই হোক ফল কিন্তু এই হল, একটা অসাধারণ উপন্যাস বইয়ের দুই-তৃতীয়াংশজুড়ে গড়ে উঠল, শেষটায় তা ভীষণ পঙ্গু হয়ে গেল।

ছয়

কৃষ্ণকান্তের উইলের মতো জনবিরল উপন্যাস বঙ্কিমের আর নেই। রোহিণী গোবিন্দলাল ভ্রমর এই তিনজনকে নিয়ে গল্প – তিনজনেরই গল্প। প্রথমদিকে কৃষ্ণকান্ত কিছুটা জায়গা দখল করেছিল, ঘটনার এবং গোবিন্দলালের স্বভাবের বিকাশে তার কিছু প্রভাব পড়েছে। হরলাল 'বিধবাবিবাহ' এই একটি মাত্র কথায় সুপ্ত রোহিণীর মনে না-জেনে আগুন জ্বেলেছে। কিন্তু নিজে তারপরেই মুছে গিয়েছে। ব্রহ্মানন্দ, নায়কের মা, দাসদাসীর দল আছে – কারণ থাকতে হয়; তাদের স্বভাব নিয়ে পাঠককে একবারও ভাবানো হয়নি – কিছুক্ষণের জন্যও না।

দ্বিতীয় খণ্ডে মাধবীনাথের চতুর তৎপরতা, নিশাকরের ছলনা ও গানের ওস্তাদকে নিয়ে বিদ্রূপ, রূপা-সোনা বা মিথ্যাসাক্ষী বা পোস্টমাস্টার প্রসঙ্গে কিছু মোটা দাগের রসিকতা আমাদের ব্যস্ত রাখে– কারণ উপন্যাসে পাঠকের অন্য দিকে মন দেবার মতো কিছু আর নেই। মানুষ হিসেবে এরা সরল ও সাধারণ, অনেকেই অপ্রাসঙ্গিক। অন্দর বলে এদের মনে পৃথক কোনো মহল নেই।

মুখ্য পুরুষ আর এক নারী অবশ্য পাঠকের চিত্তকে পুরোই ব্যস্ত রাখার মতো। ভ্রমর যতটা জায়গা জুড়ে আছে তার তুলনায় বেশ সরলই – তবু ভাবনাকে সে মাঝে মাঝে সতর্ক করে।

রোহিণীর পরিচয় দিতে গিয়ে গোড়ায় কয়েকটা কথা বলা হয়েছে – 'রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ-রূপে উছলিয়া পড়িতেছিল – শরতের চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল; কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, পানও বুঝি খাইত। এদিকে রন্ধনে সে দ্রৌপদীবিশেষ বলিলে হয়, – আবার আলপনা, খয়েরের গহনা, ফুলের খেলনা, সুচের কাজে তুলনারহিত। চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে, পাড়ার একমাত্র অবলম্বন।'

এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার দুটি প্রান্ত। এক। যুবতী স্ত্রীলোকের বাস্তব জীবনের বিচিত্র কর্মে নিপুণ প্রশংসিত ও রুচিশীল পূর্ণতার মধ্যে তার শূন্য হৃদয়ের অবস্থান। সহজ বাসনামুখী চিত্তপ্রবণতা মেনে নেয়নি বৈধব্যের বৈরাগ্য। দুই। তার উচ্ছল যৌবনসমৃদ্ধ রূপ। এখানে রোহিণীর দেহসৌন্দর্যের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। আরও ছবি আছে অন্যত্র। কিছু উদ্ধৃতি–

১. 'রোহিণীর কলসী ভারী চাল-চলনও ভারী। ...চলনের দোলনে, ধীরে ধীরে গা দোলাইয়া কলসী নাচিতেছে – যেমন তরঙ্গে তরঙ্গে হংসী নাচে, সেইরূপ ধীরে ধীরে গা দোলইয়া কলসী নাচিতেছে। ... হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মতো, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে...।'

'কলসী' 'তরঙ্গ' 'হংসী' 'পালভরা জাহাজে'র চিত্রানুষঙ্গ এবং 'দোলন' 'হেলিয়া' 'ঠমক' শব্দগুলির ধ্বনি ও ভাব ইন্দ্রিয়-বিহ্বলকারী – সেক্সি।

২. ক. 'চারুনির্মিতা কাল ভুজঙ্গিনীতুল্যা কুণ্ডলীকৃতা লোলায়মানা মনোমোহিনী কবরী।'

খ. 'রোহিণী একবার আপনার তরঙ্গক্ষুব্ধ কৃষ্ণতড়াগতুল্য কেশদাম প্রতি দৃষ্টি করিল।'

গ. 'বিশাল দীর্ঘ বিলম্বিত ঘোরকৃষ্ণ কেশরাশি জলে ঋজু – তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘে যেন জলবৃষ্টি করিতেছে।'

চুলের এই বিশিষ্ট রূপেও কামোদ্দীপনা, যেমন 'সুধাপরিপূর্ণ মদনমদোন্মাদহলাহল কলসীতুল্য রাঙা' মধুর বা 'ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে'ও ঐ একই ভাব স্ফুরিত। এর সঙ্গে মিলেছে তার চোখ-ধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য – 'সরোবর পথ আলো করিয়া' চলা, কিংবা জলতলে অচেতন শায়িত দেহেও স্বর্ণজ্যোতি-বিকীরণ– 'স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈম প্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে।'

রূপসী রোহিণী রূপ সম্বন্ধে সচেতন, গুণ-যোগ্যতা সম্বন্ধেও, ভাগ্যের বঞ্চনায় বিক্ষুব্ধ ('যাহারা এ জীবনের সকল সুখে সুখী – মনে কর, ঐ গোবিন্দলাল বাবুর স্ত্রী – তাহারা আমার অপেক্ষা কোন্ গুণে গুণবতী – কোন্ পুণ্যফলে তাহাদের কপালে এ সুখ –আমার কপাল শূন্য?') সে বিক্ষোভ কিঞ্চিৎ প্রকাশিত তার ইয়ৎ প্রগল্‌ভ আচরণে, বৈধব্যের নীতি-নিয়মের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের অনিচ্ছায়। এটুকুই তার নিরুপায় বিদ্রোহ। কিন্তু ভেতরে জমা থাকে বিরূপতা, যদিও গতানুগতিক জীবন ধারায় তাতে তাপ থাকে না।

হরলাল ইঙ্গিতে তাকে বিধবা-বিয়ের লোভ দেখালে তার মনের গভীরে মুহূর্তে আগুন ধরে যায়। হরলালের অসদুদ্দেশ্য সে জানে, তাকে ঠিক বিশ্বাসও করে না। কিন্তু মরুভূমির তৃষ্ণা তার, যে কোনো পাত্রে যে কোনো পানীয় দিয়ে তা মেটাতে চায়। কোনো মূল্য দিতে তার দ্বিধা নেই। ফলে চুরি করে জাল উইল বদলে কৃষ্ণকান্তের আসল উইল সে নিয়ে আসে। এই ঘটনা রোহিণী চরিত্রের প্রথম ধাপকে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য দান করেছে ভোগে ও বাসনায় পূর্ণ পৃথিবীর অধিকার পেতে কোনো মূল্য দিতে তার নৈতিকতায় বাধা নেই, কোনোরূপ দুঃসাহসী কর্মতৎপরতায় তার ভয় নেই।

বঞ্চিতা বালবিধবার প্রতি কিছু পরেই লেখক পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন। 'রোহিণীকে অনেক দোষ – তার কান্না দেখে কাঁদিতে ইচ্ছা করে কি? করে না। কিন্তু অত বিচারে কাজ নাই। – পরের কান্না দেখিলেই কাঁদা ভালো। দেবতার মেঘ কণ্টকক্ষেত্র দেখিয়া বৃষ্টি সম্বরণ করিতে পারে না।'

শিল্পীর নিরপেক্ষ মানবিক মমতা, যা না থাকলে কোনো চরিত্রের ভেতরে ঢোকা যায় না, তাকে সত্য করে গড়া যায় না, তারই নাম 'দেবতার মেঘ'। পাঠকের মনের এক প্রান্ত তাতে ভিজে না গেলে 'একটা নষ্ট মেয়েছেলে' বলে এ চরিত্রে বাতিল হয়ে যেত। আবার এই মমতার দৃষ্টিকোণে গোবিন্দলাল এক দুচ্ছেদ্য জালে জড়িয়েছে। সে কথা নায়ক প্রসঙ্গে ভাবা যাবে।

আপাতত রোহিণীর প্রতি লেখকের নির্মম মমত্ব এবং পাঠকের সহানুভূতির এই সংযোগকে একটু সতর্কভাবে লক্ষ্য করা যাক। রোহিণী চরিত্রে পাপ নেই – তার প্রতি

আদ্যন্ত শুধু সকরুণ থাকবে লেখক এবং পাঠক, – এরকম মোটা মাপের ধারণা পোষণ করার হেতু নেই। সহানুভূতির পাত্রী বলেই তাকে অপাপবিদ্ধ কল্যাণী হতে হবে এরকম শর্ত নেই। সে শুধু বিমুখ ভাগ্যের শিকারই নয়। তার স্বভাবের মূলে তৃষ্ণা ক্ষোভ দুঃসাহসী দৃঢ়তা তৎপরতা চক্রান্তকুশলতা জয়ের বাসনা প্রতিহিংসা বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা নীতিহীনতানিষ্ঠার অভাব ও মধুর প্রণয়াকুতির সম্ভাবনা ছিল – এগুলি নানা প্রসঙ্গ ও পরিস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে, বিকশিত হয়েছে। অসহায় দুর্বল যে মানুষ ভাগ্যের হাতে আহত তার প্রতি মমত্ব-বর্ষণ সহজ, কিন্তু রোহিণীর মতো রূপসী-গুণবতী বৈধব্যরীতি-ভঙ্গকারী প্রগল্‌ভা নারীর প্রতিও সহানুভূতির দৃষ্টিপাত – এখানেই বঙ্কিমের কৃতিত্ব। শরৎচন্দ্রে রাজলক্ষ্মী বা সাবিত্রী বা অচলা মূলত ভালো, মন্দের অনেকটা সমাজ বা পরিস্থিতির চাপিয়ে দেওয়া। রোহিণী কতটা ভালো কতটা মন্দ বলা কঠিন–সহানুভূতি ব্যাপারটাই এখানে স্বতন্ত্র ধাঁচের। এ কারণে অভিযোগ করা চলবে না, লেখক যে মমত্বে তাকে গড়তে শুরু করেছিলেন তা শেষে প্রত্যাহার করে নেন।

একটু আগে রোহিণীর চরিত্র-লক্ষণ বলে কয়েকটি সাধারণ মানবিক ধর্মের উল্লেখ করেছি। যেমন–

তৃষ্ণা ও ক্ষো।। '... কি অপরাধে এ বালবৈধব্য আমার অদৃষ্টে ঘটিল? আমি অন্যের অপেক্ষা একট কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি যে, আমি এ পৃথিবীর কোনো সুখ ভোগ করিতে পারিলাম না, কোন্ দোষে আমাকে এ রূপযৌবন থাকিতে কেবল শুষ্ক কাষ্ঠের মতো ইহজীবন কাটাইতে হইল?'

দুঃসাহসী তৎপরতা ও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা।। বারবার উইল চুরি, উইল বদল। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লেও চতুরতা ও কুশলতার অভাব ছিল না।

চক্রান্তকুশলতা।। উইল বদলের কৌশল, ভ্রমরের কাছে শাড়ি গয়না পাবার কাহিনী বানিয়ে বলা।

জয়ের বাসনা।। ভাগ্যের ও সমাজের দ্বারা বঞ্চিত বলে আপনার রূপ গুণের শক্তিতে আস্থা, গোবিন্দলালের সংস্রবে প্রেমের সঙ্গে জয়ের দীপ্ত বাসনাকে যুক্ত করেছিল।

প্রতিহিংসা।। কাপড়-গয়না দেবার ঘটনা শুনে 'রোহিণী ভাবিল ভ্রমর আমাকে বড় জ্বালাইল। সেদিন চোর অপবাদ, আজ আবার এই অপবাদ। এ দেশে আর আমি থাকিব না। কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।'

দৃঢ়তা।। উইলের ব্যাপারে ধরা পড়েও সে কিন্তু হরলালের নাম করেনি। অনেক ভয় দেখিয়েও তার মুখ থেকে কথা বের করা যায়নি।

প্রণয়-মাধুর্য।। গোবিন্দলালের প্রতি তার ক্রমবিকশিত ভালোবাসায় এবং আত্মহত্যার আন্তরিক চেষ্টায় এর প্রমাণ রয়েছে।

নীতিহীনতা।। প্রয়োজন হলেই মিথ্যাচার, চৌর্য প্রভৃতিতে তার নিদর্শন।

নিষ্ঠার অভাব।। নিশাকরের প্রতি ব্যবহার স্মরণ করা যায়।

এই ভাবে কতগুলি মানবিক স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের যোগফল হিসেবে রোহিণীকে দেখা যেতে পারে। কিন্তু এ ধরনের বিশ্লেষণও শেষ পর্যন্ত অর্থহীন। কারণ তার চরিত্র ঐ লক্ষণগুলির নানা আনুপাতিক মিশ্রণের রাসায়নিক ফল – শুধু তা-ই নয়, পূর্বোক্ত ঐ অনুপাত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তথা ক্রমবিকাশের সূত্রে প্রায়ই সুস্থির থাকেনি, বদলে গিয়েছে। রোহিণীকে তাই আর একটু ভিন্ন ভাবে দেখা যাক।

কিছু পেতে বা হতে ক-জন চায়? বরং ভালো নিজের প্রত্যহে থাকা–ভালো সুখ-দুঃখের বৃত্তে অভ্যাসে-আলস্যে-মেশানো সুপরিচয়। রোহিণী আসলে জীবনে কিছু চেয়েছিল, তার জন্য চেষ্টা করেছিল, কষ্ট পেয়েছিল। আর এ চাওয়াও সর্বদা সুনির্দিষ্ট ছিল না, কি চেয়েছে প্রায়ই তা নিজে জানেনি।

রোহিণীর জীবনের তিনটি পর্যায়ে তিন পুরুষ। এদের নিয়ে তার মনের কাজ অনেকটা নিচের নক্সার আদলে।

বীজ স্বল্পস্থায়ী	প্রথম পুরুষ হরলাল বাসনা – বিয়ে-করা জীবন (বিধবা-বিয়ের সম্ভাবনা) ফল – ব্যর্থতা ভবিষ্যতের জন্য – কামনার জাগরণ
কাণ্ড-শাখা-পত্র-পুষ্প ইত্যাদি	দ্বিতীয় পুরুষ গোবিন্দলাল বাসনা – প্রেম। কিভাবে তাকে পেতে চেয়েছিল? ফল – ক. প্রেম খ. রক্ষিতারূপে পাওয়া ভবিষ্যতের জন্য – এ নয়, অন্য কিছু
ফল। ক্ষণস্থায়ী	তৃতীয় পুরুষ নিশাকর বাসনা – রক্ষিতার জীবন থেকে মুক্তি? কোথায়? ফল – খুন হলো।

হরলাল যদি রোহিণীর কাছে বিধবা-বিয়ের সম্ভাবনার ইঙ্গিত না দিত, তার প্রত্যহ অবিচল থাকত। অতি তুচ্ছ ও অস্পষ্ট আশায় সে যে এত দ্রুত এত প্রচণ্ড ভাবে জ্বলে উঠল তার ভেতরে অনেক বারুদ ঠাসা ছিল বলে। অতি বুদ্ধিমতী এই নারী হরলালকে কখনও বিশ্বাস করেনি। চুরি করা উইল তার হাতে তুলে দেয়নি–হাতে হাতে দাম চেয়েছে–বিধবা-বিবাহ। হরলালকে না পেয়ে সে কাতর হয়নি, চুরি করেছিল বলে বিবেকদংশনে বিক্ষত হয়নি, পাপও করল মূল্যও পেল না, এটাই পাপের ফল – এই সিদ্ধান্ত করে নিজেকে ধিক্কারও দেয়নি, অন্তরে লুকোনো বাসনা তার নিজের কাছেই প্রকাশ হয়ে পড়ল। নিজের অচরিতার্থ ক্ষুধা এই প্রথম সে অনুভব করল, তা মিটবার নয় এ সত্য নিশ্চিত জানল। রোহিণীর সেই অনুভূতি, জানার সে দুঃখ বঙ্কিমচন্দ্র

মনোরম করে এঁকেছেন। 'দেখ এখনও রোহিণী, ঘাটে বসিয়া কপালে হাত দিয়া কাঁদিতেছে – শূন্য কলসী জলের উপকর বাতাসে নাচিতেছে। শেষে সূর্য অস্ত গেলেন, ক্রমে সরোবরের নীল জলে কালো ছায়া পড়িল – শেষে অন্ধকার হইয়া আসিল। পাখী সকল উড়িয়া গিয়া গাছে বসিতে লাগিল। গোরু সকল গৃহাভিমুখে ফিরিল। তখন চন্দ্র উঠিল। – অন্ধকারের উপর মৃদু আলো ফুটিল। তখনও রোহিণী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছে – তাহার কলসী তখনও জলে ভাসিতেছে।'

রোহিণী এবং তার কলসী মাঝে মাঝে একাকার এবং নিঃসন্দেহে এ কলসী সেক্স-সিম্বলও হয়ে উঠেছে প্রায়ই। ঔপন্যাসিকের সতর্কতা এবং সচেতনতার নিদর্শন।

সে যাই হোক রোহিণীর বাসনা, বেদনায় (এবং স্বভাবতই তার মধ্যে বাস্তব সম্ভাবনা না থাকলেও) জন্ম নেয় যে রোমান্টিক স্বপ্ন তা একটি ব্যক্তি-মানুষের আশ্রয় পেল। গোবিন্দলাল হঠাৎ রোহিণীর দুঃখে – কি সে দুঃখ না জেনে, সমবেদনা প্রকাশ করে বসল। শুধু একটু মমতা, সস্নেহ মধুর বাক্য – হতেই পারত দয়ার্দ্র উদারচেতা জমিদার-তনয়ের সাশ্রুনেত্র নারীর প্রতি করুণামাত্র–কিন্তু রোহিণীর শূন্য নিরাবয়ব স্বপ্ন একটি পুরুষের রূপ পেয়ে গেল, যাকে মনে মনে অকারণে ভেঙে গড়ে সুখ দুঃখ পাওয়া যায়– অর্থহীন ভিত্তিহীন তবুও মিথ্যা করে নিভৃতে কল্পনা করার মতো অতি সামান্য একটু পুঁজি। একটুখানি বিবরণে বর্ণনায় বঙ্কিম তাকে ধরে দিলেন। 'রোহিণী জলে ঝাঁপ দিয়া কলসী ধরিয়া তাহাতে জল পুরিল – কলসী তখন বক্-বক্-গল্-গল্ করিয়া বিস্তর আপত্তি করিল। আমি জানি শূন্য কলসীতে জল পুরিতে গেলে কলসী, কি মৃৎ কলসী, কি মনুষ্যকলসী এই রূপ আপত্তি করিয়া থাকে – বড় গণ্ডগোল করে। পরে অন্তঃশূন্য কলসী পূর্ণতোয়া হইলে রোহিণী ঘাটে উঠিয়া আর্দ্রবস্ত্রে দেহ সুচারু রূপে সমাচ্ছদিত করিয়া, ধীরে ধীরে ঘরে যাইতে লাগিল। তখন চলৎ ছলৎ ঠনাক্। ঝিনিক্ ঠিনিক ঠিন্। বলিয়া কলসীতে আর কলসীর জলেতে আর রোহিণীর বালাতে কথোপকথন হইতে লাগিল।'

বঙ্কিমের এই কৌতুকমিশ্র ভাষাকে আরও সহজ করে বলা যায়, রোহিণীর হৃদয় মাত্র উচ্ছলিত করে কেউ মাধুরী দান করে গেল, যদিও দাতা তখন তার মূল্যের পরিমাণ জানেনি। ফলে নারীর অঙ্গে অঙ্গে বাঁশি বেজে উঠল, যে নারী অকারণে সন্ধ্যার অন্ধকারে সুচারুরূপে আর্দ্রবস্ত্রে দেহ সমাচ্ছাদিত করল তার কাছে 'আজ মঝু দেহ ভেল দেহা।' এবং সে ধীরে ধীরে ঘরে যেতে পারল – লাগল প্রতিটি মুহূর্তকে প্রাণ ভরে সম্ভোগ করতে।

এই সেই রোহিণী সপ্তম পরিচ্ছেদের আরম্ভেই লেখক যার সম্বন্ধে বলেছিলেন, রোহিণী লোক ভালো নয়, তার অনেক দোষ।

নবম পরিচ্ছেদে লেখক সরাসরি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কোনো নতুন ঘটনার উত্তেজনা ছাড়া, মনের গভীরে কল্পনায় এবং বাস্তবে বারবার দূর থেকে তাকে দেখার ফলে, আবাল্য-পরিচিত গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণী কিভাবে প্রণায়সক্ত হল – গোবিন্দলালের মনে তার কোথাও স্থান নেই একথা নিশ্চিত জেনেও। রোহিণীর প্রেম শুধু নিজ হৃদয়ে – প্রেমের সুখ প্রেমের যন্ত্রণা। গোবিন্দলালের মন চলেছে তার নিজের

গূঢ় এষণার স্বতন্ত্র পথে। কিন্তু রোহিণী নিভৃত অন্তরে স্বপ্নে-মোহে মৌন ও বেদনার্ত থাকার পাত্রী নয়। তার মন ঝড়ের বেগে চলে। দুঃসাহস তাকে কর্মতৎপর করে। রোহিণী গোবিন্দলালের স্বার্থে চুরি করে উইল বদল করতে গেল এবং ধরা পড়ল। তার মনের নবীন ভাবাব্যাকুলতা তাকে কি একটু বেপথু করে তুলেছিল? তার নিপুণ কৌশল আর সতর্কতায় কি একটু চিড় ধরেছিল?

কিন্তু চোর হয়ে ধরা পড়ার লজ্জা ও লাঞ্ছনার মধ্যে গোবিন্দলাল দেখা দিল পরিত্রাতারূপে, শুধু দয়া করে উদ্ধার করছে না–তাকে নির্দোষ বলে বিশ্বাস করতে চাইছে। কেন চাইছে রোহিণী জানে না, কিন্তু এটুকুতে তার পরিপূর্ণ হৃদয় উদ্বেল হল, সে গোবিন্দলালের কাছে আত্মপ্রকাশ করে ফেলল– 'যাহা আমি ইহজন্মে কখনও পাই নাই – যাহা ইহজন্মে আর কখনও পাইব না – আপনি আমাকে তাহা দিয়াছিলেন।'

গো। কি সে রোহিণী?

রো। সেই বারুণী পুকুরের তীরে, মনে করুন।

গো। কি রোহিণী?

রো। কি? ইহজন্মে আমি বলিতে পারিব না – কি। আর কিছু বলিবেন না। এ রোগের চিকিৎসা নাই – আমার মুক্তি নাই। আমি বিষ পাইলে খাইতাম। ... একবার ছাড়িয়ে দিন কাঁদিয়া আসি।

অথবা এই সুযোগে গোবিন্দলালের কাছে সে আত্মনিবেদন করল।

গোপন হৃদয় প্রকাশ হয়ে পড়া বড় ভয়ানক। দুজনের পক্ষেই। নায়কের কথা পরে ভাবা যাবে। রোহিণীর এই আত্মপ্রকাশ তার সুখ-দুঃখকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিল – প্রিয় পুরুষের কাছে প্রণয়-জ্ঞাপনের সুখ, তার চিত্ত কোনো দিন পাওয়া যাবে না বলে দুঃখ, আরও বেশি দুঃখ অপ্রাপণীয় হৃদয়ের কাছে আত্মপ্রকাশের লজ্জায়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে রোহিণীর অনুভূতিকে যেভাবে লেখক প্রকাশ করেছেন তাতে তীব্র চিত্তদহনের, কিঞ্চিৎ আত্মসংযম-চেষ্টার এবং গাঢ় প্রবল আসক্তির যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাতে উচ্চাঙ্গের ট্র্যাজিক শিল্পের লক্ষণ আছে।[২]

ভ্রমরের কথায় নয়, এই অসহ্য যন্ত্রণায় রোহিণী শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে বারুণী পুকুরে ডুব দিল।

রোহিণী মরল না, গোবিন্দলাল তাকে বাঁচাল, আরও গভীরভাবে প্রতিমুহূর্তে মারবার জন্য। রোহিণী বেঁচে উঠে গোবিন্দলালাক অতি তীব্র ভাষায় প্রেম নিবেদন করল – যার মধ্যে প্রিয়কে জয়ের সুপ্ত ইচ্ছা কাজ করেছে। অথবা শুধুই নিজের মনোকষ্টের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। 'চিরকাল ধরিয়া, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে, রাত্রিদিন মরার অপেক্ষা একেবারে মরা ভাল। ...রাত্রিদিন দারুণ তৃষা, হৃদয় পুড়িতেছে – সম্মুখেই শীতল জল, কিন্তু ইহজন্মে সে জল স্পর্শ করিতে পারিব না। আশাও নাই।'

২. পাঠক প্রথম খণ্ডে চতুর্দশ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয়-তৃতীয়-চতুর্থ অনুচ্ছেদ পড়ে দেখতে পারেন।

রোহিণী কি চেয়েছিল? গোবিন্দলাল তাকে বিধবা-বিয়ে করুক? না, তার সম্ভাবনাও ছিল না। তবে কি গোবিন্দলাল তাকে রক্ষিতা হিসেবে রাখুক? অবশ্যই নয়। নিজেকে সাধারণীর স্তরে অবনমিত করার প্রশ্নও তার মনে আসার কথা নয়, তেমনি অতি সচ্চরিত্র গোবিন্দলালের পক্ষে এরূপ পতন আদৌ সম্ভব ছিল না – সে জানত। বাস্তব সংসারে আর কি চাওয়া যায়? শুধু গোবিন্দলালের হৃদয়ের প্রেম ছাড়া অন্য কিছু?

আজও গোবিন্দলালের মন তার কাছে সত্য নয়। মমতা, কিছু করুণা, বিপদে উদ্ধার, এমন কি প্রাণরক্ষা খুব বড় ব্যাপার। কিন্তু প্রেম? রোহিণী চুরি করেছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, বিধবার ধর্ম বিসর্জন দিয়েছে, আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে, কিন্তু গোবিন্দলালের হৃদয় পায়নি। নিজের সুনাম ধর্ম প্রাণের মতো চারপাশের সব সাজানো ব্যাপার যদি সে প্রচণ্ড আঘাত করে ভেঙে দিতে পারত। গ্রামে গোবিন্দলালকে জড়িয়ে যখন মিথ্যা কুৎসা ছড়িয়ে পড়ল তখন সেও মিথ্যা করেই ভ্রমরের কাছে গিয়ে গোবিন্দলালের উপহার বলে কতগুলি গয়না-কাপড় দেখিয়ে এল। তার এই কাজ দুষ্টমতি নারীর মিথ্যাচার মাত্র নয়, এর উৎসে অনেকগুলি বৃত্তির জট আছে। যেমন– ১. গোবিন্দলালের কাছ থেকে প্রণয়োপহার লাভ তার স্বপ্নের – পরম আশার রমণীয় প্রাপ্তি হতে পারত – কিন্তু তা অলীক, গ্রামীণ মানুষের কুৎসিত কটাক্ষে মাত্র পরিণত। ২. নিজেও সে শরিক হতে চাইল সেই কুৎসার–সব সুনাম পুরোপুরি কলঙ্কে ডুবে যাক – এই ভাবনাই প্রবল। ৩. যে প্রেম সত্যই মেলেনি, সেই প্রেমলাভের মিথ্যা গর্বে স্ফীত হওয়া যাক, হোক তা ক্ষণস্থায়ী। ৪. ভ্রমরের মনে জ্বালা ধরিয়া দেওয়া–গোবিন্দলালকে যে পেয়েছে তার মনের সুখ ভাঙুক – একদিকে সব সুখ, অন্যদিকে সব কষ্ট থাকে কেন?

তারপর যেদিন সে গোবিন্দলালের মন জানল, তাদের গোপন সম্পর্ক স্থাপিত হল, দুই যুবক-যুবতী রূপে-দেহে নেশাগ্রস্ত হয়ে উঠল – রোহিণীর মনের তখনকার খবর মেলে না। রোহিণী গোবিন্দলালের প্রেম পেল, পাপদষ্ট হলেও প্রেমই।

এর পরে প্রসাদপুরে। লেখক মুখে বলুন কি না – রোহিণী গোবিন্দলালের রক্ষিতা হিসেবেই রইল। তাদের সে যৌথ জীবনে (কি ভাবে পাঠক জানে না) অনুমান কোনো বিশেষ ঘটনা ছাড়াই ক্রমে প্রেম বিনষ্ট হলো। রোহিণী গোবিন্দলালের ভালোবাসা চেয়েছিল, পেয়েছিল; গোবিন্দলালকে চেয়েছিল, পেয়েছিল। তার রক্ষিতা হতে চেয়েছিল কি? এই জীবনে তার কতটা ক্ষোভ জমে উঠেছিল লেখক জানাতে দ্বিধা করেছেন – কিন্তু ভেবে নেওয়া অসম্ভব নয়। নিশাকরের প্রতি তার আগ্রহের কারণ কি, স্বরূপ কি, সে কি গোবিন্দলালের অপ্রেম থেকে মুক্তির কথা ভেবেছিল? অথবা নিশাকরের সঙ্গে দুঃসাহসী আলাপ তার এক ধরনের বিদ্রোহ? যে রোহিণীকে নানাভাবে আমরা আগে চিনেছিলাম, এই সব সম্ভাবনাগুলি তার সঙ্গে অসঙ্গত নয় – কিন্তু অসঙ্গত এমন সিদ্ধান্ত যে সাধারণ বারাঙ্গনার মতো বহুচারিতা তার ব্যসন হয়ে উঠেছিল।

রোহিণীর অপঘাথ মৃত্যুর চারিত্রিক দায় গোবিন্দলালের, রোহিণীর দিক থেকে তা সত্য হয়ে ওঠার সুযোগ পেল না লেখার ত্রুটিতে।[৩]

৩. লেখক যে শেষদিকে রোহিনী বিষয়ে একেবারে মনস্থির করতে পারছেন না তা নিদর্শন– 'মরিব কেন? না হয় ইনি ত্যাগ করেন করুন' ইত্যাদি। (দ্বিতীয় খণ্ড। নবম পরিচ্ছেদ)

গোবিন্দলাল নগেন্দ্রনাথ নয়। নগেন্দ্রনাথের সুন্দরী স্ত্রী ছিল, তবু সে অন্য নারীতে আকৃষ্ট হয়েছিল। গোবিন্দলালের স্ত্রী ভ্রমর দেখতে হলো ছিল না। তার প্রচণ্ড রূপতৃষ্ণা ছিল। তাই তার পদস্খলন। এরকম সহজ কারণ দেখানো যায়। নগেন্দ্রনাথের চ্যুতির কারণ অনেক গভীরে, কারণ কোনো অভাবে তার উৎস নয়। এ ভাবে তুলনা করে লাভ নেই, বিচারটা অন্তর্ভেদী নয় বলে। নগেন্দ্রনাথও এক ধরনের অভাববোধ থেকেই অপরায় আসক্ত হয়েছিল। সেটা জাতে স্বতন্ত্র – অতৃপ্তির অভাব। প্রাপ্তি থেকে অপ্রাপ্তিতে, পূর্ণতা থেকে অপূর্ণতায় তার মন যেতে চেয়েছে, জীবনও। মানবচিত্তের এ এক আশ্চর্য রহস্য। গোবিন্দলালের কামনা স্বতন্ত্র; অতি প্রগল্‌ভ রূপের উদ্দাম মোহ অস্ফুট রোমান্টিক ব্যাকুলতা থেকে জাতে অন্য, গভীরতায় ন্যূন নয়। – কারণ নগেন্দ্রনাথের তুলনায় তার যন্ত্রণা কোথাও ফিকে নয়। আত্মিক অবক্ষয় কম নয়। আসলে রূপের জন্য তৃষ্ণা– খুব সহজ একটা কথা, তার একটা ব্যক্তিক চেহারা আছে। কুন্দের কিশোরী রূপে অপরিচয়ের রোমান্টিক সুর ছিল, রোহিণীর রূপ আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল গোবিন্দলালের স্নায়ুকোষে।

রোহিণীর রূপ প্রসঙ্গে আগে কিছু বলা হয়েছে। তা মূলত গোবিন্দলালের মনে চোখ-রেখে দেখা। কামোদ্দীপক যে সৌন্দর্য বিষয় কবিরা বলেন 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা নাচে রক্তধারা।' এতদিন রক্ত নেচে ওঠে নি কেন? তার উত্তর নেই। সম্ভবত বেদনা ও মমত্বের আড়াল তৈরি হয়নি বলেই ভদ্রলোক গোবিন্দলাল – বিবাহিত এবং পত্নীপ্রেমিক গোবিন্দলাল রোহিণীকে মনের চোখে দেখেনি, দেখতে চায়নি। আজ তাকে কাঁদতে গোবিন্দলাল করুণাবোধ করল। আসলে করুণার ছলনায় সেই নারীরূপের দিকে অগ্নিবিভুক্ষু পতঙ্গের মতো ধাবিত হলো।

গোবিন্দলালের অবচেতনাশ্রয়ী রূপমোহের তীব্রতা এবং স্পষ্ট উদার ভাবনা ('এও সেই জগৎপিতার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ – আমিও সেই তাঁহার প্রেরিত সংসারপতঙ্গ; অতএব এও আমার ভগিনী। যদি ইহার দুঃখ নিবারণ করিতে পারি–তবে কেন করিব না?') যে সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছিল তা দ্রুত নতুন বাঁক নিল। আরও কিছু জটিল হয়ে উঠল। উইল চুরির দায় থেকে রোহিণীকে বাঁচাতে গিয়ে সে স্পষ্টই জানল রোহিণীর মনের কথা। যদি নিজের মনকে সে তখনও জানেনি। লেখকের সুচতুর বর্ণনা উদ্ধার করা যাক। 'বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাহার আহ্লাদ হইল না – রাগও হইল না – সমুদ্রবৎ যে হৃদয় তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল।'

গোবিন্দলাল এখনও দয়ার আবরণটি ধরে রাখছে – ঐ তার নগ্ন হৃদয়ের একমাত্র ভদ্র আড়াল। সে এর ভবিষ্যৎ ভেবে ভেতরে ভীষণ ভীত হলো, নিজে তা বুঝল না – বলল রোহিণীর ভালোর জন্যই তাদের দুজনের আর দেখা না-হওয়া উচিত। আসলে তার নিজের ভালোর জন্যই। সে জানেনি চিত্তের গভীরে প্রতিরোধ ধ্বসে পড়ছিল।

ভ্রমরের কাছে একদিন সে কৌতুক করে বলেছিল যে রোহিণীকে সে ভালোবাসে। (গো। আমারও পোড়ার মুখ যা করতে নাই, তাই করি। রোহিণীকে ভালোবাসি।)

একটু পরেই অবশ্য সে বলেছে, 'মিছে কথাই ভোমরা। আমি রোহিণীকে ভালোবাসি না, রোহিণী আমায় ভালোবাসে,' তার পক্ষে রোহিণীকে ভালোবাসা অসম্ভব – এ নিয়ে শুধু ঠাট্টাই করা যায়। কিন্তু এ কি ঠাট্টা? সুরে কৌতুক ছিল না, গাঢ় বিষণ্ণতা ছিল। নিজেকে বোঝানো – না এ অসম্ভব, – তার রোহিণীকে ভালোবাসা। সে একনিষ্ঠ স্বামী, সচ্চরিত্র পুরুষ, রোহিণী তাকে ভালোবাসুক, সে বাসবে না – বাসতে পারে না। অন্য ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে তার মনের যুদ্ধ।

এই প্রবল সৎগ্রামই বলে দেয় বাঁধ পুরো ভাঙছে, আর দেরি নেই।

তারপরে সাড়ম্বরে আত্মপ্রকাশ করল সব। অন্তরাল বিধ্বস্ত করে নির্মম সত্য। কি সে প্রকাশ। অনুপম লাবণ্যময়ী নারীর ওষ্টাধর ওষ্ঠাধরে রেখে তাকে অমর কামনার সর্বনাশে জাগিয়ে তোলা এবং অবচেতনার অতল থেকে জেগে-ওঠা। 'তখন গোবিন্দলাল সেই বিজন কক্ষমধ্যে সহসা ভূপতিত হইয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া, দরবিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন, হা নাথ ! নাথ ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর !'

গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রাম থেকে দূরে জমিদারীর কাজে নিজেকে লিপ্ত করে আত্মজয় করার ব্যর্থ সাধনা করতে চলে গেল – ভ্রমরের আশ্রয়ে নয়, ব্যক্তিত্বের শক্তিতে নয়। রোহিণীর রূপের তাপ পৌঁছয় না এমন দূরত্বে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করা যায় না, এ চেষ্টা যেমন বাইরের, বিফলও হলো বাইরের ঘটনার চাপে। কলঙ্ক-কুৎসায় হরিদ্রাগ্রাম ভরে গিয়েছে, দূরে পালিয়ে বাঁচা গেল না।

কিন্তু গোবিন্দলালকে এই অনিবার্য পতনবেগে আরও দ্রুত রোহিণীর দিকে ছুঁড়ে দিল ভ্রমরের তীব্র অশ্রদ্ধা, কৃষ্ণকান্তের উইল বদল এবং রোহিণীর কিছু কুণ্ঠিত কিন্তু নিপুণ চেষ্টা।

গোবিন্দলাল রোহিণীকে নিয়ে মত্ত হয়ে উঠল। বিবেচনার শেষ বন্ধন ছিন্ন করল।

পরবর্তী পর্যায় প্রসাদপুরের কুঠি। রক্ষিতা হিসেবে রোহিণীর সঙ্গে বসবাসে কিভাবে তার ক্ষোভ আত্মগ্লানি বেড়ে উঠেছিল আমরা তা জানি না। জানি গুলিভরা পিস্তল থাকত তার দেরাজে। রোহিণীকে হত্যা করা তার সৌন্দর্যমত্ত চিত্তের আত্মহনন। যত ঘৃণা ক্রোধ রোহিণীকে তার চেয়ে বেশি নিজেকেও। গোবিন্দলালের হাতে কোনো নীতিবাগীশ পিস্তল তুলে দেয় নি। এই অস্ত্রের নাম আত্মহনন – যা রোহিণীর রূপ বহুকাল আগে তার চিত্তগহনে জ্বালিয়ে তুলেছিল, যার দাহ অনির্বাণ।

গোবিন্দলালের অনুশোচনা ইত্যাদি সরল হাতে লেখা, বানিয়ে-তোলা গল্প। রোহিণীর মৃত্যুতেই গোবিন্দলালের চরিত্রের পরিণতি। ভ্রমরের প্রকৃত মৃত্যু তার কাছে আগেই ঘটেছিল, তার রোগভোগ ইত্যাদি সতীনারীর পুণ্য উপকথা – উপন্যাস নয়।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে (দ্বিতীয় খণ্ড) বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'গোবিন্দলাল দুইজন স্ত্রীলোককে ভালোবাসিয়াছিলেন – ভ্রমরকে আর রোহিণীকে। রোহিণী মরিল – ভ্রমর মরিল।' রোহিণীর প্রতি প্রেম তাঁর ভাষায় 'মন্দারঘর্ষণপীড়িত বাসুকি নিশ্বাস-নির্গত হলাহল', আর ভ্রমরের ভালোবাসা 'ধন্বন্তরিভাণ্ড নিঃসৃত সুধা।' বঙ্কিমের সিদ্ধান্ত 'ভ্রমর

অন্তরে, রোহিণী বাহিরে।' কিন্তু বঙ্কিমের উপন্যাসের সিদ্ধান্ত কি? ধন্বন্তরিভাণ্ড নিঃসৃত সুধায় কেন তৃপ্তি হয় না? কেন মন্দার ঘর্ষণপীড়িত বাসুকি-নিশ্বাস-নির্গত হলাহল পান না করলে জীবন ব্যর্থ মনে হয়? বিষ জেনেও পান করা – এই কি পুরুষের নিয়তি?

বঙ্কিম কাকে গোবিন্দলালের অন্তরে রেখেছেন, কাকে বাইরে? এই উপন্যাস যদি গোবিন্দলালের অন্তরের কথা হয়, তবে সেখানে পাপিষ্ঠা রোহিণী বিষভাণ্ড নিয়ে কেন্দ্র জুড়ে বসে রইল কেন? এমন সাজানো-গোছানো সমাপ্তি, 'একবার ভ্রমর, তারপর রোহিণী, আবার ভ্রমর, আবার রোহিণী। ভাবিতে ভাবিতে চক্ষে ভ্রমরকে দেখিতে লাগিলেন, সম্মুখে রোহিণীকে দেখিতে লাগিলেন।'

সেখানেও অন্তর-বাহির একেবারে তুল্যমূল্য হলো কি করে? প্রেমে দেহমন, অন্তরবাহিরের সীমারেখা খুঁজে পাননি বঙ্কিম – যতই যোগফল মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করুন। আর মূল বইয়ের সমাপ্তি[৪] (গোবিন্দলালের বারুণীপুকুরে ডুবে আত্মহত্যা – রোহিণী যেখানে ডুবেছিল, সেখানে তার মৃতদেহ ভেসে-ওঠা) কি বলে? কাব্যিক ও মর্মান্তিক ইঙ্গিত। গোবিন্দলাল রোহিণীর রূপে মত্ত হয়ে ভেবেছিল –'এখন কিছুদিন রূপের সেবা করিব। –আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজনশূন্য জীবন ইচ্ছামতো কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা। সেই দিন ভাঙিয়া ফেলিব।'

মাটির ভাণ্ড ভেঙে ফেলল সে। জীবনের অবশেষে দেহ রূপতীর্থে ভেসে উঠল। রোহিণী-রূপতীর্থে।

এদের দুজনের তুলনায় ভ্রমর সরল। তবে বেশ কিছু বাঁক এখানে সেখানে আছে, কিন্তু বিবর্তনও আছে। তাকে প্রথম দেখি সহজ স্বামীপ্রেমে নিশ্চিতচিত্ত। বালিকা গোবিন্দলালের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর বলে নিশ্চিন্তও। গোবিন্দলাল যদি বলে রোহিণী চোর নয় – নিরপরাধ, তবে ভ্রমর তাই মনে করে, অন্য কোনো যুক্তির প্রয়োজন তার নেই। স্বামীর উপর প্রেমের অধিকারী হবার সর্বজয়ী গর্বেরও তার সাধনা নয়, স্বাভাবিকভাবেই স্বামীর মন জুড়ে তার অধিষ্ঠান, স্বামীর সব ভাবনায় সেই একমাত্র, যেমন গোবিন্দলালও তার হৃদয়জগতের এক সত্য। সূর্যমুখীর চেয়ে তার বয়স বেশ কম, চরিত্রের ভিত্তিও আলাদা।

রোহিণীকে জড়িয়ে তার মনে গোবিন্দলাল সম্বন্ধে কোনো দুর্ভাবনা দেখা দেয়নি; এমন কি রোহিণীকে চুরির দায় থেকে মুক্ত করায় স্বামীর আগ্রহ দেখেও কোনো প্রশ্ন জাগেনি। লেখক বেশ স্পষ্ট ভাষায় ভ্রমরের এই মনোভাব বুঝিয়ে দিয়েছেন, ঘোর-প্যাঁচ রাখেননি। সে অংশটুকু উদ্ধার করছি।

'ভ্র। ...যে যাকে ভালোবাসে, সে তাকেই ভাবে, আমি তোমাকে ভাবি–তুমি আমাকে ভাব।

গো। তবে আমি রোহিণীকে ভালোবাসি।

৪. প্রচলিত সংস্করণের পাঠ চৌদ্দ বছর পরের তৈরি যখন ধর্মতত্ত্বের যুগে লেখকের মন বিচরণ করছে। প্রথম সংস্করণের পাঠের কথা এখানে বলা হল।

ভ্র। মিছে কথা – তুমি আমাকে ভালোবাস– আর কাকেও তোমার ভালোবাসতে নাই – কেন রোহিনীকে ভাবছিলে বল না?

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে আছে?

ভ্র। না।

গো। বিধবাকে মাছ খাইতে নাই, তবু তারিণীর মা মাছ খায় কেন?

ভ্র। তার পোড়ার মুখ, যা করতে নাই তাই করে।

গো। আমারও পোড়ার মুখ যা করতে নাই তাই করি। রোহিণীকে ভালোবাসি।

ধা করিয়া গোবিন্দলালের গালে ভোমরা এক ঠোনা মারিল। বড় রাগ করিয়া বলিল।

'আমি শ্রীমতী ভোম্মরা দাসী – আমার সাক্ষাতে মিছে কথা?'

গোবিন্দলালের দিক থেকে এই সব কথার মধ্যে নানা ভাবনার রঙ আছে, ভ্রমরের দিক থেকে যা বলা হলো তা-ই; কোনো অন্তর্গূঢ় শিকড় নেই অবচেতনায়। যেমন সরল বিশ্বাসে সে জানে এসব গোবিন্দলালের বানিয়ে-বলা কথা তাকে চটাবার জন্য, তেমনি সহজ উত্তেজনায় সে রোহিণীকে 'আবাগী-পোড়ামুখী–বাঁদরী মরুক! মরুক! মরুক!' ভর্ৎসনার এই ভাষা মনের যে ভাবটুকু ধরে রেখেছে তার পেছনে কোনো গূঢ় গোপন ভাবনা বা কষ্টের বীজ লুকিয়ে থাকতে পারে না। রোহিণী গোবিন্দলালের কাছে প্রেম প্রকাশ করেছে শুনে সে তখুনি এক দাসী মারফত তাকে জলে ডুবে মরবার জন্য পরামর্শ দিল। এই ক্রোধের উত্তেজনাও বালিকা-বধূর। এই ক্রোধ সে পুষে রাখেনি, দীর্ঘকাল মনোযন্ত্রণা ভোগ করার উপযুক্ত বিষয় বলেও একে মনে রাখেনি। কিন্তু একটি বাক্যে ইঙ্গিত আছে ভ্রমর সরল হলেও নির্বোধ নয়। 'তা মাগী তোমার সাক্ষাতে বলিল কেন?' রোহিণীর দুষ্ট বুদ্ধি আছে, সে কৌশলে প্রণয় নিবেদন করতে চায়, এটাই আপত্তিকর; ভর্ৎসনার যোগ্য। যদিও সে সুনিমিছত, স্বামীর কাছে এই কৌশল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

ভ্রমরের মনের পরিবর্তন ঘটল গোবিন্দলালের অনুপস্থিতিতে। রোহিণীকে জল থেকে যেদিন উদ্ধার করা হয়, সেদিন স্বামীর সঙ্গে আলাপে দুজনের মধ্যে একটু দূরত্বের ছায়া পড়েছিল। তাকে কোনোভাবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

গোবিন্দলাল নিজের মনের গোপন মহলের তাগিদে যখন দেহাতে গেল ভ্রমরকে সঙ্গে নিল না। ভ্রমর এতে দুঃখ পেল। এ কষ্টে সাধারণ বিচ্ছেদের থেকে অন্য রকম কিছু ছিল না। কিন্তু স্বামীর অভাবে মন যখন আশ্রয়চ্যুত তখনই রোহিণী-গোবিন্দলালের অবৈধ সম্পর্ক নিয়ে নানা কথা তার কানে এল; পল্লবিত ও অলঙ্কৃত হয়ে প্রচারিত হলেও এর ভিত্তিতে সত্য ছিল। মেয়েমহলের কুৎসা এবং শেষ পর্যন্ত রোহিণীর আচরণ ও কলঙ্কের স্বীকৃতি তার স্বামীর প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিল। আগে যে অটুট বিশ্বাস দেখেছি, কিছুতে যা চিড় খাবার নয় বলে মনে হয়েছিল, তা একেবারে নিঃশেষে ভেঙে পড়ল। আসলে আগের বিশ্বাস তার আত্মলব্ধ চরিত্র–শক্তি ছিল না, যেমন এখনকার চূড়ান্ত অবিশ্বাসও নয়। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে ভ্রমর একটা মানস-শক্তি লাভ করল, চরিত্র-ব্যক্তিত্বের বিশিষ্ট হয়ে উঠল।

ভ্রমর দুঃখ পাচ্ছে, যন্ত্রণা ক্রমে বেড়েছে, – কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে সতীত্বের গর্ব তার স্বভাবে বড় হয়ে উঠেছে। গোবিন্দলালের জন্য প্রতীক্ষা নয়, অভিমান নয়, পরাসক্তি বিদ্রোহে তার সূত্রপাত। সে কৌশল করে বাপের বাড়ি চলে গেল। সম্পত্তির মালিকানার ব্যাপারে সে অধিকার ছেড়ে দিতে তৈরি হয়েছিল, স্বামী গৃহত্যাগ না করুক, অন্তত জমিদারীর বন্ধনে আটকে থাকুক এরূপ ইচ্ছা তার ছিল, কিন্তু দুশ্চরিত্র স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল না। গোবিন্দলালের গৃহত্যাগের সঙ্কল্প শুনে সে কাতর হয়েছে, কিন্তু সংযম হারায়নি, তার ক্ষমা চাইবার মধ্যে বিগলিত আত্মসমর্পণ ছিল না। কিন্তু তখনও হৃদয়ে যেটুকু দুর্বলতা ছিল তা দুঃখভোগে কঠিন অক্ষমা হয়ে দেখা দিল। আসলে ভ্রমরের মধ্যে শ্রদ্ধাহীন শুধু ভালোবাসার একটি মাত্রা এবং ক্ষুদ্রমতি গোবিন্দলালের তুলনায় আপনার দুঃখার্জিত সতীত্ব-গর্ব–এই দুই স্তরে কিছু দ্বন্দ্ব দেখা গিয়েছে। স্বামী প্রেম হারাবার লজ্জিত পরাজয়ের বোধে যে সুপরিয়ারিটি কমপ্লেক্সের আশ্রয় সে নিয়েছিল ভ্রমরের ট্রাজেডিতে তার কিছু ভূমিকা আছে।

কিছু কিছু দুর্বলতা কৃষ্ণকান্তের উইলকে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে স্থান নিতে দেবে না। কিন্তু এমন আশ্চর্য শক্তির পরিচয় এ লেখার নানা স্থানে, বিশেষত প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে যার তুলনীয় কিছু সেকালের সাহিত্যে মেলেনি।

১০ মুচিরাম গুড়ের জীবন রচিত : একটি খসড়া

এক

মুচিরামগুড়ের জীবন-চরিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় ছাপা হয় ১৮৮০ সালে। উল্লেখ থাকে ভবানীচরণের নক্‌সাধর্মী কাহিনী দুটি অর্ধ-শতাব্দী আগের। প্যারীচাঁদ মিত্রের বইও বাইশ-তেইশ বছরের পুরোনো। ১৮৭৩ সালে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'কল্পতরু'। ব্যঙ্গাশ্রয়ী উপন্যাস লেখার এই প্রবাহ মোটেই অবিচ্ছিন্ন নয়। ইতিহাসমিশ্র রোমান্সের প্রবল প্রতাপে এই পথ পরিত্যক্ত হয়েছিল। সিরিয়াস সামাজিক উপন্যাসেও এর আত্মীয়তা ছিল না। সেদিক থেকে এই ছোট লেখাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নেই। ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস-রচনার কোনো নতুন আদর্শ দেখায়নি মুচিরাম। শিল্পগুণেও অসাধারণ কিছু নয়। যদিও এ জাতের অন্য অনেকের লেখার চেয়ে উপভোগ্য, ইন্দ্রনাথের তুলনায় তো বটেই। অবশ্য ভবানীচরণের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দু-একটি চরিত্রের অন্দরমহলে ঢুকে পড়েছিল; এবং প্যারীচাঁদে সমাজের ব্যাপকতর রূপ ধরা পড়েছিল,–কাহিনীরও একটা নিয়মমাফিক আবর্তন ছিল।

মুচিরামকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস বলে গণ্য করেননি; পরবর্তী কোনো সমালোচক বা বঙ্কিম-সম্পাদকও নয়। তাঁর উপন্যাস গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই লেখাটির স্থান মেলেনি। বঙ্কিম তাঁর আরও কয়েকটি কাহিনীধর্মী রচনাকে অস্বীকৃতিতে সরিয়ে রেখেছিলেন; যেমন– 'গ্রাম্যকথা' শীর্ষক দুটি লেখা, 'সুবর্ণগোলক'। এরা 'লোক রহস্যে'র অন্তর্ভুক্ত হলেও গল্প জাতের। শেষোক্ত রচনাটি বেশ পরিণত কৌতুকগল্পের নিদর্শন। 'কমলাকান্ত' বইয়ের 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' একটি পূর্ণাঙ্গ কৌতুক-কাহিনী, শিল্পগুণেও বেশ উঁচু মাপের। এই সব গল্প 'যুগলাঙ্গুরীয়' 'রাধারাণী'র গোত্রভুক্ত হতে পারত–বঙ্কিমের 'ক্ষুদ্রক্ষুদ্র উপন্যাসে'র অর্থাৎ ছোট আকারের গল্পের[১] এক রকম এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে।

মুচিরাম অনেকখানি নক্‌সা, অনেকখানি গল্পও। সমাজব্যঙ্গ সরাসরি অভীষ্ট হলে প্রায়ই নক্‌সায়-গল্পে মিশেল ঘটে। কাজেই একে গল্পধর্মী বলতে বাধা নেই। তবে তথাকথিত 'ক্ষুদ্র উপন্যাস' অর্থাৎ আধুনিক ছোট গল্পের পূর্বরূপ একে বলা যাবে না। কারণ স্থানে-কালে-ঘটনায় একটা বিস্তার আছে, বিকাশ আছে, মুখ্য পাত্রের জীবন-ব্যাপারের একটা বিবর্তন দেখানো হয়েছে। জাতটা উপন্যাসের, তবে প্রয়োজন ও

১. আমার 'বঙ্কিমচন্দ্র, বাস্তবতা এবং' বইটি দ্রষ্টব্য।

প্রতিশ্রুতি-মাফিক বড় হয়নি লেখাটি। আমাদের অনেকটা বাইরের রূপরেখা দেখে খুশি থাকতে হয়। দু-একটা কাহিনীর নিদর্শন, পাত্রপাত্রীর মুখাবয়ব, মানবিক সম্পর্কের আভাস। এগুলিকে ঠিকমতো বাড়িয়ে নিয়ে একটা মাঝারি আকারের পুরো উপন্যাস গড়া যেত, যেটা বঙ্কিমের প্রসিদ্ধ সামাজিক উপন্যাসগুলি থেকে সব দিক থেকেই পৃথক হত।

বঙ্কিম খেলাচ্ছলে এই কাহিনী লিখেছিলেন, একে পূর্ণরূপ দেবার কোনো রকম সার্থকতা আছে ভাবেননি।

এই লেখার আলোচা লেখার জোরে নয়, লেখকের জন্য।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনায় যে সব প্রসঙ্গ এবং সম্প্রদায়ের ব্যঙ্গাত্মক ছবি এঁকেছেন–

১. যারা দলের একটি কাহিনী-আশ্রয়ী ছবি। কিন্তু ব্যঙ্গের সহযোগ থাকলেও মূলত অতিশয্যহীন ও বাস্তবানুগ।

২. আদালত এবং সংশ্লিষ্ট আমলা-নায়েব-ডেপুটি সম্প্রদায়ের তীব্র বিদ্রূপমিশ্র বর্ণনা।

৩. ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-হাকিমের চরিত্রের স্কেচধর্মী পরিচয়।

৪. কলকাতার স্ফুর্তিবাজ বাবু-শ্রেণীর বিবরণ। উচ্চ অভিজাত সমাজের এবং সংশ্লিষ্ট ধান্দাবাজ লোকেদের কথা।

৫. শোষক জমিদার, ভক্ত প্রজা, ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও দুর্ভিক্ষকালীন সরকারী বিধির ব্যঙ্গ-চিত্র।

মুচিরাম গুড়ের চরিত্রের ক্রমবিকাশের সূত্রে এই সব সামাজিক প্রসঙ্গ বিন্যস্ত হওয়ায় এগুলি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। এদের মধ্যে সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ নয়, কাহিনী দানা বাঁধেনি। বিচ্ছিন্নভাবে লেখকের রচনানৈপুণ্য সর্বত্র, ভাষার ধার অনেক। কিন্তু লেখাটি নক্‌সা গণ্ডী ডিঙোতে পারেনি। কোনো প্রসঙ্গই পুষ্ট নয়। দ্রুতগতি সংক্ষিপ্ত বিবরণের মধ্য দিয়ে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে ছুটতে হয়। ছায়াবাজির মতো দু-একটি মানুষ স্পষ্ট হতে না হতে হারিয়ে যায়। কলকাতার অভিজাত বাটপার, মুচিরামের স্ত্রী, আর মুহুরী এবং সম্বন্ধী বাস্তব সামাজিক মানুষ হিসেবে অনেকটা জীবন্ত, যদিও মামুলি। ইংরেজদের চরিত্রগুলি অল্প অবকাশে বিশেষ টাইপ হিসেবে কৌতূহল সৃষ্টি করে। কিন্তু স্বয়ং মুচিরাম লেখকের অভিষ্ট ব্যঙ্গের আশ্রয় হলেও সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব লাভ করেনি। হিউমারাস চরিত্র তৈরি করতে তিনি কত বড় শক্তিমান ছিলেন কমলাকান্তে তার পরিচয় আছে। কিন্তু 'কমলাকান্ত' উপন্যাস নয়, কাহিনী নয়। যা-ই হোক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এই শক্তির ফল পেল না। মুচিরাম মূর্খ ও লোভী, আবার ক্বচিৎ চতুরও। এই সব উপাদানের মিশ্রণ একটা যৌগ হয়ে ওঠেনি। সাহেবেরা বা রামচন্দ্রবাবু এক একটা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরূপে বেশ সত্য' হাকিম ও বিচারক ইংরেজদের কয়েকটি টাইপ বৈচিত্র্যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ব্যঙ্গ করার নিপুণ তীক্ষ্ণতা, ভাষার ক্ষমতা, বক্র চরিত্রের টাইপ আবিষ্কার, কৌতুককর পরিস্থিতি নির্মাণের নিদর্শন ছড়ানো থাকলেও এ গল্প শেষ পর্যন্ত তেমন একটা কিছু হয়ে ওঠেনি।

১১ আনন্দমঠ :
সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকল নিনাদ-করালে

এক

আনন্দমঠে ইতিহাসের যেটুকু আছে তা নিয়ে বেশি ভাবার অবকাশ নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ উত্তর বাংলায় গুরুতর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। গ্লেইগের 'মেময়েরস অফ দি লাইফ অফ ওয়ারেন হেস্টিংস' এবং হান্টারের 'অ্যানালস অফ রুরাল বেঙ্গল' থেকে বঙ্কিমচন্দ্র সে ইতিহাস সঙ্কলন করে বইটির তৃতীয় সংস্করণের পরিশিষ্টে ছেপেও দিয়েছিলেন। কাজেই ইতিহাস অংশকে যেভাবে তিনি বদলে নিয়েছিলেন তা সতর্ক ভাবনার ফল। যদুনাথ সরকার আনন্দমঠের ভূমিকায়[১] লিখেছিলেন, '... সন্তানেরা বাঙালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা, যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত; কিন্তু যে সব 'সন্ন্যাসী-ফকিরেরা' সত্য ইতিহাসের লোক এবং উত্তরবঙ্গে (বীরভূমে নহে) ঐ সব অত্যাচার করে তাহারা এলাহাবাদ কাশী ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমের লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদগীতার নাম পর্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তানসেনা বৈষ্ণব, আর আসল সন্ন্যাসীরা ছিল শৈব। ...সত্যকার সন্ন্যাসী-ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমা গিরি-পুরীর দল, একেবারে লুঠেড়া ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারিও করিত। মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে আনন্দমঠে বর্ণিত নরনারী এবং তাহাদের কার্য ও কথা (ইংরেজ-সৈন্যের সহিত দুইটি খণ্ডযুদ্ধ বাদে) অনেকাংশে অসত্য এবং এ বইখানি কোনোমতেই ঐতিহাসিক এই বিশেষণ পাইতে পারে না।'

কিন্তু সমকালের আচার-ব্যবহারের সত্যভূমিতে স্থাপিত বলে একে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে রাজি হয়েছেন। লেখকের নিজের কথা, 'আনন্দমঠে প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করে নাই।'

১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বীকৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে অন্য রকম ভাবতেন। অবশ্য কালে কালে এই ধারণা অনেক বদলে গেছে। যদুনাথ সরকার বড় ঐতিহাসিক, গুরুতর ঐতিহাসিক ব্যত্যয় দেখিয়েও একটি কারণে তিনি একে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। বাংলা সমালোচনায় ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স বলে এ বইয়ের পরিচয় প্রচলিত। আমার মনে হয়ে সে পরিচয়ে কোনো অসুবিধে নেই। আনন্দমঠ সম্বন্ধে নিচের সিদ্ধান্তগুলি ঐ বর্গীকরণের দিকেই নিয়ে যায়–

১. এ বইয়ের কোনো চরিত্রই ইতিহাসের পাত্র নয়, দুএকজন ইংরেজ-প্রধানের নাম ছাড়া।

২. সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের যে ছবি আছে তা ঊনবিংশ শতাব্দীর এক আদর্শবাদের সৃষ্টি–বঙ্কিমের ব্যক্তিত্ব যার প্রধান উপাদান।

৩. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এক ঐতিহাসিক ঘটনা। তখনকার নবাব সম্পর্কে (মীরজাফরের মৃত্যু ঘটেছে, মীরণ মসনদে) তথ্যগত ত্রুটি থাকলেও, এই প্রসঙ্গটি সত্য হয়ে উঠেছে।

৪. সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ, তাদের কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধ ইতিহাসের সত্য।

৫. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকের পল্লীবাংলার জীবনযাত্রার যে বাস্তব বিবরণটুকু আছে, তাতে এমন কোনো মুদ্রাঙ্কন নেই যাতে ঐ সময়ের বলে চেনা যায়; বঙ্কিমের সমকালের নয় বলে মনে হবার কারণ নেই – আবার একশ বছর আগে হতেও আপত্তি নেই। সাধারণ পল্লী-পরিবারের প্রাত্যহিক আচরণে এর মধ্যে লক্ষ্য করবার মতো বদল আসেনি–শহরে শিক্ষিত শ্রেণীর মানসজগতে যতবড় ভাববিপ্লবই ঘটুক।

সব মিলে বলতে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহকে অবলম্বন করেছেন, দুর্ভিক্ষের পটভূমি ঠিক আছে। কিন্তু বিদ্রোহের কার্যকারণ ফলাফল সবকিছুকে নিজের বিশেষ ভাবাদর্শের অনুগামী করে নতুন রূপ দিয়েছেন। সেকালে এরূপ সন্তান-বিদ্রোহ অসম্ভব ছিল বুঝি – কারণ আমাদের আধুনিক ইতিহাসচেতনা। মীরকাশিম-প্রতাপের সঙ্গে কোম্পানির বিরোধে-সংগ্রামে (চন্দ্রশেখর) কোথাও বুদ্ধিমান পাঠকের কালচেতনা পীড়িত হয় না। এখানে হয়। যে মন্ত্রে তাকে ভুলে থাকি, তা লেখার কৌশল আর আদর্শবাদী কল্পনার গাঢ় রঙ। তখন বলতে হয় ইতিহাসের ভিতটা পোক্ত না হলেও আদর্শবাদী কল্পনার প্রাসাদটি নয়নাভিরাম। ইতিহাসমিশ্র রোমান্সের এও একটা রূপ–পুরোনোয়-আধুনিকে মেলামেশা, কাজেই শ্রেণী-পরিচয়ের আপত্তি করার নেই।

অন্য এক দিক, ইতিহাসেরই। এ বইয়ে যে কল্পপ্রায় ইতিহাস-তৈরির চেষ্টা আছে তা রাজামহারাজা-নিরপেক্ষ। দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট মানুষ, আদর্শবাদী স্বেচ্ছাসৈনিকের দল, গ্রামবাসী জনসাধারণ–এরাই এই কাহিনীর সারা দেহ জুড়ে মহাকোলাহল তুলেছে। লেখক রাজতক্তে আসীন ব্যক্তিবিশেষের রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ে ভাবেননি, যেন গণরাজের নব ইতিহাসের স্বপ্ন দেখতে চেয়েছেন।

দুই

রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে আনন্দমঠের গুরুত্ব খুব বেশি। সে বিষয়ে ভাবনা চিন্তা নিচে উল্লিখিত কয়েকটি সূত্র ধরে করা যেতে পারে–

১. নব্যজাতীয়তাবাদ – ইংরেজরাজের প্রতি মনোভাব – বিপ্লবীপন্থা।

২. বঙ্কিম-উদ্ভাবিত ধর্মতত্ত্ব – রাজনৈতিক বোধের সঙ্গে তার সম্বন্ধ।

৩. হিন্দু-মুসলমান সমস্যা।

সূত্রগুলি রচনার মধ্যে অনন্য হয়ে উঠেছে, আলোচনাকে সুশৃঙ্খল করার উদ্দেশ্যেই তাদের এই পৃথকীকরণ।

আনন্দমঠ উপন্যাসে আদর্শবাদী যুবক সন্ন্যাসীরা সংগঠন তৈরি করে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করতে চেয়েছে। তখন দেশে ইংরেজের প্রকৃত কর্তৃত্ব, যদিও তাদের সমর্থন পুষ্ট এক মুসলমান নবাব প্রশাসনিক দায়িত্বে, যে প্রশাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিল। উপন্যাসে যে রাজনৈতিক অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়েছে, যা সব ঘটনা চিত্রিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে রচনাটির একটি রাজনৈতিক চরিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন–

প্রথম। নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশি, তা যে সম্প্রদায়বিশেষের আদর্শের আরোপমাত্র নয়, কোনো সামন্তের ব্যক্তিগত স্বার্থ-সিদ্ধির অভিমুখী নয়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভূমিতে কাহিনীটি স্থাপিত করে তা বোঝানো হয়েছে। জনসাধারণের কাছে এই শাসকদের আর টিকে থাকার অধিকার নেই, একথা প্রমাণিত হয়েছে। কে সেই শাসক? মুসলমান নবাব প্রত্যক্ষত সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রকৃত শাসক যে ইংরেজ কোম্পানি কাহিনীতে কোথাও তা ছাপা থাকেনি।

দ্বিতীয়। নবাব মীরজাফরের নাম একবার করা হয়েছে। মন্বন্তরের সময়ে মীরজাফর আর নবাব নয়। এই ঐতিহাসিক ভ্রান্তি লেখক পরবর্তী সংস্করণগুলিতেও লক্ষ্য করেননি। কিন্তু ইংরেজ সেনাপতি মেজর উডের নাম সংশোধন করে যথার্থ ঐতিহাসিক নাম ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস ব্যবহার করেছেন। সন্তানসেনারা কোম্পানির সঙ্গে লড়েছে প্রতিটি যুদ্ধে। টমাস-এডওয়ার্ডসদের প্রাণ দিতে হয়েছে। তাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়েই স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হল এই রকমই দেখানো হয়েছে। নবাবী ফৌজ যে কোনো ব্যাপারই নয় বইয়ে তা খুব স্পষ্ট।

তৃতীয়। একটি গোপন ও বিপ্লবী রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ও পদ্ধতি এখানে বেশ স্পষ্ট। আদর্শবাদ ও ভাবাবেগ যেমন সত্য, তেমনি খাঁটি একটি বাস্তববাদী পরিকল্পনা। এর কয়েকটি দিক–

ক. লক্ষ্য – সশস্ত্র আক্রমণের মধ্য দিয়ে শত্রুবিনাশ ও স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

খ. সংগঠন – সন্তান দলের দুইটি স্তর, – একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, কঠিন নিয়মনিষ্ঠা, ত্যাগ ও ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি সৈন্যবাহিনী– যার মনে পূর্বোক্ত বোধগুলি যথাসম্ভব সঞ্চারিত, সরকারী বেতনভুক্ত সেনাদলের সঙ্গে এদের গুরুতর পার্থক্য। জনগণের সঙ্গে সন্তানদলের সম্পর্কেরও পরিচয় আছে। সাধারণ

মানুষের উপরে ধর্মের নামে এরা প্রভাব বিস্তার করে। শত্রুর সম্পদাদি লুণ্ঠনে অংশ দেয়। হিন্দু জনসাধারণ থেকে এই বিপ্লবী সংগঠন আদৌ বিচ্ছিন্ন নয়।

গ. পদ্ধতি – গুপ্ত পরিচালন-কেন্দ্র, অবস্থা অনুকূল হওয়ায় গড় নির্মাণ। লুটতরাজ (শত্রুপক্ষের সম্পদ) মারফত প্রয়োজনীয় অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ। গেরিলা পদ্ধতির ব্যবহার, সংগঠন আরও মজবুত হলে শত্রুকর্তৃক কেন্দ্র আক্রান্ত হলে সরাসরি যুদ্ধ। যুদ্ধকালে অবশ্য কূটকৌশলের তুলনায় ভাবোচ্ছ্বসিত বীরধর্মের প্রয়োগ দেখা গিয়েছে।

বঙ্কিম যখন এ বই লেখেন তখন এ দেশের জাতীয়তাবাদ একান্ত প্রাথমিক স্তরে ছিল। স্বদেশ-প্রীতি, প্রাচীন ঐতিহ্যে শ্রদ্ধা, বর্তমান দুরবস্থায় বেদনাবোধ সাধারণভাবে প্রসারিত হচ্ছিল। যেসব সংস্থা ঐ ভাবগুলি প্রচারে কতক যত্ন নিয়েছিল, রাজনৈতিক সংগঠনের কোনো প্রাথমিক ভূমিকাও তাদের ছিল না। আনন্দমঠে সংগঠন ও সংগ্রামের পরিকল্পনা বিপ্লবী রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে একে মহিমা দিয়েছে। বোঝা যায় বিংশ শতকের আরম্ভে বাঙালি বিপ্লবীরা কেন এই উপন্যাসকে তাদের দিগ্‌দর্শনী বলে গ্রহণ করেছিল।

চতুর্থ। বন্দেমাতরম্ গানটি উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়েছে বহুবার। বাঙালি হিন্দুর জাতীয় দেবী দুর্গাকে দেশ-মাতৃকারূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বাঙালি হিন্দুর জাতীয়তাবাদী চেতনা একটা বিশিষ্ট ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ভাবাবেগে ওতপ্রোত হয়ে পড়ছে। আনন্দমঠে জাতীয়তাবোধ একটা প্রায় সর্বজনীন (প্রায় বলা হলো মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা মনে রেখে) ভাবকেন্দ্র লাভ করেছে, একটা গাঢ়তর স্তরে উন্নীত হয়েছে। দেশকে মা বলে মনে করা অবশ্য সম্প্রদায়নিরপেক্ষ এবং স্বাধীনতাসংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

পঞ্চম। আনন্দমঠের পরিচয় দিতে গিয়ে রমেশচন্দ্র দত্ত একটি প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, 'The general moral of the Ananda Math...is that British rule and the British education are to be accepted as the only alternative to Mussulman oppression ... But thought the Ananda Math is in the form of an apology for the loyal acceptance of British rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration, sooner or later, of a Hindu Kingdom in India.'[২]

খুব অস্পষ্ট ও প্রাথমিক ভাবে হলেও রমেশচন্দ্র লেখকের চিন্তার দ্বিধা ধরে ফেলেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে বলেছিলেন, 'সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র, বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাঙ্গালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।'

২. 'এনসাইক্লোপিডিয়া বিট্রানিকা' একাদশ সংস্করণ, ষষ্ঠ খণ্ড। বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে নিজের এই মন্তব্যকে আরও বিশদ করেছেন, 'দি বেঙ্গলি' নামক সাময়িক পত্রের ব্যাখ্যান উদ্ধৃত করে। ঐ সমালোচনায় মহাপুরুষের ইংরেজরাজের প্রশংসাসূচক উক্তির ইংরেজি অনুবাদ ছিল। তা তুলে বলা হয়েছে–

'This passage embodies the most recent and the most enlightened views of the educated Hindus, and happening as it does in a novel powerfully conceived and wisely executed, it will influence the whole race for good. The author's dictum we heartily accept as it is one which already forms the creed of English education. We may state it in this form : India is bound to accept the scientific method of the West and apply it to the elucidation of all truth. This idea beautifully experssed, froms a silver thread as it were, and runs through the tissue of the whole work.'

এই দুটি উদ্ধৃতি, রমেশচন্দ্রের বক্তব্যের ইঙ্গিত এবং খোদ উপন্যাসটিতে যা আছে সব মিলিয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা যায় যা রচনাটির রাজনৈতিক চরিত্রের উপর কিছু আলো ফেলবে।

১. বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ লিখে বেশ অস্বস্তিবোধ করেছেন। ইংরেজ শাসকেরা রুষ্ট না হয় সেজন্য বিজ্ঞাপনে কৈফিয়ত দিয়েছেন। মূল বইয়ে মহাপুরুষের মুখে যে ইংরেজস্তুতি ছিল তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইংরেজি অনুবাদে প্রচার করা হয়েছে। সরকারী পীড়নের ভয়ে এরকম করা হয়েছে অনুমান হয়।

২. তাহলে সরকারী পীড়নের ভয় ছিল। সে ভয় কি অকারণ? বইয়ের মধ্যে শুধু মহাপুরুষের ইংরেজস্তুতি ছিল না। তাহলে লেখককে এত সতর্ক হতে হতো না।

৩. আনন্দমঠের পাঠকেরা সমকালে যে 'মরাল' টেনে নিয়েছে, পরের যুগের লোকেরা তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে – একে তারা ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবের মহান অস্ত্র বলে মাথায় করে নিয়েছে। এই দ্বিতীয় মরালটি আবিষ্কারের সুযোগও বঙ্কিম নিজেই বইয়ে রেখে দিয়েছিলেন, তা তরুণ বিপ্লবীদের আরোপ নয়।

৪. রমেশচন্দ্র যে প্রাথমিক ইঙ্গিত দিয়েছেন তার দাম আছে। আসলে বঙ্কিম দ্বিধার শিকার ছিলেন, শুধু রাজভীতির নয়, যেমন সেকালের অন্যান্য অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজদের সঙ্গে আদ্যন্ত সন্তানদের লড়িয়েছেন। মুসলমানদের কথা সেখানে গৌণ হয়ে গিয়েছে। এবং ঐ যুদ্ধ প্রভৃতি আকস্মিক বিষয়রূপে নয়, পরিকল্পিত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের চিত্রিত। তবুও তাঁকে প্রায়ই বলতে হয়েছে মুসলমানই সন্তানদের আক্রমণের লক্ষ্য। মুসলমান-পীড়নের কিছু চিত্র আঁকতে হয়েছে। গোটা উপন্যাসের সঙ্গে তা স্বাভাবিকভাবে মেশেনি। মহাপুরুষকে দিয়ে যেভাবে কাহিনীর উপসংহার ঘটানো হয়েছে তার সম্ভাবনা গল্পে আগে ছিল না। উপন্যাসের শিল্পকে তা ক্ষুণ্ন করেছে। সত্যানন্দকে একরূপ জোর করে কর্মক্ষেত্র থেকে জ্ঞানক্ষেত্রে অপসৃত করা হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা চাইতে গেলে ইংরেজ-নিধন অপরিহার্য। তাতে রাজরোষে পড়তে হবেই, – তা ছাড়াও ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বস্তুমুখী বিচিত্র বিদ্যার মহিমা যার অন্য নাম জাতির জাগরণ, তার কি হবে? টমাস-এডওয়ার্ডসের রক্তপাতের উপরে

মহাপুরুষের বক্তৃতার প্রলেপ শুধু সরকারকে তুষ্ট করার কারণেই নয়, নিজ ভাবনার দ্বিধাকে প্রশমিত করার জন্যও।

আনন্দমঠে রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব মিলে গিয়েছিল। বলা যায় বঙ্কিমের রাজনীতিবোধ তাঁর ধর্মভাবনা তথা অনুশীলনতত্ত্ব অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনদর্শনের একটি অংশ মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের আরম্ভ থেকে এই তত্ত্ববোধ তাঁর মনে একটা নির্দিষ্ট আকার নেয় এবং 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকায় নানা লেখা ছাপা হতে থাকে। শেষে ১৮৮৬ সালে 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং ১৮৮৮ সালে 'ধর্মতত্ত্ব' (প্রথমভাগ, অনুশীলন) বই হয়ে বেরোয়। আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী-সীতারাম এই তিনটি উপন্যাসে ঐ তত্ত্ববোধ প্রকাশ করা হয়েছে–এমন কি নিছক উপন্যাস না লিখে, উক্ত প্রত্যয় প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই তিনি এই বইগুলি লিখেছিলেন এমন কথা এই একশ বছর ধরেই শোনা গেছে। 'প্রচার' পত্রিকায় ১৮৮৫ সালে এক প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছিলেন, 'ধর্মের মোহিনী মূর্তির কাছে সাহিত্যের প্রভাব বড় খাটো হইয়া যায়। ... সাহিত্য ত্যাগ করিও না কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর[৩]।'

এই তিনটি উপন্যাসই লেখকের এটিই লক্ষ্য ছিল। এদের নিম্নসোপান করে পাঠকদের ধর্মের মঞ্চে আরোহণ করানো। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'এই তিনখানি উপন্যাসে, বাঙালির প্রকৃতির আধারে বঙ্কিমচন্দ্র সমষ্টি ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন পদ্ধতি পরিস্ফুট করিয়াছেন[৪]।'

মোটামুটি বঙ্কিম-পাঠকেরও এরকমই বিশ্বাস।

বর্তমান উপন্যাসে কি তাত্ত্বিক বোধ ধরা পড়েছে, তা কতটা ধর্মতত্ত্ব-কৃষ্ণচরিত্রে বিশ্লেষিত দার্শনিক নীতির অনুমাগী সে কথা বিচার করা প্রয়োজন।

প্রথম। সন্তানেরা নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করে। ধর্মের গ্লানি দূর করে সাধুজনের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতকারীর বিনাশ সাধন করেছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেই আদর্শ সন্তানের। আধুনিক কালে বঙ্কিমের কাছে এর অর্থ হলো বিধর্মীকে ধ্বংস করে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

দ্বিতীয়। সন্তানদের আচরণবিধি মহেন্দ্র-নবীনানন্দের দীক্ষাকালে স্পষ্ট জানা গিয়েছে–

সত্য। ...সন্তানধর্মের নিয়মসকল পালন করিবে?
উভয়ে। করিব।
সত্য। যতদিন না মাতার উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহধর্ম পরিত্যাগ করিবে?
উভয়ে। করিব।
সত্য। মাতাপিতা ত্যাগ করিবে. ...ভ্রাতাভগিনী? ...দারাসূত? ...আত্মীয়-স্বজন? ...ধন-সম্পদ-ভোগ?

৩. ধর্ম এবং সাহিত্য। বিবিধ প্রবন্ধ। দ্বিতীয় খণ্ড
৪. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

উভয়ে। সকলেই পরিত্যজ্য হইল।

সত্য। ইন্দ্রিয় জয় করিবে? স্ত্রী লোকের সঙ্গে কখন একাসনে বসিবে না?

উভয়ে। বসিব না। ইন্দ্রিয় জয় করিব।

সত্য। ...আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জন করিবে না? যাহা উপার্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে?

উভয়ে। দিব।

সত্য। সনাতন ধর্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্য। রণে কখন ভঙ্গ দিবে না?

উভয়ে। না।

সত্য। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়?

উভয়ে। জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

সত্য। ... তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহব্রেতে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?

উভয়ে। আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলই এক মায়ের সন্তান।

সর্ববিধ পারিবারিক হৃদয়বৃত্তির উৎসাদন, সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়জয়, ভোগবাসনার নিবৃত্তি, আত্মত্যাগ এমন কি প্রাণবিসর্জনের প্রস্তুতি, সংগঠনের ভেতরে সব ভেদবুদ্ধির বিলোপ সন্তানদের ব্রতরূপে নির্দেশিত এবং মূল লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতায় অবিচল নিষ্ঠা। বঙ্কিম-ভাবিত অনুশীলন তত্ত্বের এটি অংশ মাত্র – যুগোপযোগী রাজনৈতিক প্রয়োজনে দল গঠনের উদ্দেশ্যে তাকে প্রয়োগ করা। এরা সংগঠনের সর্বোচ্চ স্তর হলেও তত্ত্বের পূর্ণরূপ নয়। প্রশ্ন এসে যায় তত্ত্বের পূর্ণতা কি প্রয়োজনের পক্ষে অতিরিক্ত, তাই পরিত্যজ্য?

তৃতীয়। গোড়ীয় বৈষ্ণবের অহিংসা প্রেমধর্ম সম্বন্ধে সত্যানন্দের উক্তি, 'নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার।'

সন্তানগণ যে কাজে ব্রতী তাতে সত্যানন্দের এরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গত। কিন্তু সর্ববৃত্তির বিকাশ ও সমন্বয়ের যে তাত্ত্বিক ভাবনা বঙ্কিমের তাতে সত্যানন্দের বক্তব্যের সংশোধন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ঐ একই অনুচ্ছেদে তাই তাকে দিয়ে বলানো হয়েছে, 'চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময় – কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমের নহেন – তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময় – সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব – কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব।'

একটু আগে যে বৈষ্ণবতাকে অপ্রকৃত বলা হয়েছিল এখন তাকে বলা হলো অর্ধেক, যাকে প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম আখ্যা দেওয়া হয়েছিল তাকেও স্বীকার করে নেওয়া হলো অর্ধেক হলো। কাহিনীর উপরে এটুকু তত্ত্বের চাপ।

কিন্তু কাহিনীর শেষে দেখা যায়, একটি 'অর্ধেক' বাকি আছে। কর্মবীর সত্যানন্দকে মহাপুরুষ বলেছেন, 'চল, জ্ঞান লাভ করিবে চল।'

'জ্ঞান' অপর অংশ। তবে অর্ধেক না বলে বলা উচিত প্রেম, শক্তি আর জ্ঞান প্রত্যেকে পূর্ণ সত্যের এক-তৃতীয়াংশ। এই তিনের বিকাশ ও সমন্বয় বঙ্কিমের তত্ত্ববোধে অন্বিষ্ট। অবশ্য বঙ্কিম শারীরিক বৃত্তির কথাও বলেছেন। তাঁর ব্যাখ্যান – 'মনুষ্যের কতগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্মাত্মতা এবং সুরসে রসিকতা এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি আছে, অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ সুস্থ এবং সর্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই[৫]।'

বঙ্কিম-কথিত চারটি বৃত্তির (শারীরিক, জ্ঞানর্জনী, কার্যকারিণী, চিত্তরঞ্জিণী) মধ্যে আনন্দমঠ মুখ্যত, কার্যকারিণী বৃত্তির (শারীরিকী বৃত্তিও ভিত্তিতে আছে, অধিকন্তু বিধায় এখানে তার বিশেষ উল্লেখ করা হলো না) প্রকাশ। কাজেই তাত্ত্বিক সামঞ্জস্য বিধানের প্রশ্ন ওঠে না। আদর্শ তত্ত্বভাবনার একটি মাত্র অংশের অনুশীলন এই উপন্যাসে এবং সেই আংশিক অনুশীলন তত্ত্ব সম্পূর্ণত রাজনৈতিক প্রয়োজনে নিয়োজিত।

বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয় বুঝেছিলেন তত্ত্বকে হুবহু উপন্যাসে প্রয়োগ করা যায় না। বুঝেছিলেন মানুষ তত্ত্ব নয়। তাই আনন্দমঠ উপন্যাসই, দার্শনিক প্রতীতি বিশেষের নিদর্শন নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ উপন্যাসে মুসলমান-বিরোধী হিন্দু জাতীয়তাবাদ প্রচার করা হয়েছে এই অভিযোগ আছে। লেখক মাঝে মাঝেই জোর গলায় বলেছেন মুসলমান শাসন ধ্বংস করে স্বাধীন আদর্শ হিন্দুরাজ্য স্থাপনই সন্তানদের উদ্দেশ্য। শান্তি সাহেবদের বলেছে, হিন্দুমুসলমান বিবাদের মধ্যে তারা হস্তক্ষেপ করছে কেন। টমাসের সৈন্যদল বিধ্বস্ত করে সন্তানেরা জয়লাভ করার পরে হিন্দুদের উৎসাহ-উত্তেজনা এবং মুসলমানদের উপরে অত্যাচার করার বিবরণ আছে চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে।

বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থত মুসলমান-বিদ্বেষী ছিলেন কিনা, থাকলে কতটা ছিলেন, তা আমার আলোচ্য নয়, একটি উপন্যাসের নজির তুলে সে বিষয়ে সিদ্ধান্তও করা চলে না। সঙ্গে সঙ্গে একথা মেনে নেব, আনন্দমঠ উপন্যাসে তিনি শেষ পর্যায়ে মুসলমান নবাবদের শাসনের তীব্র নিন্দা করেছেন। মীরজাফর-মীরণের শাসনকাল জনজীবনের দিক থেকে যে বিপর্যয়কর ছিল তা যে কোনো মতের ঐতিহাসিকই অস্বীকার করবেন না[৬]। এর দ্বারা বঙ্কিমের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা প্রমাণ করা যায় না। তবে পূর্বোক্ত চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদের গোড়াকার বিবরণে বিদ্বিষ্ট মনোভাবের ছাপ আছে[৭]। কিন্তু স্পষ্টই

---

৫. 'ধর্মতত্ত্ব ঃ বঙ্কিমচন্দ্র।

৬. নবাব মীরকাশিমের শাসন সম্পর্কে বঙ্কিম সপ্রশংস ছিলেন, চন্দ্রশেখর থেকে এই ধারণা মনে আসে।

৭. 'সীতারামে'র হিন্দুরাজত্বে কিন্তু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছিল না।

এই মুসলমান-বিরোধিতা আনন্দমঠের কাহিনীর সঙ্গে খাপ খায়নি। পলাশীর যুদ্ধের পরে শাসনের দায়িত্ব মুসলমান নবাবদের উপর থাকলেও তারা প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ইংরেজদের হাতের পুতুল ছিল। একথা বঙ্কিম ভালোভাবেই জানতেন, তার প্রমাণ চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দলনীর কাছে মীরকাশিমের কথায় (আগে উদ্ধৃত হয়েছে) পাওয়া যাবে। সন্তানদের প্রকৃত যুদ্ধ কাদের বিরুদ্ধে? টমাস-এডওয়ার্ডস-এর বাহিনীকে তারা হারিয়ে দিয়েছে। মুসলমান নবাব কোথায়–কোনো মুসলমান সেনাধ্যক্ষেরও দেখা মেলে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এর অর্থ বেশ স্পষ্ট ও উচ্চকণ্ঠ। ইংরেজেরা শুধু অর্থ সংগ্রহ না করে যাতে রাজ্যশাসনের ভার প্রত্যক্ষত গ্রহণ করে সন্তানবিদ্রোহের তাই-ই উদ্দেশ্য–মহাপুরুষের এই মত গল্পের সঙ্গে মেলে না, স্বয়ং সত্যানন্দ তা মেনে নিতে পারেনি।

কাজেই আনন্দমঠ উপন্যাসে মুসলমান-বিরোধিতার যে অংশগুলো আছে তার কারণ–

১. বঙ্কিমের মনে অবশ্য হিন্দু-জাতীয়তাবাদী ভাবনা ছিল, হিন্দুর নেতৃত্বে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের আদর্শ ছিল।

২. প্রত্যক্ষ ইংরেজ-বিদ্বেষকে ঢাকার জন্য মুসলমান-বিরূপতার আড়ালটিকে জোরালো ভাষায় (যদিও অসংলগ্নভাবে) প্রকাশ করা হয়েছে।

৩. ইংরেজি শিক্ষার মহিমায় বিশ্বাস এবং মুসলমানী আমলের মধ্যযুগীয় ভাবধারায় অনাস্থার পরোক্ষ প্রভাবও থাকা সম্ভব।

তিন

আনন্দমঠ উপন্যাসের মানুষেরা সংখ্যায় অনেক। বিশাল ভীড়ের মধ্যে দিয়ে তাদের কয়েকজনকে একটু বিশেষ করে চেনা যায় – কতটা তা অবশ্য আলোচনার বস্তু। প্রথমে ওদের নাম কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করে তালিকাবদ্ধ করা যাক –

ক. ১. মহাপুরুষ

খ. সন্তানগণ – ১. সত্যনন্দ ২. জীবানন্দ ৩. ভবানন্দ ৪. ধীরানন্দ ৫. জ্ঞানানন্দ ৬. মহেন্দ্র ৭. শান্তি (নবীনানন্দ)

গ. গৃহী – ১. মহেন্দ্র ২. কল্যাণী ৩. নিমাই

ঘ. নারী – ১. শান্তি ২. কল্যাণী ৩. নিমাই

ঙ. কোম্পানির সেনাধ্যক্ষ – ১. টমাস ২. এডওয়ার্ডস

এই বিশাল জনসমাবেশে মাত্র বার জন উল্লেখ করার মতো পাত্র-পাত্রী। তাদের মধ্যে আবার ছ'জনকে শুধু চরিত্র হিসেবে কিছু গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে – সত্যানন্দ জীবানন্দ ভবানন্দ মহেন্দ্র শান্তি কল্যাণী। এদের কারুর মধ্যে মানবস্বভাবের কোনো-দুর্জ্ঞেয় রহস্য নেই, জটিল চিত্রবৃত্তির বহুমুখিতা নেই। এরা প্রত্যক্ষত যতটুকু ততটুকুই। এবং এরা স্পষ্ট জীবন্ত এবং অনেকখানি বিশ্বাস্য।

কোম্পানির দুই সেনাধ্যক্ষ টমাস ও এডওয়ার্ডস খুব অল্প সময়ের জন্য পাঠকের সামনে এসেছে। পরিস্থিতির মধ্যে বৈচিত্র্য নেই। তাদের পৃথক করে চিনে নেবার সুযোগ নেই। উপন্যাসে তাদের বিশেষভাবে দেখতেও চান না লেখক। তারা প্রয়োজনীয় যতটুকু ততটাই ধরে দিয়েছেন। কিন্তু এরকম ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র খুব অল্প আয়োজনে দুজনকে মানুষ হিসেবে পৃথক করে এঁকেছেন। যেমন –

১. টমাস। বীর ও সাহসী। রণবিশারদ। নারীরূপে মুগ্ধ এবং লুব্ধ। ভোজনলোলুপ ও কৌতুকের পাত্র।

২. এডওয়ার্ডস। বীর ও সাহসী। রণবিশারদ। নারীরূপে মুগ্ধ তাই অপাত্রে বিশ্বাসী। উচ্চাভিলাষী – শক্তিগর্বিত ও কৌতুকের পাত্র।

সন্ন্যাসীবেশিনী শান্তি টমাসের হাত থেকে বন্দুক কেড়ে নেওয়ায় তার বীরত্ব অপ্রমাণ হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে যেভাবে সে মৃত্যুবরণ করেছে তাতে সেনাপতিরূপে তার মহিমা অমলিন থাকে। এডওয়ার্ডস অবশ্য মেলা আক্রমণের কথা প্রচার করে পদচিহ্নগড় প্রায় রক্ষীহীন করে ফেলেছিল। টমাসের তুলনায় সে রণকৌশলে আরও সিদ্ধ মনে হয়। শান্তিকে দেখে টমাসের রূপমুগ্ধতা, সরাসরি লোলুপ প্রস্তাবের রূপ ধরেছিল। এডওয়ার্ডস মোহগ্রস্ত হয়নি এমন নয়, না হলে চতুর সেনাপতি বৈষ্ণব বিদ্রোহের দেশে এক অপরিচিতা বৈষ্ণবীকে এত সহজে গুপ্ততথ্য সন্ধানে নিযুক্ত করত না। শান্তির চোখ দিয়ে দুজনকেই কৌতুকের পাত্র করে তোলা হয়েছে, – টমাসে ইন্দ্রিয় ও রসনা-লোলুপতার মিশ্রণের ফলে, এডওয়ার্ডসের ক্লাইভের মতো মহাবীর জেনারেল বলে নিজেকে মনে করায়।

বঙ্কিম তাঁর নরনারীকে দিয়ে কোম্পানির পদস্থ সাহেবদের প্রায় বিদ্রূপ করিয়াছেন–প্রায়ই তা মোটা দাগের। এতে অবশ্য পরাজিত জাতির বিদ্বেষের প্রকাশ, শিল্পগুণ কিছু নেই।

আনন্দমঠে নারীর ভূমিকা বেশি নয়। শান্তিকে দিয়ে রমণী উপাদানকে একটু বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, তাও ওকে পুরুষ সাজিয়ে। যে তিনটি নারী চরিত্র-বৈশিষ্ট্য পেয়েছে তাদের একটি গুচ্ছ হিসেবে দেখা যাক।

নারী হিসেবে

	বিবাহ	সংসার	স্বামীসঙ্গ	কামনার পাত্রী	বুদ্ধি ও ক্রিয়া	মূল্য ও স্বভাবধর্ম
শান্তি	+	–	–	+		অতিশয্য রোমান্টিকতা
কল্যাণী	+	+–	–	+		অনুল্লেখ্য পাতিব্রত্য
নিমাই	+	+	+	–		অনুল্লেখ্য বাৎসল্য

[সংকেত : + = হ্যাঁ; – = না; + – = হ্যাঁ এবং না]

প্রথমেই বলা সঙ্গত নিমাই-এর উপস্থিতি নেহাৎই প্রাসঙ্গিক। কোনো প্রান্ত থেকেই উপন্যাসের ভেতরে সে ঢুকবার পথ পায়নি। কল্যাণী বৃত্তের সীমায়– কেন্দ্রের দুই ব্যক্তি মহেন্দ্র-ভবানন্দের জীবনে তার গুরুতর প্রভাব ! শান্তি অন্য পাত্রের হাত ধরে নয়, স্বয়ং বইয়ের এক কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। শান্তির পুরো পরিচয় অবশ্য এই ছকে মিলবে না। তার ভূমিকা বিস্তৃত এবং বহুমুখী। নারী হিসেবে সেও কল্যাণী-নিমাইয়ের মতো বিবাহিত। কিন্তু ওরা দুজনই সংসারী – পরিবারধর্মে সুস্থিত। কল্যাণীর ঘর ভেঙে গেলেও মনের গঠন বদলায়নি। শান্তি কখনও ঘরের নয়। নিমাই সাধারণ গৃহস্থবধূ, সুখে দুঃখে স্বামী-সঙ্গে তার বাস। শান্তি-কল্যাণী দুজনেই স্বামী-বিচ্ছিন্না। শান্তি, স্বেচ্ছাবৃত আদর্শবাদে, কল্যাণী অনেকখানি ঘটনাচক্রে। মহেন্দ্রকে দেশোদ্ধার ব্রতে যোগ দেবার সুযোগ করে দিতে তাকে দিয়ে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। সেটুকু আরোপ, চরিত্রের মধ্য থেকে আসেনি।

কল্যাণী-শান্তি দুজনেই রূপসী মনে সে রূপ কামনা জাগায়। কল্যাণী সন্তানদলের এক মুখ্য ব্যক্তির চিত্তবৈকল্য ঘটিয়েছিল। অবশ্য এ বিষয়ে তার নিজের কিছু করণীয় ছিল না। ভবানন্দের হৃদয়দৌর্বল্য তাকে স্পর্শ করেনি, বরং আদর্শচ্যুত সন্ন্যাসী সম্পর্কে বিরূপ করেছে। এ বিরূপতায় ফাঁক ছিল না। শান্তির কপালে যে আগুন ছিল তা নিজের স্বামীকেই দগ্ধ করেছে। সাহেবদের চাঞ্চল্য বহিরঙ্গ। সে বিষয়ে শান্তি সচেতন এবং সতর্কও।

স্বভাবধর্মের দিক থেকে কল্যাণী বেশ সরল। অতিপরিচিত পাতিব্রতা তার চরিত্রের একমাত্র পরিচয়। ঘটনাগত উত্থাপতন তার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে, চরিত্রে কোনো বাঁক তৈরি করেনি, বা কিছুমাত্র জটিলতাও।

সরলস্বভাব নিমাইয়ের মধ্যে, বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে বাৎসল্য – বঙ্কিমের উপন্যাসে যে উপাদান খুবই দুর্লভ। সন্তানহীনা নারী অন্যের কন্যাকে লালন করেছে এবং বাধ্য হয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে ও দুঃখ পেয়েছে। বিষয়টার মধ্যে আলোচনার যোগ্য কিছু নেই, তবে সহজগ্রাহ্য স্বাভাবিকতা আছে। লেখক অন্তত ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় দেননি।

শান্তির চরিত্রের মূলে রোমান্টিকতা – সে বিষয়ে পরে ভাবা যাবে।

আনন্দমঠের আশ্রয় যে সন্তানদল তাদের কথা বলার আগে মহাপুরুষ বিশেষিত চরিত্রে প্রবেশ করা যাক। মৃত (বা মৃতপ্রায়) জীবানন্দকে অতিলৌকিক উপায়ে (বা অত্যাশ্চর্য চিকিৎসায়) সে বাঁচিয়ে তুলেছে, শেষ পর্যন্ত সত্যানন্দকে কর্মক্ষেত্র থেকে একরূপ জোর করে জ্ঞানসাধনার জন্য নিয়ে গেছে। চরিত্রটি রক্তমাংসের নয় বলে আপত্তি করে লাভ নেই। অন্য ধাতু দিয়ে একে গড়া হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র অতিলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যে সব সন্ন্যাসী মহাপুরুষের চরিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে এই ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য এখানে যে তাকে অমানবিক শক্তির অধিকারী বলে মনে না করলেও ক্ষতি নেই। জীবানন্দের জীবনপ্রাপ্তি দুর্জ্ঞেয় চিকিৎসাগুণে হতে পারে, তার দেহে জীবন থাকা অসম্ভব ছিল না–আবার এই প্রাণলাভ একেবারেই প্রতীকী, এমন সিদ্ধান্তও অসঙ্গত নয়। স্বয়ং লেখক মহাপুরুষকে বিসর্জন, কল্যাণ প্রভৃতি আদর্শের শরীরীরূপ বলেছেন; জ্ঞানমার্গের

মূর্ত ব্যক্তি সে এবং মানবচিত্তের সর্ববিধ অপূর্ণতা ব্যাধির চিকিৎসক। কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তব সম্পর্কে তার সর্বজ্ঞতা, অবিশ্বাস্য রকমের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি ঋসির মহাপ্রজ্ঞার সঙ্গেও সুসমঞ্জস্য নয়। এই অংশ আরোপিত, গোটা উপন্যাসের ইংরেজ-বিরোধিতা কিছু আবৃত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত।

মহাপুরুষকে আশ্রয় করে বঙ্কিম রাজনীতি এবং তত্ত্ববোধের সে সূত্রগুলি এনেছেন, উপন্যাসের মুখ্য ঘটনাংশে ও পাত্রপাত্রীতে তাকে ওতপ্রোত করা হয়নি। তবে মহাপুরুষের রহস্যাবৃত ঋষিজনোচিত বিশাল ব্যক্তিত্ব কতকটা ছায়াময় বরে অনেকটাই বিশ্বাস্য। অবশ্য তাকে দিয়ে যে কাজ করানো হয়েছে তা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে ঐ বিশ্বাস আহত হয়।

মুখ্য সন্তানদের একটা গোষ্ঠী হিসেবে দেখার জন্য একটা ছক ব্যবহার করা হলো।

	সন্তানধর্ম			অন্য	লক্ষণ
	বীরত্ব	ইন্দ্রিয় জয়	আদর্শনিষ্ঠা	রসিকতা	চাতুর্য
সত্যানন্দ	+	+	+ –		+
জীবানন্দ	+	+ –	+	+	
ভবানন্দ	+	–	+		
ধীরানন্দ	+	+	+		+
জ্ঞানানন্দ	+	+	+		+
মহেন্দ্র	+	+ –	+		
নবীনানন্দ	+	+ –	+	+	+
(শান্তি)					

[সংকেতচিহ্নের ব্যাখ্যা : + = হ্যাঁ; – = না; + – = হ্যাঁ এবং না। ফাঁকা থাকলে বুঝতে হবে 'অজ্ঞাত'।]

সন্তান-নেতৃবর্গ সকলেই বীর, সকলেই আদর্শনিষ্ঠ। দলনেতা সত্যানন্দের ক্ষেত্রে '+ –' চিহ্ন দেওয়া হয়েছে, কারণ কর্মের পথ ত্যাগ করতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। এ পরীক্ষায় অন্য কাউকে পড়তে হয়নি। ইন্দ্রিয়জয়ী হওয়া সকলেই অভীষ্ট। কিন্তু ভবানন্দের পতন দ্রুত এবং অবাধ। প্রবৃত্তির পথ থেকে ফিরে আসার কারণ কল্যাণীর প্রত্যাখ্যান, নিজের বিবেকবোধ নয়। এ কারণে স্বভাবত সে ইন্দ্রিয়জয়ী নয় বিবেচনায় '–' চিহ্ন ব্যবহার করা হলো। জীবনান্দ মহেন্দ্র এবং শান্তির মধ্যে হৃদয়দৌর্বল্য ও আত্মসংযমের দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় নানা মাত্রায় সক্রিয়।

ধীরানন্দের চাতুর্য ভবানন্দকে পরীক্ষা করায়, জ্ঞানানন্দের গুরুকে কারামুক্ত করায় আর সত্যানন্দের সামগ্রিক সাংগঠনিক নেতৃত্বে।

প্রধান চরিত্রগুলির কথা আরও কিছু ভাবার সুযোগ আছে। কারুর মধ্যে অসাধারণ কোনো জটিলতা নেই, জীবনরহস্যের গভীরতা নেই। তবু উল্লিখিত সন্তান-নায়কদের মধ্যে তারা কিছু বিশেষ ব্যক্তিত্ব লাভ করে। ধীরানন্দ জ্ঞানানন্দকে আমরা কমই পেয়েছি। তারা সন্তান নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলীতে স্থিত থেকেছে। মহেন্দ্রও

বিশিষ্টতাহীন, যদিও অনেকটা জায়গা জুড়ে মানবিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধে তাকে দেখানো হয়েছে। মহেন্দ্র সংসারী ভদ্রলোক, মন্বন্তরের ধাক্কায় ঘর ছাড়া। স্ত্রী-কন্যার প্রতি গভীরভাবে আসক্ত, ঘটনাচক্রে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ক্ষুধিত দস্যু বা সরকারী সিপাহী যারাই এই বিচ্ছেদ ঘটাক, দুর্ভিক্ষের ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ঘূর্ণিই এর জন্য মূলত দায়ী। মহেন্দ্র সত্যানন্দের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হতে চাইল। কিন্তু স্ত্রী-কন্যার বন্ধন মনের জোরে ছিঁড়ে ফেলার মতো প্রবল মানসিক আবেগ বা শক্তি তার ছিল না। কল্যাণী 'আত্মহত্যা' করে তার সন্তানদলে যোগদান সুগম করে দিল। না হলেও তীব্র চিত্তদ্বন্দ্বের শিকার সে হতো এমন কথা বলা যায় না। কোনো আবেগেরই তীক্ষ্ণতা বা গাঢ়তা নেই মহেন্দ্রের চরিত্রে। সন্তাননায়ক হিসেবেও সে ম্রিয়মাণ। স্ত্রী-কন্যাকে ফিরে পেয়ে অবশ্য সানন্দ, কিন্তু তাতে বাঁধভাঙা জোয়ারের চিহ্ন নেই – থাকার সুযোগও ছিল না মহেন্দ্রের চরিত্রে। সাধারণ সাংসারিকতার সীমায় বদ্ধ মন তার, আবার ঘটনাপ্রবাহে সন্তানধর্মের সুশৃঙ্খল চৌহদ্দিতেও সে মানিয়ে যায়। হারানো স্ত্রী-কন্যার জন্য কিছু বিষণ্ণতা মাত্র লেগে থাকে।

ভবানন্দ খুব বেশি জায়গা জুড়ে নেই, বেশি ঘটনায়ও সংশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু সে স্বেচ্ছায় নিয়ম ভেঙেছে এবং স্বেচ্ছায়ই তার জন্য চূড়ান্ত মূল্য দিয়েছে। তার বিধিলঙ্ঘন পাপাচারই। অথচ সে দেশপ্রেমী মহাব্রতী। নারীরূপমুগ্ধতা ছাড়া অন্য কোনো দুর্বলতা তাকে স্পর্শও করেনি। নারীর প্রতি লোভ সন্তান হিসেবে তার পাপ – একথা জেনেও সে কল্যাণীতে ভীষণ আসক্ত হয়েছে। অতি তীব্র এই কামনা – আর তীব্র বলেই ভবানন্দের ব্যক্তিত্ব একটি স্পষ্ট ছবি হয়ে উঠেছে–

ভব। ...তুমি আবার বিবাহ করিতে পার।

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। বিবাহ করিবে?

ক। তোমার সঙ্গে নাকি?

ভব। যদি তাই হয়?

ক। সন্তানধর্ম কোথায় থাকিবে?

ভব। অতল জলে।

ক। এই মহাব্রত? এই ভবানন্দ নাম?

ভব। অতল জলে।

ভবানন্দ জানে তার এই প্রণয়নিবেদন নিস্ফল। কল্যাণী তার প্রস্তাবে সাড়া দেবে এরূপ আশা সে কখনো করেনি। তবুও এই প্রস্তাব এক রমণীয় স্বপ্ন – এই আত্মপ্রকাশ এক যন্ত্রণাবিদ্ধ আত্মতৃপ্তি। এর বেশি কিছু তাঁর প্রাপ্তির সীমায় আসে না

ক। আমি তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলে, তুমি মরিবে?

ভব। নিশ্চিত মরিব।

ক। আর যদি মনস্কামনা সিদ্ধ না করি?

ভব। তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত...।

সন্তানধর্ম ভবানন্দ অতলে জলে ডুবিয়েছে–ইন্দ্রিয়কামনায় কাছে আত্মসমর্পণে। কল্যাণীকে নিয়ে সন্তানমণ্ডলী ত্যাগ করে সুখের জীবনযাপন করার উদ্দেশ্যে নয় – সম্ভবত সেরূপ আশা সে কদাপি পোষণ করেনি। কারণ এদের দেখা সাক্ষাৎ আগেও হয়েছে, কথাবার্তাও। কিন্তু কল্যাণীর দিক থেকে কোনো প্রশ্রয় ভবানন্দ পায়নি। তার ইঙ্গিতমাত্র রচনার কোথাও নেই। এই আগ্নেয় আত্মনিবেদনেই তার কামনার ক্লাইম্যাক্স – এর পরে অনিবার্য আত্মবিনাশ। প্রত্যাখ্যাত হয়েই মাত্র ভবানন্দ অনুশোচনা করেছে (তৃতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে), নিজের গভীরে আত্মজয়ের চেষ্টার পরিচয় নেই। ভবানন্দ আসক্তিতে যখন মজ্জিত তখন কিংবা অনুশোচনায় বা বীরদর্পে রণক্ষেত্রে আত্মদানে সর্বদা নিষ্ঠাবান সন্তান। কামনার অতল জলে সে সন্তানধর্মকে ডুবিয়ে দেয়নি, আপনাকে নিঃশেষ করেছে।

জীবানন্দ শান্তির সাহচর্য উপন্যাসে বিস্তৃত স্থান অধিকার করে আছে। তার পূর্ব গার্হস্থ্য জীবনের পরিচয়ও প্রসঙ্গত এসে পড়েছে। তাতে তার রোমান্টিক কবিস্বভাবের কিছু নিদর্শন মিলছে। অনাথা বালিকাকে আশ্রয় দান করতে গিয়ে পিতামাতার সঙ্গে সে বিরোধ করেছে। শান্তিকে বিয়ে করে ফেলেছে। এর পেছনে দাক্ষিণ্যের ভাবটি সোচ্চার। কিন্তু এই বহির্মুখ পুরুষালি মেয়েটি ভেতর থেকে তার মনোহরণ করছিল। শুধু দাক্ষিণ্য কি এতদূর নিয়ে যেত? অথবা পরে প্রবাস-প্রত্যাগতা নবযৌবনপ্রাপ্তা শান্তির প্রতি জীবানন্দের নলোচ্ছ্বসিত মনোযোগে তার নিশ্চিত প্রমাণ। এই অসাধারণ গৃহবিমুখ মেয়েটির প্রতি জীবানন্দের এই অসাধারণ আকর্ষণ তার স্বভাবের এক বিশিষ্ট লক্ষণকেই নির্দেশ করে। জীবানন্দ রোমান্টিক।

জীবানন্দ সন্তানধর্ম গ্রহণ করে শান্তিকে ত্যাগ করে চলে গেল। এর মধ্যে বিপ্লবপন্থার নবতর রোমান্টিক আকর্ষণ ছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়জয়েরর আস্তরণের নিচে শান্তির প্রতি অতি প্রবল আকর্ষণ বহমান ছিল, নিমাইয়ের চেষ্টায় তাদের দেখা হওয়া মাত্র তাই আদর্শবাদের বাধা মুহূর্তে ভেসে গেল। 'তোমায় দেখিলে আমি ফিরিতে পারি না। এক দিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎ সংসার; এক দিকে ব্রত, হোম যাগযজ্ঞ; সবই এক দিকে আর একদিকে তুমি। একা তুমি। ....চল গৃহে যাই আর আমি ফিরিব না'

শান্তি নানাভাবে জীবানন্দের অনায়ত্ত থেকে গেছে, মিলন স্বল্পকালীন, তাই দীর্ঘবিচ্ছেদ তৃষ্ণা বাড়িয়েছে, দাম্পত্য প্রেমে রোমান্টিক স্বপ্নবাসনা পূর্ণ হয়ে থেকেছে।

এই-ই জীবানন্দের ব্রতভঙ্গ। নিজের জীবন দিয়ে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। ভবানন্দের সঙ্গে কার্য ও ফলে মিল অথচ অনেক পার্থক্য। জীবানন্দের ব্রতচ্যুতি সন্তানসংগঠনের কঠোর বিধানে। নৈতিকতার কোনো প্রশ্নে স্ত্রীর সঙ্গে সংযোগ দোষাবহ বিবেচিত নয়। ভবানন্দের স্খলন শুধু সন্তানদের দলীয় আদর্শের দিক থেকে নয়, সামাজিক নীতিবোধের মাপকাঠিতে, কারণ কল্যাণী পরকীয়া। জীবানন্দের পাপের কথাই ওঠে না, অনুশোচনারও নয়; ভবানন্দ পাপবোধে-অনুশোচনায় অন্তরে দীর্ণ। জীবানন্দ ভালোবেসেছে, ভালোবাসা পেয়েছে; ভবানন্দের হৃদয় প্রতিরোধে মিথ্যা মাথা খুঁড়েছে। ভবানন্দে গম্ভীর বিষণ্ণতা, জীবানন্দে উচ্চকণ্ঠ কৌতুক।

শান্তির চরিত্রে রোমান্টিক নায়িকার বিচিত্র লক্ষণ আছে। তার বাল্য কৈশোরের পুরুষালি স্বভাব ও বন্ধন-অসহিষ্ণুতা কিভাবে নারীত্বে রূপান্তরিত হলো তার কবিত্বে-মেশানো বর্ণনা আছে দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে। 'অপ্সরোগণের ভ্রূবিলাসযুক্ত কটাক্ষের জ্যোতি লইয়া অতিযত্নে নির্মিত যে সম্মোহনশর, পুষ্পধন্বা তাহা পরিণীত দম্পতির প্রতি অপব্যয় করেন না।....কিন্তু আজ বোধহয় পুষ্পধন্বার কোনো কাজ ছিল না–হঠাৎ দুইটা ফুলবাণ অপব্যয় করিলেন। একটা আসিয়া জীবানন্দের হৃদয় ভেদ করিল–আর একটা আসিয়া শান্তির বুকে পড়িয়া, প্রথম শান্তিকে জানাইল যে, সে বুক মেয়েমানুষের বুক–বড় নরম জিনিস। নবমেঘ-নির্মক্ত প্রথম জলকণানিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায়, শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া, উৎফুল্ল নয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।' প্রেমের প্রথম আবির্ভাবে সুপ্ত নারী জেগে উঠল। বঙ্কিম মুখ্যত বিধিলঙ্ঘী প্রেমের যন্ত্রণার শিল্পী হলেও দাম্পত্য প্রণয়কে কখনো কখনো নিপুণ হাতে রোমান্টিকতায় পুষ্পিত করে তুলেছেন। শান্তিতে তার নিদর্শন।

শান্তি ব্যক্তিত্বময়ী নারী। স্বামীকে ব্রতচ্যুত করিয়ে একান্তভাবে পেতে পারে, কিন্তু ফলে আদর্শভ্রষ্ট পুরুষের অভ্যন্তরে ক্রমে গ্লানি জমে ওঠা যে সম্ভব–এই বোধ তার ছিল। তা ছাড়া আনন্দমঠে সেই স্বাধীনবুদ্ধি দিয়ে সন্তানদের উদ্দেশ্যের মহিমা বুঝেছিল। জীবানন্দকে সে বাঁধেনি, বরং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে প্রিয়সম্মিলনের ফলে তার এতকালের নৈমিত্তিক জীবন দুর্বহ হয়ে উঠল। সে সন্তানদলে যোগ দিল পুরুষের ছদ্মবেশে। তীক্ষ্নবুদ্ধি কর্মতৎপর বীর নবীনানন্দরূপী শান্তি একেবারেই রোমান্সের নায়িকা। তার পরবর্তী আচরণ সরলভাবে ঐ পরিচয়বহন করে চলেছে। মাত্র একটি দিকে দৃষ্টি না পড়ে পারে না–সন্তানের আদর্শের চৌহদ্দী বজায় রেখে সে স্বামীর কাছে স্থায়ীভাবে থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে চাতুর্য সাহস ব্যক্তিত্বের জোরে। এমন কি জীবানন্দের উপরেও তার চরিত্রের প্রভুত্ব ছিল। জীবানন্দ যত বড় বীর হোক শান্তির ব্যক্তিত্বের বল বড় এমন ধারণা জন্মে। অচতুর রণদুর্মদ (যুদ্ধ ও মৃত্যুও ছেলেখেলার মতো–তার শেষ যুদ্ধ স্মরণযোগ্য) রোমান্টিক জীবানন্দকে নবীনানন্দের তুলনায় কিঞ্চিৎ বালক-স্বভাব মনে হয়েছে।

জীবানন্দ-শান্তি, ভবানন্দ-কল্যাণী, মহেন্দ্র-কল্যাণী এদের সব কাহিনী অখণ্ডতায় ধরে রেখেছে সন্তান-সংগঠন এবং ব্যক্তি হিসেবে সত্যানন্দ।

সত্যানন্দ জিতেন্দ্রিয়, আদর্শনিষ্ট ও তত্ত্বপ্রচারক, কর্মের মূল সংগঠক, অতি চতুর নেতা, সর্বত্রসঞ্চারী তীক্ষ্নদৃষ্টিধর। যেভাবে সে দলের কেন্দ্রীয় স্তর সুগঠিত করেছে, নিয়মতন্ত্র রচনা করেছে, অস্ত্র নির্মাণের ব্যবস্থা করেছে তাতে উচ্চ প্রতিভার পরিচয় আছে। তীব্র দেশপ্রেম এবং উদ্দীপ্ত ধর্মবোধ যেমন আবেগ-গাঢ় তেমনি বাস্তব কর্মতৎপরতার সঙ্গে সমন্বিত। প্রয়োজনে চর নিয়োগ করে সন্তাননেতাদের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা, আবার দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ব্রতচ্যুত ব্যক্তিদের অকারণ প্রাণত্যাগ থেকে নিবৃত্ত করা–তাদের প্রায়শ্চিত্তকেও স্বদেশমুক্তির অঙ্গ করে তোলা–অবয়হীন তত্ত্ববোধকে বাস্তবসম্মত কার্যকর রূপদানে সত্যানন্দের বৈশিষ্ট্য। ক্বচিৎ ব্যক্তিগত

মমত্বে তাকে দ্রবীভূত হতেও দেখি, শান্তির কুটিরে আলাপের কথা মনে করা যেতে পারে।

কিন্তু সত্যানন্দ বঙ্কিম-উদ্ভাবিত কর্মজ্ঞানের সমন্বয়তত্ত্ব ভেদ করে দেশপ্রেমে জ্বলে ওঠে উপন্যাসের সমাপ্তিতে। মহাপুরুষ যখন ইংরেজ রাজত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, সত্যানন্দকে কর্মক্ষেত্রে থেকে অপসৃত করতে আগ্রহী, জ্ঞানলাভের জন্য শিষ্যকে আহ্বান জানান। তখন–

সত্যানন্দ। হে মহাত্মন। আমি জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা রাখি না–জ্ঞানে আমার কাজ নাই– আমি যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছি, ইহাই পালন করিব। আশীর্বাদ করুন, আমার মাতৃভক্তি অচলা হউক।

মহাপুরুষ। ব্রত সফল হইয়াছে–মার মঙ্গল সাধন করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ পরিত্যাগ কর, লোক কৃষিকার্যে নিযুক্ত হউক, পৃথিবী শস্যশালিনী হউন, লোকের শ্রীবৃদ্ধি হউক। সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, 'শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া যাতাকে শস্যশালিনী করিব।'

সত্যানন্দের মনোভাব বদলানো যায়নি। মহাপুরুষ এবং বঙ্কিম তাকে জোর করে কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারিত করেছেন। মূলত বিপ্লবী নেতা সত্যানন্দ ঔপন্যাসিকের সযত্ন উদ্ভাবিত তত্ত্বাদর্শ অস্বীকার করে ব্যক্তি হিসেবে সত্য হয়ে উঠেছে।

চার

কিন্তু কোনো ব্যক্তিচরিত্রের গভীরতায় তলিয়ে যাওয়ায় নায়, জটিলতায় আবর্তিত হবার মধ্যেও নয়, এ উপন্যাসের মহিমা অন্যত্র। যেসব ব্যক্তির গুরুত্ব কিছু আছে তারা জনতাসমুদ্রের ঢেউয়ের মতো, কিছু বড় বা ছোট–বিশেষ করে চোখে পড়ে, কিন্তু আসলে ঐ সমুদ্রেরই অঙ্গ। এ নাটকে কোনো ব্যক্তির নায়কত্ব নয়; জীবানন্দ-ভবানন্দ-মহেন্দ্র কোনোটি মুখ্য, কোনটি গৌণ কাহিনী নয়। সব মিলিয়ে মহাকাব্যোচিত স্বাদ। কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে সত্যানন্দ আর পরিধিতে অনেক মানুষ, অনেক যুদ্ধ,–এক মহাসঙ্গীতের সুরে যাদের অচ্ছেদ্য একাগ্রতা।

লেখক রাজকীয় আড়ম্বর ও ভোগোপকরণের ছবি আঁকেননি, ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিকতাকে অভিপ্রায় করে তোলেননি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যারা শিকার সেই সহস্র সহস্র নরনারী শতশত গ্রাম, সন্ন্যাসীবিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল যারা সেই বিপুলসংখ্যক সন্তানেরা দলে দলে এই উপন্যাসের মধ্যে ভীড় জমিয়েছে। তাদের যুদ্ধ পলায়ন জয়োল্লাস, তাদের সমবেত সঙ্গীত শত্রুনির্যাতন লুঠতরাজ প্রভৃতির বিবরণ উপন্যাসের একটা প্রধান স্থান দখল করেছে। এরই সাহায্যে লেখক একটা জাতির জীবনের সমগ্রতার ও বিশালতার সুর বাজাতে চেয়েছেন। কতকটা সফলও হয়েছেন। একজন ভবানন্দের পাপ ও যন্ত্রণা, একজন জীবানন্দের প্রণয় ও প্রায়শ্চিত্ত ছাপিয়ে সপ্তকোটি কণ্ঠের কলকল নিনাদ এ উপন্যাসে ধ্বনিত হয়েছে।

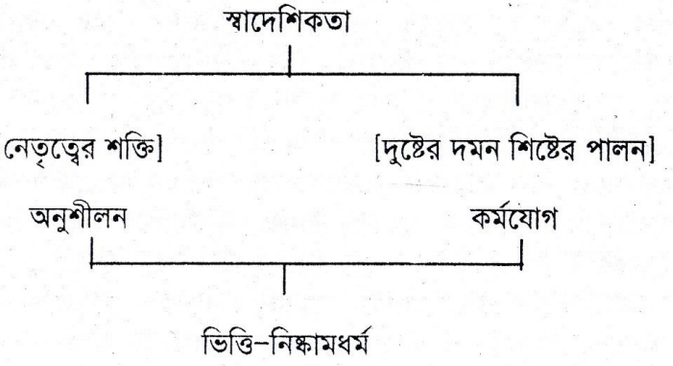
১২ দেবীচৌধুরাণী :
অপুষ্ট তত্ত্ব-রাজনীতি মানুষ

এক

বঙ্কিমচন্দ্র তত্ত্ববোধ তথা জাতীয়তাবাদের পরিমণ্ডলে দ্বিতীয় বই দেবীচৌধুরাণী লিখলেন। এই উপন্যাস আনন্দমঠ থেকে মেজাজে ও মাপে আলাদা। আনন্দমঠের মহাকাব্যিক বিস্তার এখানে নেই। এটি বিশেষভাবে এক নারীর জীবন ও চরিত্র-বিকাশের কাহিনী। কখনও তার সঙ্গে দেশকাল মিশেছে, কিছু ব্যাপকতা এসেছে–গুণগত কোনো মাত্রা নয়, পরিমাণও অল্পই। একটা রোমান্টিক কমেডির রূপ এ গল্পে ছিল। নায়ক চরিত্রের অপদার্থতায় তা নষ্ট হয়েছে। তাত্ত্বিকতার এত জোর নেই যাতে তাকে অন্য মূল্যে কিছু উদ্ধার করা যায়। বরং সে তত্ত্বের মধ্যেই সামঞ্জস্য আছে কিনা প্রশ্ন থেকে যায়।

দেবীচৌধুরাণীর বিষয়ভিত্তি নিষ্কাম ধর্মে। তা থেকে দুদিকে ভাব-বিস্তার ঘটেছে। ব্যক্তিগত অনুশীলনের চরমসিদ্ধি একদিকে, নেতৃত্বের শক্তি এসেছে এই পথে; অন্যধারে কর্মযোগ,–যার অপর নাম দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন। স্বাদেশিকতার কিছু ব্যাপার এই দুই সূত্রের সংযোগে আমদানি-করা।

বিষয়বস্তুর ভিত্তি থেকে শাখায়িত বিকাশকে এইভাবে একটি নক্সায় দেখানো যায়–



সামগ্রিক বিষয়টির কর্তা ভবানী পাঠক, কর্মযোগের পরিকল্পনা ও অনুষ্ঠান-নেতৃত্ব তার। ব্যক্তিগত অনুশীলনের বিষয়টি তার তত্ত্বাবধানে সিদ্ধ। স্বাদেশিকতার ভাবনা ভবানী পাঠক ছাড়া আর কারও মস্তিষ্কে ঠিকঠাক রূপ নিয়ে ধরা ছিল না। অথচ এই উপন্যাস ভবানী পাঠকের গল্প নয়।[1]

প্রফুল্লের আশ্রয়ে ভবানী-নির্ধারিত অনুশীলন-সাধনাই মাত্র সবিশেষ পরিস্ফুট হয়েছে। দুষ্টের দমন প্রফুল্লের নেতৃত্বে হয়েছে কিনা সন্দেহ, নামে হয়েছে। দানেই মাত্র তাকে সরাসরি সক্রিয় হতে দেখি। বাকি রানীদিঘি দোকানদারি। প্রফুল্লের চরিত্রে নিষ্কামধর্মের আদর্শ সম্পূর্ণ আত্মস্থ ও ফলবতী হয়েছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করার পক্ষে প্রধান বাধা–

১. উপন্যাসের তত্ত্বভাবনার একটা দিকেই মাত্র (অনুশীলন) প্রফুল্লের অবস্থান। অন্যদিকগুলির সঙ্গে তার সম্বন্ধ পরোক্ষ বা অকিঞ্চিৎকর।

২. ভবানীর তাত্ত্বিক-রাজনৈতিক আদর্শ ভেঙে দিয়ে প্রফুল্ল চলে গেল। এতে কি ঐ আদর্শের বৈফল্য সূচিত? অথবা ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগ কোনো তত্ত্বাদর্শের বন্ধন মানে না–এটা দেখানোই লেখকের উদ্দেশ্য প্রফুল্লকে সিদ্ধপ্রাণ মহীয়ষীরূপে উপস্থাপিত করায় দ্বিতীয় প্রশ্নটি অস্বীকৃত হয়। আর প্রথম প্রশ্নটিকে স্বীকার করলে দুটি নতুন সমস্যা দেখা দেয়, যেমন–

ক. অনুশীলনের পাঁচ-পাঁচ দশবছরের সাধনার মোট ফল হলো মধ্যযুগীয় আদর্শে গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকায় স্থিতি। পূর্ণ নিরাসক্তির মূর্তিমতী বিগ্রহ-পরিবার জীবনের তুচ্ছ কার্যেই যার সীমা। একে নারী-জীবনের–মানবজীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মানা অসম্ভব। শিল্পী বঙ্কিমও মানতেন না। তাই গল্প থেমে যাবার পরে বিবরণ দিয়ে, কিছু স্তুতিবাদের মধ্যে তত্ত্ব-বক্তব্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা। উপন্যাস তার আগেই শেষ হয়েছে।

খ. উপন্যাসের পরিকল্পিত তত্ত্বসৌধের ভিত্তিতে ভবানী পাঠক। সেই ভিত্তিটি অস্বীকৃত হলে বাকি কোনো অংশই দাঁড়াবার সুযোগ পায় না।

এ কারণেই দেবীচৌধুরাণীর তাত্ত্বিকতা অপুষ্ট এবং ঐ বোধের ভেতরেই আছে কিছু বিভ্রান্তি। চরিত্রগুলির আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছানো যাবে।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এ বইকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলতে চাননি। তিনি গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে লিখেছিলেন, '...' দেবীচৌধুরাণী' গ্রন্থের সঙ্গে ঐতিহাসিক দেবীচৌধুরাণীর সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবীচৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুডল্যাড্ সাহেব, লেফটেন্যান্ট ব্রেনান্, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্যন্ত। পাঠকমহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবীচৌধুরাণীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।'

এখানে যে ইতিহাসের উল্লেখ আছে তা' হন্টর সংকলিত 'স্ট্যাটিসটিক্যাল অ্যাকাউন্ট'। এই তথ্যটুকু অবলম্বন করে কল্পনা ও তত্ত্বাদর্শের মিশ্রণে গল্প গড়ে উঠেছে।

---

1. 'We catch a glimpse from the Lieutenant's report of a female dacoit by name Devi Chaudhurani, also in league with Pathak. She lived in boats, had a large force of barkandazes in her pay, and commited dacoities on her own account, besides receiving a share of the booty obtained by Pathak.'

তাতে অবশ্য ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্স হয়ে উঠতে বাধা নেই। লেখক মোটামুটি সমকালের বাঙালির সমাজ-ইতিহাসের রূপটি ধরে রেখেছেন, যদুনাথ সরকারের সাক্ষ্যে সে কথা বলা যায়, '...হেস্টিংস লাট হইবার পর (১৭৭২) এ দেশের দশা যেরূপ ছিল, বঙ্কিম তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা করিয়াছেন। বঙ্কিম মহাপণ্ডিত ছিলেন, বহু বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার পড়াশুনা ছিল, এবং গভীর চিন্তার সাহায্যে পঠিত জ্ঞানকে তিনি পরিপাক করিয়াছিলেন।[২]'

সঙ্গে সঙ্গে একথাও গ্রাহ্য যে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের এই কাহিনীতে পরিবার-জীবনের এবং গ্রামসমাজের যে রূপ আছে তা বঙ্কিমের সমকালের পক্ষেও সমান সত্য। হরবল্লভের পরিবারসংস্থান, পিতার চূড়ান্ত স্বৈরাচারী ভূমিকা, কুলীন জমিদারপুত্রের বহু বিবাহ, অকারণে বা গুজবের উপরে নির্ভর করে বধূত্যাগ, প্রতিবেশীদের নিষ্ঠুরতা, অসহায় যুবতীর উপরে জমিদারের লোলুপ দৃষ্টি, প্রফুল্ল-হরণ প্রভৃতি। বিশেষ করে হরবল্লভের সংসারের ভিত্তিতে যে কাহিনী গড়ে উঠেছে–ইতিহাস-সম্পর্কিত না হলে তাকে পারিবারিক উপন্যাস আখ্যা দেওয়া যেত।

আনন্দমঠের রাজনৈতিক চেহারার পরে দেবীচৌধুরাণীকে একান্ত অপুষ্ট মনে হয়। অথচ আদর্শবাদী তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ দেশভক্ত দস্যুদল গঠনের মধ্যে এক ধরনের প্রতিশ্রুতি ছিল। ভবানী পাঠকের গোটা পরিকল্পনার ভিত্তিতে নিষ্কাম ধর্ম আর অপাতচূড়ান্ত লক্ষ্য জাতীয়তা–স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা। এর জন্য নেতা বা রাজা তৈরি-করানোর মধ্যেই যা কিছু বিশিষ্টতা। নামে রাজা বা রানী হলেও পদ বংশানুক্রমিক নয়–এই বোধ কিছু গণতান্ত্রিক। মৌল যোগ্যতা থাকলে তাকে দীর্ঘস্থায়ী অনুশীলনে নেতা করে গড়ে তুলতে হয়–এই ভাবনা আদর্শবাদী ও অভিনব। আনন্দমঠে ছিল দল-গড়ার কথা, দেবীচৌধুরাণীতে নেতা-তৈরির। এদিক দিয়ে গ্রন্থ দুটি পরিপূরক।

দেবীচৌধুরাণীতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অস্পষ্ট, কার্যধারার পরিচয় নেই। দস্যুবৃত্তির দ্বারা অর্থসঞ্চয়, দরিদ্র গ্রামবাসীদের অর্থদান করে সাহায্য পাবার সুযোগ তৈরি–এরকম দু-একটি ইঙ্গিত আছে।

কোম্পানির সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটেছিল আত্মরক্ষার তাগিদে। তবুও ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগ্রত জাতিবৈর এই দ্বন্দ্বের মধ্যে শত্রু-হননের কল্পসুখ পেয়েছে। এটুকুই এর স্বাদেশিকতা। অবশ্য ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় রাজনৈতিক শান্তি ফিরে আসার কথা গ্রন্থ-শেষে উল্লিখিত–তাতে চাকুরে বঙ্কিমের ভীতি এবং সমকালীন বুদ্ধিজীবীর দ্বিধার প্রতিফলন–যার কথা আগেও বলা হয়েছে।

২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণের ভূমিকা

তিন

দেবীচৌধুরাণী প্রফুল্লের কাহিনী। অন্য সব লোকজন তার জীবন ও চরিত্রবিকাশের সম্পর্কে এসেছে, থেকেছে, বিদায় নিয়েছে। অন্য সকলের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য যতটুকু থাক (কারুর কারুর কিছু আছে) তা একান্তভাবে নায়িকার অভিমুখী এবং সংস্পর্শেই মাত্র প্রকাশ পেয়েছে। এরা কেউ তার মা স্বামী সতীন, কেউ গুরু সহকর্মী সখী। অনেকে তাকে সাহায্য করেছে, আবার ক্ষতি করতে চেয়েছেও কেউ কেউ। নিচের চরিত্র-তালিকা সেইভাবেই তৈরি করা হলো।

ক. মায়ের বাড়িতে, নিজগ্রামে
   ১. মা ২. প্রতিবেশীরা
   ৩. ফুলমণি–দুর্লভ
খ. শ্বশুর বাড়িতে
   ১. স্বামী ব্রজেশ্বর
   ২. শ্বশুর হরবল্লভ–শাশুড়ি
   ৩. সতীন–সাগর ও নয়নতারা
   ৪. আত্মীয়া ব্রহ্মঠাকুরণ
গ. বনবাসে
   ১. কৃষ্ণগোবিন্দ
ঘ. দস্যুদল
   ১. গুরু ভবানী পাঠক
   ২. সঙ্গী রঙ্গরাজ–বরকন্দাজদল
   ৩. সঙ্গিনী নিশা ও দিবা–গোবরার মা
ঙ. ইংরেজ কোম্পানি
   ১. বেনান

ফুলমণিসূত্রে অলকমণি এবং সাগরের প্রসঙ্গে তার বাবা কাহিনীতে এসেছে। তাদের সঙ্গে প্রফুল্লে সম্বন্ধ নেই।

লেখক অন্য কোনো চরিত্রের কথা বলতে গিয়েও প্রফুল্ল থেকে চোখ ফেরাননি। প্রফুল্লের এই সর্বগ্রাসিতা অন্য কাউকেই অসামান্য হয়ে উঠতে দেয়নি।

এবারে ছোটবড় চরিত্রগুলির কথা।

প্রফুল্লের মায়ের স্বভাব অল্পের মধ্যে চোখে লাগে, তার কিঞ্চিৎ ব্যক্তিত্বের জন্য। প্রতিবেশীদের অন্যায় সমালোচনায় সে বড় জবাব দিয়ে মেয়ের জীবনে দুঃখ ডেকে এনেছিল। বেয়ানের কটুবাক্যে সমান উত্তর ফিরিয়ে দিতেও দ্বিধা করেনি। মেয়ে যদি নিজ অধিকারে শ্বশুর বাড়িতে জায়গা না পায়, দয়ার জন্য প্রার্থনা সে করবে না। ভিক্ষা করে প্রতিবেশিনীর ঘর থেকে চাল-লঙ্কা আনা যায়, স্ত্রীর দাবি নয়। এই কুটুম্বের ঘরে অন্নগ্রহণেও সে রাজি নয়। তার বাৎসল্য মর্যাদাবোধের সঙ্গে সন্ধি করেনি। কিন্তু এবারের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তার মাতৃহৃদয়ে যে চূড়ান্ত হতাশা এসেছিল তাই দ্রুত

অকাল মৃত্যু ডেকে আনল। তার মায়ের স্নেহকে অতি তরল ও সেন্টিমেন্টাল না করে তোলায় লেখকের কিছু বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে।

প্রতিবেশীরা সবাই মিলে এক যৌথ জনতা। নবকুমারের প্রতিবেশীদের মতোই দুর্জন। ঘোঁট পাকাতে এবং নির্দয়ভাবে অনাথা বিধবাকে বিপদে ফেলতে বা তার মেয়ের জীবনটা একেবারে নষ্ট করে দিতে তাদের বিবেকবুদ্ধির নিষেধ নেই। প্রফুল্লের মায়ের মৃত্যুতে এগিয়ে এসে সহায়কের সামান্য ভূমিকা নেবার মধ্যে ঐ আহত মনুষ্যত্বের অতি সামান্য প্রায়শ্চিত্ত না কি?

নষ্টস্বভাবের কুটনি ফুলমণি সম্বন্ধে বিশেষ বলার কিছু নেই। তার ভয় এবং গল্প বানিয়ে বলা কিছুটা হাস্যরসের উপাদান এনেছে চরিত্রে। দুর্লভও অতি নীচ দালাল শ্রেণীর মানুষ, অতি ভীরু, দুশ্চরিত্র-শয়তানি নিয়ে সে ব্যঙ্গহাস্যের পাত্র।

অলকমণি অল্পবুদ্ধি গ্রাম্য নারী। মোটা দাগের কিছু হাস্যরস পরিবেশ ছাড়া আর কোনো কাজ করেনি।

ব্রজেশ্বরের বাড়িতে আশ্রিতা দূরসম্পর্কের ঠানদিদি ব্রহ্মঠাকরুণ পরিচিত পারিবারিক টাইপ। বিশ্বাস্য চরিত্র হয়ে উঠেছে সে তার রসিকতায়, রন্ধন-নিপুণতায়, দস্যুভীতিতে, গল্প-কথনে, সস্নেহ মৃদুবাচনে ও আচরণে।

নয়নতারাও সাংসারিক টাইপ। কলহপরায়ণ, স্বল্পবুদ্ধি, সপত্নীর প্রতি ঈর্ষায় তপ্ত। কুরূপ বলে তাকে ব্যঙ্গের বিষয় করা হয়েছে–সেটা অবশ্য মোটা দাগের ব্যাপার, কিন্তু ও জাতীয় পরিবারসংস্থানে কিছু অসঙ্গত নয়।

ব্রজেশ্বরের মা প্রফুল্লের আগমনে প্রথমে বিরক্ত এবং কলহপ্রবণ হলেও মূলত শান্তিপ্রিয় ঢিলে স্বভাবের সহজ লোক। একেবারে ব্যক্তিহীন। স্বামীর দাপটের সামনে আত্মপ্রকাশের ক্ষমতা তার নেই। সুন্দরী প্রফুল্লকে দেখে মমতায় গলে যাবার ভাবটি নির্ভেজাল। কিন্তু ধনীর অলস সুখী গৃহিণীর স্বভাবধর্ম অনুসারে কোনো ভাবাবেগই তার চারিত্র জাড্যকে বিশেষ বিচলিত করতে পারে না।

ছোটবউ সাগর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র–যদিও জটিলতা কোথাও নেই। তাকে প্রথমে বয়ঃসন্ধির কিশোরীরূপে দেখা গেল। নয়নতারাকে বিরক্ত করে মজা পাওয়া, নবাগত প্রফুল্ল সম্বন্ধে কৌতূহল–সম্ভবত প্রফুল্ল শান্ত দরিদ্র রূপবতী বলেই সহৃদয় এবং বন্ধুত্বে উন্মুখ। এ সবই স্বভাবের কৈশোরভঙ্গি। সতীন বলে ঈর্ষা নেই–নয়নতারা সম্বন্ধেও মনোভাব ঠিক ঈর্ষার নয়। যুবতীর ঈর্ষা তার চরিত্রে এখানে দেখা দেয়নি। প্রফুল্লকে স্বামীর সঙ্গ ও শয্যা ছেড়ে দেওয়ায় তার চূড়ান্ত প্রমাণ।

তা নিয়ে ব্রহ্মঠাকরুণের কাছে কৌতুক-মন্তব্যও সে করেছে। প্রফুল্লের প্রতি সহানুভূতিতে এতটা হওয়া সম্ভব নয়। আসলে লেখক তাকে সপত্নী করে গড়লেও সখীর ভূমিকা দিয়েছেন। প্রফুল্লের কাছে সে একটি চাপা আক্ষেপের কথা বলেছিল, 'আমার অদৃষ্ট মাটির আঁবের মতো.... তাকে তোলা থাকব, দেবতার ভোগে কখন লাগিব না।'

কিন্তু মনের গভীরে এই দুঃখ তার সত্যই কি ছিল, না লেখক এটা চাপিয়ে দিলেন?

সাগরকে দশ বছর পরে দেখলাম। পূর্ণ যুবতীরূপে। ব্রজেশ্বর যখন রাগ করে চলে যাচ্ছিল সে স্বামীসহবাসের এই দুর্লভ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কাতর হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ব্রজেশ্বর তাকে পায়ে ঠেললে (ব্রজেশ্বরের সে রূপ ইচ্ছা না থাকলেও সাগরের তাই মনে হয়েছিল) তার এই নতুন রূপ দেখা গেল। 'সাগর স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া কুপিত ফণিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল। বলিল, 'কি আমায় লাথি মারিলে?'

সাগরের চরিত্রে এই ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ সমকালীন হিন্দু নারীর স্বামীভিত্তিক আদর্শ ভেদ করে প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য সাগরের দিকে পরে আর এমন ভাবে চোখ মেলার অবকাশ লেখক পাননি যাতে এই বীজটিকে পুষ্পিত করে তোলা যায়।

দেবীর বজরায় সাগরের ভূমিকা কৌতুকে লাস্যে ছলনায় প্রফুল্লের সঙ্গে মিলে কৃষ্ণলীলার এক মানভঞ্জনের পালা–তাতে বাইরে সাগর নায়িকা, ভেতরে ভেতরে সাগরই সখীর ভূমিকা নিয়েছিল।

সব মিলে সাগরে কিছু বিশিষ্টতা থাকলেও সে অস্ফুট থেকে গিয়েছে–তাকে নিয়ে কোনো মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাই লেখক অনুভব করেননি–এই কারণে সে কাব্যের উপেক্ষিতা।

সাগরের বাবা খুব অল্প সময়ের জন্য দেখা দিলেও জীবন্ত টাইপ। তাকে বাইরে থেকে সবটাই চেনা যায়। কিন্তু লেখকের বাস্তববোধের নিদর্শন, কন্যার শ্বশুরকে কারাবাস থেকে বাঁচাবার জন্য তার একটু ব্যস্ততা নেই। ঐ উদ্দেশ্যে সে টাকা দিতে রাজি নয়। মেয়ে-জামাইয়ের প্রয়োজনে সে টাকা লাগছে না, কাজেই ও রকম অপব্যয় সে করবে না। 'শ্বশুর বলিলেন, 'বাপু হে, আমার যে টাকা সে তোমারই জন্য আছে–আমার আরকে আছে বল? কিন্তু টাকাগুলি যতদিন আমার হাতে আছে, ততদিন আছে,–তোমায় দিলে কি আর থাকবে? মহাজন খাইবে। অতএব কেন আপনার ধন আপনি নষ্ট করতে চাও?'

অতি স্পষ্টবক্তা, স্বার্থপর সঙ্কীর্ণ বাস্তবুদ্ধিসম্পন্ন, কন্যার শ্বশুর সম্বন্ধে বিরক্ত। এই চরিত্রটি সুঅঙ্কিত।

গুরুত্বপূর্ণ পাত্র হরবল্লভ কিন্তু অসঙ্গতিতে ভরা। তাকে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের দোর্দণ্ডপ্রতাপ কর্তা, একগুঁয়ে ব্যক্তিত্ববান জমিদার হিসেবে প্রথম দেখানো হয়েছে। সুন্দরী পাত্রী দেখে সানন্দে পুত্রবধূ করতে সে-ই এগিয়েছিল, প্রতিবেশীদের কুৎসায় সহজে বিশ্বাস করে কঠিন সিদ্ধান্ত নেবার কারণও সহজবোধ্য। মেনে নেওয়া যায় মনে জোর আঘাত পেয়ে সে এত বিরূপ হয়েছিল। নয়নতারার মতো কুরূপাকে বধূ নির্বাচন বা ধনীর কন্যা সাগরের সঙ্গে তৃতীয় বার ছেলের বিবাহ, যেন প্রথম নির্বাচনের বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া। অথচ এই লোকটি নিজে একবারই বিয়ে করেছিল। তার সিদ্ধান্ত নিজেরই–কেউ বুঝিয়ে তার বদল ঘটাতে পারত না। গৃহিণীও তাকে নরম করতে পারেনি। এ পর্যন্ত চরিত্রটি মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। যদিও অত সহজে

প্রতিবেশীদের কথায় বিশ্বাস করায় সামান্য প্রশ্ন থাকতেও পারে। সে দৃঢ়স্বভাব, প্রফুল্লের প্রতি তার নির্মম আচরণ–এজন্য তাকে পাঠক অপছন্দ করবে; কিন্তু তার ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

এই মানুষটিকে দশ বছর পরে আবার দেখা গেল। এবার সে ভিলেন হয়ে উঠেছে। টাকার অভাবে বিপদে পড়ে পুত্রের শ্বশুরের কাছ থেকে ধারের চেষ্টায় আত্মগর্বের বিপর্যয় অবিশ্বাস্য নয়। কিন্তু উপকারী দেবীচৌধুরাণীকে ধরিয়ে দেবার চক্রান্ত, গোয়েন্দার ভূমিকায় নেমে পড়া– এসব হঠাৎই তার উপরে আরোপ করা, অন্তত হরবল্লভে এর সম্ভাবনা আগে দেখিনি। আবার দেবীর নৌকায় তাকে প্রায় ভাঁড়ের স্তরে নামিয়ে এনে ব্যঙ্গের ও মজার বিষয় করা হয়েছে।

লেখক হরবল্লভের চরিত্রের দুটি অংশের মধ্যে সঙ্গতিবিধান করতে ব্যর্থ হয়েছেন, পৃথকভাবে পূর্বার্ধের মতো উত্তরার্ধও কিন্তু অবিশ্বাস্য ছিল না।

ব্রজেশ্বর উপন্যাসের প্রদান পুরুষ চরিত্র। শুধু মনুষ্যত্বের বিচারেই নয়, শিল্পরূপেও সে পুরোই ব্যর্থ। রূঢ়স্বভাব পিতার ব্যক্তিত্বের চাপে এসে একেবারে ম্রিয়মাণ। তার হাতের পুতুলের মতো একের পর এক বিয়ে করেছে। সেকালীন সামাজিক বিধান বলে একে না হয় মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু যে প্রথমাকে পরিত্যাগ করে সে কিছুমাত্র বিবেকদংশন বোধ করেনি, যাকে বাড়ি থেকে অবিলম্বে তাড়িয়ে দিতে হবে, তাকে সুযোগ পেয়েই সে ভোগ করল, এবং পরের প্রভাতেই নিঃসম্বল অবস্থায় বিদায় দিল। গোপনেও প্রফুল্লের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করল না। এই ফাঁক ভর্তি করার জন্য লেখক ঘোড়ায় চড়ে একদিন তার আসার ঘটনার উল্লেখ করেছেন– যদিও তার আগেই প্রফুল্ল চুরি হয়ে গিয়েছিল। লেখক জানতেন এটা তিনি নায়কের সম্মান রাখার জন্য বানিয়ে বলছেন। যেমন নাকি প্রফুল্ল মরে যাওয়ার খবর পেয়ে তার কঠিন রোগের কথাও বলেছেন–ঐ একই রকম তৈরি-গল্প– বাইরের থেকে চরিত্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া।

ব্রজেশ্বরের প্রেমে জোর ছিল না, আসলে তার মনেরই কোনো পুষ্টি ঘটেনি।

তাকে মাঝে মাঝে জিতেন্দ্রিয় বলে প্রশংসা করতে চেয়েছেন বঙ্কিম। বজরায় অপরিচিতা যুবতীর পদসেবা (সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত না হলেও প্রতিরোধ দেখা যায় না), প্রফুল্ল বলে না চিনেও দেবীকে চুম্বন–প্রমাণ করে কাহিনীর নায়ক স্বভাবত ইন্দ্রিয়দুর্বল।

ব্রজেশ্বরকে লেখক পিতৃভক্ত বলে মর্যাদা আরোপ করেছেন। পিতার আচরণকে অন্যায় মনে হলেও সে বিদ্রোহ দূরে থাক, প্রশ্নও তোলেনি–মেনে নিয়েছে, সংস্কৃত ভাষায় পিতৃস্তরের ম্যাজিক তার মনকে অনায়াসে শান্ত করেছে! এমন কি পিতার যে চূড়ান্ত নীচতা কাহিনীর শেষ দিকে দেখা গিয়েছে তাতেও তার মনে সামান্য লেগেছে, তার বেশি নয়।

সেকালের জমিদারপুত্র, শরীরচর্চায় তার অভ্যাস থাকার কথা। বন্দুকে তরোয়েলে মুষ্ট্যাঘাতে সে ডাকাতদের শায়েস্তা করিতে গিয়েছিল, কিন্তু ওদের প্রথম ও অনায়াস চেষ্টায় পর্যুদস্ত হয়েছে। সব দিক থেকেই ব্রজেশ্বর অপদার্থ–মানসশক্তিহীন, গাঢ়

ভাবাবেগে উদ্বুদ্ধ নয়, বিচারবোধ বিবেক বা চিত্তপীড়নের আশ্রয় নয়। দুর্বল ইন্দ্রিয়ালু অবিকশিত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিও রচনাগুণে সার্থক চরিত্রমূর্তি পেতে পারে। তার জন্য প্রথম প্রয়োজন লেখকের জানা যে মানুষটা ঐরকমই। বঙ্কিম যে মানুষ তৈরি করে ফেলেছেন, নিজে তা বোঝেননি–তাকে পিতৃভক্তিতে মহান, স্বভাবে জিতেন্দ্রিয়, মূল্যবোধে সৎ (যেমন 'ছি প্রফুল্ল ডাকাত'–এই চিন্তা) বলে কল্পনা করেছেন। ফলে এই চরিত্ররচনা একেবারে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রধান পুরুষ একেবারে না দাঁড়ানোর গোটা উপন্যাস ভীষণ মার খেয়েছে।

দস্যুদলের মধ্যে নিশির তত্ত্বাদর্শে বোধ ছিল, রঙ্গরাজের ছিল কিনা জানা যায় না। ভবানী পাঠকের স্বদেশী ভাবনার সঙ্গে রঙ্গরাজের মোটামুটি পরিচয় ছিল। তবে সে আসলে কর্মী, ভাবুক নয়। রঙ্গরাজ কোনো জটিল সমস্যা নিয়ে কখনো ভাবতে চায়নি। কখনো প্রশ্ন করেনি। ভবানী পাঠকের এবং দেবীচৌধুরাণীর নির্দেশ পালন করেছে, তার তাৎপর্য খোঁজেনি। ব্রজেশ্বরকে ধরে আনা যে তাদের প্রথামতো ডাকাতি থেকে আলাদা, একথা তার না বোঝার কথা নয়, কিন্তু এর গূঢ়ার্থ বোঝার কোনো আগ্রহ রঙ্গরাজের হয়নি। নিশি তাকে সকৌতুকে 'দাড়িবাজী' বলে উল্লেখ করেছিল–তার মধ্যে কি ওর সূক্ষ্মবুদ্ধির অভাবের দিকে কোনো ইঙ্গিত ছিল? যখন ব্রেনানের আক্রমণের মুখে ভবানী এবং দেবী পরস্পরবিরোধী নির্দেশ দিয়েছিল তখন সে একটু বিপদে পড়ে যায়। দেবী আত্মসমর্পণ করতে চাইলে সে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। সহজবুদ্ধি বলিষ্ঠ দস্যুসর্দারের উপযুক্ত মনোভাব। রঙ্গরাজ সম্বন্ধে পাঠকের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে না, কিন্তু তার চেহারা ও মন চোখের স্পষ্ট দেখা যায়।

নিশির একটি পেছনের ইতিহাস আছে। খুবই সংক্ষেপে বলা। সংসারের স্বাভাবিক সুখদুঃখ মানবিক বন্ধনের মধ্যে সে বেড়ে ওঠেনি। ছেলেধরার হাত, রাজবাড়ির আশ্রয়ে তার চিত্তে নিরসক্তির সম্ভাবনা আগে থেকেই ছিল। রাজপুত্রের লোভের হাত সে এড়াতে পেরেছিল, বলিষ্ঠ আসক্তিহীন চরিত্রের জন্য–এরূপ অনুমান করা যেতে পারে। ভবানী পাঠক উপযুক্ত জমি পেয়েছিল, তাই নিষ্কামতত্ত্বের এবং কৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের ফল ধরাতে সমর্থ হল।

নিশিকে তত্ত্ববোধে সুনিপুণ করেছেন লেখক, কৃষ্ণভক্তি তার কাছে বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরম সত্য–এই প্রীতি তাকে ভাববিহ্বল মীরাবাঈ করেনি। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা তার স্বভাবকে উজ্জ্বল রেখেছে এবং রসিকতার বোধ তাকে তত্ত্বলোকের দূরত্ব থেকে কাছে নামিয়ে এনেছে। ব্যক্তিগত প্রণয়রহস্য তার অজ্ঞাত ছিল; কিন্তু সে কপালকুণ্ডলা নয়। দেহধর্মের কোনো প্রতিক্রিয়া তার মনের কোনো প্রান্তে ছিল না–এটা অস্বাভাবিক। সাগর-ব্রজেশ্বরের খেলা যদি ভেতর মহলে না-ও ঢোকে প্রফুল্লের ভালোবাসা যা একটা বিরাট সংগঠনকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে চলে গেল তার মনের কোথাও দাগ ফেলল না–এটা বিশ্বাস্য নয়, এ লেখকের নেহাত অবহেলা। রবীন্দ্রনাথ বাণভট্টকৃত পত্রলেখার ('কাদম্বরী') চরিত্র ব্যাখ্যানে যা বলেছিলেন এখানে তার কতক ভাবা যায় বৈকি।

ঔপন্যাসিক নারীর হৃদয়-সমুদ্রকে তীরের রেখা না ছাপিয়ে যাবার আদেশ দিয়েছেন–যা সম্পূর্ণ অনৈসর্গিক[৩]। কিন্তু মানব চিত্ত প্রসঙ্গে এতখানি অন্ধত্ব থাকা বঙ্কিমের পক্ষে কি করে সম্ভব হল? নিজের অস্বস্তি থেকেই কি হঠাৎ নিশির মুখ দিয়ে একটি অন্য রকমের কথা বলিয়েছেন। উপন্যাসের শেষ প্রান্তে দেবীগিরির শেষ দিনের কথাবার্তার একটু উদ্ধৃত হলো।

দেবী দরজার জানেলা হইতে দেখিতে পাইলেন, প্রভাত হইতেছে।

বলিলেন, 'নিশি। আজ সুপ্রভাত!'

নিশি বলিল, 'আমি আজ সুপ্রভাত।'

দিবা। তুমি অবসান, আমি সুপ্রভাত।

নিশি। যে দিন আমার অবসান হইবে, সেই দিন আমি সুপ্রভাত বলিব। এ অন্ধকারের অবসান নাই।

মনের অন্দরে লুকোনো এ গভীর আক্ষেপ কিসের? যদি নারীজনোচিত স্বাভাবিক দেহধর্ম-হৃদয়ধর্মের হয় তবে তত্ত্বভেদী সে-শক্তি এই চরিত্রচিত্রণের একটা পরম লাভ বলে বিবেচিত হতে পারত। কিন্তু নিশির সঙ্গে দীর্ঘ পরিচয়ে এর ইঙ্গিতমাত্র পাওয়া যায়নি। তাই এই অংশটুকু লেখকের আত্মসমালোচনা।

দিবাকে নিশির জুড়ি হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। তবে কিছু পার্থক্য আছে যাতে পরিকল্পনা একেবারে যান্ত্রিক বলে মনে না হয়। দিবার স্বভাবে নিশির তত্ত্ববোধ নেই, বরং কৌতুকের আধিক্য, কখনো বা ধর্মাদর্শ নিয়েও রসিকতা সে করেছে। দিবা ঘরোয়া মেয়ে, একান্ত সহজ ও স্বাভাবিক চরিত্রেরূপ গ্রাহ্য।

তত্ত্বদর্শন এবং পঞ্চবার্ষিকী অনুশীলনের শুষ্ক পরিবেশক লঘু করার উদ্দেশ্য গোবরার মার চরিত্র আমদানি করা হয়েছে। সহজে কলহপরায়ণ, কর্মভীরু গোবরার মা কানে ঠিক শুনতে পায় না। ইন্দ্রিয়ের এই বিকৃতি নিয়ে কৌতুক একেবারে বহিরঙ্গ হয়ে পড়ত, কিন্তু লেখক সেই বিপদ কতক এড়িয়েছেন। গোবরার মা অনেক কথা শুনতে পায়, আবার অনেক কিছু শুনতে পায় না। দরকারমতো সে ঠিকই শুনতে পায়, বিশেষ নিন্দার কথা কিছু থাকলে। বিশেষত তার আত্মপক্ষে বীররস এবং অন্যের বেলায় শান্তরস চরিত্রটিতে বুদ্ধিযুক্ত হাস্যের কিঞ্চিৎ সংযোগ ঘটিয়েছে।

ভবানী পাঠক দস্যুদলপতি, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত, উত্তম সংগঠক ও শিক্ষক, স্বদেশপ্রেমিক ও লোকহিতব্রতী। বঙ্কিমচন্দ্র ভবানী পাঠককে কতটা সত্যানন্দের ছায়ায় গড়ে তুলেছেন। তবে সত্যানন্দের দল গড়ার বিরাট প্রতিভার পরিচয় ভবানীতে নেই। তার কার্যাদির সীমা অনেক সংকীর্ণ। ব্যক্তিগত অনুশীলনের পরিকল্পনায় ও প্রয়োগে তার ভূমিকা সে অভাব কতকটা পূরণ করে দেয়। প্রফুল্লের পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষাক্রমের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

৩. প্রাচীন সাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ভবানী পাঠকের স্বদেশপ্রীতির–নির্যাতিত মানুষের প্রতি মমত্বের পরিচয় প্রফুল্লের সঙ্গে আলাপসূত্রে পাওয়া যাবে, 'ভবানী, ওজস্বিনী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর দুর্বিষহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন,....। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রাচীন কবির ন্যায় অত্যুন্নত শব্দচ্ছটাবিন্যাসে বিবৃত করিয়া ভবানী ঠাকুর বলিলেন, 'এই দুরাত্মাদিগের আমিই দণ্ড দিই। অনাথা দুর্বলদের রক্ষা করি।'

তার দেশোদ্ধারের পদ্ধতি বোঝাতে গিয়ে ভবানী বলেছে–

ভ। ধনে আমারও কোনো প্রয়োজন নাই। ...আমি ধনের জন্য ডাকাইতি করি না।

প্র। তবে কি?

ভ। আমি রাজত্ব করি। এ দেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে–তাহারা রাজ্য শাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।

কিন্তু এসবই তার চরিত্রবৈশিষ্ট্যের নিদর্শন হলেও–রাজনৈতিক লক্ষ্য ও কার্যপদ্ধতি যে যথেষ্ট অপুষ্ট ও প্রাথমিক স্তরের তা বোঝা যায়।

প্রফুল্ল ব্রেনান সাহেবের কাছে ধরা দিতে চাইলে ভবানী পাঠক সব শক্তি নিয়ে তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। প্রফুল্ল নিজের বুদ্ধিতে রক্ষা পেয়েছে; কিন্তু দল ভেঙে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। এ ব্যাপারে সে ভবানী ঠাকুরের সঙ্গে একমত হয়নি।

এত চেষ্টায় তৈরি রানী এবং সাধের গড়া দল ভেঙে গেল ভবানী পাঠক বেদনাহত হয়, বৈফল্যের ট্র্যাজেডি তাকে বিধ্বস্ত করেনি। সফলতা-ব্যর্থতাকে সমভাবে মেনে নেবার মতো নিষ্কাম কর্মের সিদ্ধি তার অবশ্যই ছিল। কিন্তু স্বাদেশিকতার যে মহান আদর্শে সে উদ্বুদ্ধ তার জন্য নতুন করে দ্বিতীয় চেষ্টা করল না কেন? সামর্থ্য নেই বলে? অথবা সে চেষ্টা আরও কিছুকাল সে চালিয়েছিল, প্রফুল্ল যুক্ত নয় বলে বর্তমান উপন্যাসে সে বিষয় আলোচিত হয়নি। কিন্তু ভবানী পাঠককে অজ্ঞাত পরিণতিতে নিক্ষেপ না করে লেখক শেষ দিকে বলেছেন, 'ইংরেজ রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল।'

অপ্রয়োজনীয় এই বিবরণের পেছনে লেখকের দুটি অভিপ্রায়। ১. ইংরেজ সরকারের প্রশংসা; ২. শেষ দিকের মুসলমান শাসনের তুলনায় ইংরেজ শাসনে আইনশৃঙ্খলার উন্নতিতে যথার্থ বিশ্বাস। সে যাই হোক, ভবানী আত্মসমর্পণ করল কেন? 'তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিল, 'আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন।' এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন।'

কিসের প্রায়শ্চিত্ত? তার কোনো কাজকে তো সে পাপ বলে ভাবেনি। এই পরিণতি না দেখালে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু যা দেখানো হলো তাতে গুরুতর অসঙ্গতি এসে গিয়েছে।

লেখক চন্দ্রশেখর ও আনন্দমঠে কোম্পানির কর্মচারীদের অনেক সময়েই বিদ্রূপের পাত্র করে তুলেছিলেন। ব্রেনানও তার বাইরে নয়। দেবীচৌধুরাণীকে শনাক্ত করতে গিয়ে সে যেভাবে নাজেহাল হয়েছে ও বোকা বনেছে সেখানে পরাভূত জাতির পক্ষে বঙ্কিমের প্রতিশোধগ্রহণ। না হলে ব্রেনান লরেন্স ফস্টর বা টমাসের মতো ইন্দ্রিয়দুর্বল লোক নয়। সে দুঃসাহসী, এ দেশীয় লোককে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনেও করে না। জাতীয় মর্যাদা ও ব্যক্তিগত গর্ব তাকে কিছুটা বিশিষ্টতা দিয়েছে।

কৃষ্ণগোবিন্দ দাস গৌণ কিন্তু উল্লেখযোগ্য চরিত্র। তাকে পাঠক মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে। সেখানে তার স্বভাব বুঝবার সুযোগ নেই। অনেকটা অপ্রসাঙ্গিকভাবে তার যে পূর্বকথা বিবৃত হয়েছে সেখানেই পাওয়া যাবে রূপবিহ্বল ও ধর্মচ্যুত, ছলনাময়ী নারীর দ্বারা বার বার প্রতারিত এবং সযত্নে তাকে বেঁধে রাখতে সচেষ্ট এক বয়স্ক ব্যক্তির ঘৃণা-মোহ-অবিশ্বাস-প্রেমে বিশ্রিত চরিত্রচিত্র।

চার

প্রফুল্ল মুখ্যপাত্রী। নানা কারণে পাঠককে সে মুগ্ধ করে। লেখক শেষ পর্যন্ত জোর করে কিছু তত্ত্ব আরোপ করে তাকে আহত করতে চেয়েছেন, যদিও সেই বিনষ্টির ফাঁক দিয়েও তার একটি বিশ্বাস্য মানবিক বিশিষ্ট অবয়ব চোখে পড়ে।

প্রফুল্লের মধ্যে অসাধারণ তেজ বা বীর্য কোনো কালেই ছিল না! সূর্যোপম ব্যক্তিত্বের দীপ্তিও নয়। কিছুটা সাহস ছিল–যা ভাগ্যের মারের মুখে বাধ্য হয়ে সে আয়ত্ত করেছিল। বিয়ে হলেও স্বামীসংসর্গ ঘটেনি। তার মনে কামনার কোনো জটিল বাঁক তৈরি হয়নি। স্বামীকে পাওয়াই তার একমাত্র কাম্য ও চূড়ান্ত বস্তু হয়ে রইল। এর জন্য একরাত্রি স্বামীসহবাসের অভিজ্ঞতা কিছুটা দায়ী হতে পারে, কিন্তু মূল কারণ সামাজিক-সাংসারিক সংস্কার। ব্রজেশ্বরের প্রতি প্রেম নয়, ব্রজেশ্বর স্বামী বলে তার প্রতি প্রেম। বিচ্ছিন্ন ও দুরবর্তী বলেই এতে রোমান্টিক বাসনার তির্যক রশ্মি পড়েছিল।

প্রফুল্লের মধ্যে সাধারণ বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ছিল, ছিল বিপদের ধৈর্য রাখার শক্তি। সাধারণ গৃহবধূসুলভ ভীতির বশ ছিল না সে, ছিল না রোদনপরায়ণা বালিকার মতো স্বভাবকাতর। যেভাবে সে বৃদ্ধ বৈষ্ণবের মৃতদেহ কবর দিয়েছিল, গুপ্তধন উদ্ধার করেছিল, নির্জন বনে নিঃসহায়ভাবে বাঁচবার চেষ্টা করছিল সে কাহিনী শুনে ভবানীর তাকে খাঁটি ইস্পাত মনে হওয়া কিছু বাড়তি নয়। তার উদ্দেশ্যের জন্য এই গুণগুলিকে সে পর্যাপ্ত ভেবেছিল। প্রভূত ধনের মালিক বলেও তাকে নির্বাচনযোগ্য মনে করেছিল। পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষার মধ্য দিয়ে প্রফুল্লের ভেতরের সুপ্ত শক্তি আত্মপ্রকাশ করেছিল, ভবানী পাঠক এই সম্ভাবনা হয়ত আগেই অনুধাবন করতে পেরেছিল।

শিক্ষাকালে প্রফুল্লের যে স্বাধীন ও বিদ্রোহী কার্যের উল্লেখ সাগ্রহে লক্ষ্য করেছেন লেখক ('তবে ভবানী ঠাকুরের একটা বড় ভুল হইয়াছিল–প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভালো হইত') তা আসলে তার এয়োতির সংস্কার–তা-ই প্রফুল্লের রোমান্টিক প্রেম (অপ্রাপণীয় বলে স্বামীর প্রতি

এই ভালোবাসাও হয়ে দাঁড়িয়েছিল রোমান্টিক), তাকে সযত্নে লালন করা। এর রূপটি একান্ত পারিবারিক। এখানেই বঙ্কিমের এই নারীচরিত্রের অনন্য বিশিষ্টতা।

শিক্ষান্তে যে দেবীচৌধুরাণীকে পাওয়া গেল তার স্বভাবে নিচের ধর্মগুলি মিলে গিয়েছিল–

১. শান্ত কমনীয়তা
২. গৃহস্থ (যদিও গৃহচ্যুত) নারীর নম্রতা ও কোমলতা
৩. স্বামীসংস্রবভ্রষ্ট বধূর সংযত গোপন বেদনা এবং স্বামী-অভিমুখী এক রোমান্টিক তৃষ্ণা
৪. ব্যক্তিত্বে অরূঢ় দৃঢ়তা
৫. বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য যা তীক্ষ্ণতায় বিদ্ধ করে না
৬. আত্মস্থ প্রজ্ঞা যাতে দম্ভের স্পর্শও নেই
৭. সাবলীল নেতৃত্ব–উচ্চকণ্ঠ প্রচারের গর্ব নেই
৮. নিষ্কাম কর্ম ও ধর্মের সিদ্ধি

এর সঙ্গে সুসঙ্গত তার সুস্থির লাবণ্য, অচঞ্চল প্রগাঢ় যৌবন, রাজরাজেশ্বরীর অগর্বিত মহিমা। সেকালের সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ভালোই বলেছিলেন, 'দেবীচৌধুরাণী যেন বৈষ্ণবের হাতের শক্তিমূর্তি–কমলা নহে, ভৈরবী নহে, কালীও নহে, অথচ তিনের সমন্বয়ে এক অপূর্ব বৈষ্ণব ঠাকুরাণী।[৪]'

প্রফুল্লের জীবনের প্রথম পর্যায় এবং মধ্য পর্যায়ের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক বিরোধ নেই। যে ভাবনাধারার সংযোগে-আঘাতে এই বিবর্তন তা বিশ্বাস্য। কিন্তু দেবীর পূর্বোক্ত সিদ্ধ চরিত্ররূপের সঙ্গে মানায়নি–

১. দিবার কাছে নিষ্কাম ধর্মের ব্যাখ্যান।
২. সাগরের মুখে কথা যোগানো 'আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মতো টিপিয়া দিবে।' এর মধ্যে যে কৌতুক ও লাস্য তা প্রফুল্লের স্বভাবসঙ্গত নয়।[৫]
৩. 'চুপ রহো, হারামজাদি। খাড়া রহো।' –এই ভাষা

ব্রজেশ্বরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় পরে প্রফুল্লের দেবীজীবন বিপর্যস্ত হয়ে গেল। মুহূর্তে সে মনস্থির করল। স্বামীর সঙ্গে মিলন সম্ভব না হলে আত্মবিসর্জন। কিন্তু চরিত্রের বিস্ফোরণ বাইরে দেখা গেল না। সংযমবিদ্ধ প্রফুল্ল শান্ত কমনীয়তায় সংগঠন-আদর্শ-কর্ম, ভবানীর সাধনা, রানীর মহিমা ভেঙে দিল। সুপ্ত বাসনার প্রবলতা প্রমাণিত হলো। এখানেও কোনো অসামঞ্জস্য নেই।

কিন্তু প্রফুল্লের সংসারজীবনে আদর্শ গৃহবধূরূপে প্রতিষ্ঠা, যাকে বঙ্কিম তাত্ত্বিকতামণ্ডিত করতে চেয়েছিলেন তার অসঙ্গতি পীড়াদায়ক। শান্ত নিপুণ গৃহলক্ষ্মীরূপে প্রফুল্লের আচরণ কিন্তু পঞ্চবার্ষিকী শিক্ষা ছাড়াও সম্ভব হত–প্রফুল্লকে প্রথম থেকে যতটুকু দেখেছি তাতে এর প্রমাণ আছে। তার দশ বছরের জীবন চরিত্র থেকে নিঃশেষে ঝরিয়ে দেওয়া হয়েছে, সমাপ্তির সংস্কৃত শ্লোক বৃথাই উচ্চারিত।

৪. রচনাবলী (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ) ১ম খণ্ড
৫. মনে রাখার মতো বজরায় ব্রজেশ্বরের সঙ্গে কেনা-বেচা দাসত্ব ইত্যাদি কথা সে নিজে শুরু করেও চালাতে পারেনি।

ছোট-বড় সব চরিত্রের নেওয়া হল। এই বিশ্লেষণ থেকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে ছোট চরিত্র–যারা অল্প জায়গা জুড়ে তারা সরল হলেও বিশ্বাস্য এবং কিছু বিশিষ্টতায় চিহ্নিত। একটু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি পাত্রপাত্রীদের কিন্তু বিবিধ অসঙ্গতি–পরিকল্পনার ত্রুটি কোথাও, কোথাও চরিত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব, কখনো বা লেখক তাঁর অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিশ্চিত নন। এখানে-সেখানে নৈতিক মূল্যবোধের অতি সরল আরোপও চোখে পড়ে।

বিষয়ভাবনা, তত্ত্ববোধ বা রাজনীতির প্রশ্ন এবং চরিত্রগঠন কোনো দিক থেকেই দেবীচৌধুরাণীতে উঁচুমানের কিছু পাওয়া যায় না।

১৩ সীতারাম : তত্ত্ব নয়, জীবন প্রেম মৃত্যু

এক

সীতারামের রাজনৈতিক চেহারা আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী থেকে পৃথক, এমন কি চন্দ্রশেখর থেকেও। কারণ ঐ তিনটি উপন্যাসে প্রতিপক্ষ ইংরেজ। উনিশের শতকে ইংরেজের সাম্রাজ্যিক দখলদারির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী চেতনা যখন ক্রমবিকাশমান, আন্দোলনের যখন অঙ্কুরোদগম তখন ইংরেজের সঙ্গে দেশীয় মানুষের লড়াই একটা অতি তাৎপর্যপূর্ণ প্রসঙ্গরূপে গণ্য হবার মতো। সীতারামে তা নেই।

দ্বিতীয়ত, আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণীর সংগ্রামীরা নিষ্কাম কর্মের আদর্শ নিয়ে দেশহিতব্রতে দীক্ষিত থেকে নবরাজ্য স্থাপনের কথা ভেবেছে। সীতারাম ঘটনাচক্র প্রজাবিদ্রোহের নায়ক হয়ে নিজের ক্ষমতা ও বুদ্ধিতে রাজ্য গড়ে তুলেছে, মধ্যযুগীয় রাজাদের মতো, বড় জোর প্রজাবৎসল হতে চেয়েছে।

অবশ্য মুসলমানের অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হিন্দুর স্বাধীন রাজ্যগঠনের কথা আনন্দমঠেও শোনা গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে নয়, এখানেই যথার্থ মুসলমান-শাসনের সঙ্গে সংঘাত। হিন্দুর স্বাধীন রাজ্য–এই তত্ত্বে হিন্দু রিভাইভ্যালিস্ট মনোভাবের ছাপ–যেটা বঙ্কিম-কালের দৃষ্টিভঙ্গি। তাছাড়াও অবশ্য এ ধরনের বিষয়বস্তু প্রায় রূপকের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিল–মুসলমান রাজশক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের, আর হিন্দু রাজ স্বাধীনতার, সংগ্রামী শক্তির। এর কারণ অবশ্য আমাদের নবজাগরণ এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্মকালীন বিশেষ সামাজিক চরিত্র।

সীতারাম স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেছে, সন্তানেরা প্রতিষ্ঠার বুকে বিসর্জনের আদর্শে দূরে সরে গিয়েছে, ভবানী পাঠকের স্বপ্ন অচরিতার্থে থেকেছে। কিন্তু সীতারামের রাজ্য–বঙ্কিমের কল্পনার এলেডোরাডো–কোনো বৈশিষ্ট্য পায়নি। লেখক যতটা মধ্যযুগের রাজনৈতিক বিন্যাসের প্রতি বিশ্বস্ত ততখানি সমকালীন স্বদেশী ভাবনা কিংবা নিজের বিশেষ বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটাতে চান নি। সীতারাম দিল্লীর বাদশাহী সনদ এনেছে, বারো ভুঁইয়াদের উপরে প্রভুত্বের অধিকার নিয়ে এসেছে। ফৌজদারের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটেছে। বাদশাহী অধিকারের মধ্যে এ জাতীয় কলহ মধ্যযুগে অজ্ঞাত ছিল না। নবাবী ফৌজ প্রত্যক্ষত খাজনা না দেবার দায়ে তাকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। হিন্দু মুসলমানে সমদর্শিতা ছাড়া অন্য কোনো বাড়তি গুণ তার রাজ্যে বর্তায়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র রাজনৈতিক ভাবাদর্শ নিয়ে খুব বেশি ভাবেননি এই উপন্যাসের পরিকল্পনা করতে গিয়ে, সব চিন্তা ও অনুসন্ধানকে ব্যক্তিচিত্তে নিয়োজিত রেখেছেন।

দুই

সীতারাম ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস হিসেবে গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিষয়ে লেখকের বক্তব্য–'সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিকতা নহে। যাঁহারা সীতারামের প্রকৃতি ইতিহাস জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Wesland সাহেবের কৃত যশোহরের বৃত্তান্ত, এবং Stewart সাহেবের কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠ করুন।'[১] স্টুয়ার্টের নাম ভূমিকায় উল্লেখ করলেও বঙ্কিম তাঁকে মোটেই অনুসরণ করেননি। স্টুয়ার্ট-কথিত সীতারাম জনগণের অনিষ্টকারী এক দস্যুসর্দার। নবাবের ফৌজদার তোরাবের আক্রমণে ভীত ও পলায়িত, তোরাবের মৃত্যু আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। ওয়েস্টল্যান্ড সীতারামকে বীর ও কৌশলী বারো ভুঁইয়ার দমনকারী, বাদশা-কর্তৃক স্বীকৃত রাজারূপে বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিম ওয়েস্টল্যান্ড প্রদত্ত তথ্যের উপরে নির্ভর করেছেন। কিন্তু কল্পনার ভূমিকাই মুখ্য এবং ব্যক্তিহৃদয় রহস্যই তাঁর অভিপ্রেত জিজ্ঞাসা–এ কারণে বইটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেননি।

যদুনাথ সরকার বিচার করেছেন–প্রধানত সমাজ পরিবেশের ঐতিহাসিকতা। '(বঙ্কিমচন্দ্র) সেই যুগের বাঙ্গালার অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন, তাহা অধিকাংশ একেবারে সত্য; ইতিহাসে পরিচিত কোনো সাধুকে উপন্যাসের পাতায় ঠগ বলিয়া অঙ্কিত করিলে যে দূষিত কল্পনা হইত, সীতারামে কোথাও তাহা হয় নাই। এর উপর, সেই যুগে প্রজা-শাসকের সম্বন্ধ, দেশের দশা, যুদ্ধবিগ্রহপ্রণালী বঙ্কিম অক্ষরে অক্ষরে সত্য করিয়া আঁকিয়াছেন, অর্থাৎ, এই উপন্যাসখানির দৃশ্যপট একেবারে সত্য।'[২]

ইতিহাস স্বীকৃত যুগচিত্র সীতারামে আছে। প্রজাবিপ্লবের প্রকৃতি, নতুন নগর-প্রতিষ্ঠা, দিল্লীর বাদশাহ এবং প্রাদেশিক শাসক ও ভূস্বামীদের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিশিষ্ট ধরন, সেকালীন বিচারব্যবস্থা ও দণ্ডনীতি, স্বৈরতন্ত্রী রাজার আচরণ এবং প্রজাপুঞ্জের প্রতিক্রিয়া ও সমালোচনার রীতি, সেকালের যুদ্ধবিগ্রহ নগররক্ষা-শাসনবিধি প্রভৃতি। সবচেয়ে বড় কথা হলো, রাজ্যরক্ষা বিষয়ে প্রজাদের কোনো গণতান্ত্রিক অধিকারের অভাব। দেশাত্মবোধ বা জাতীয়তার কোনোরূপ বোধ লক্ষ্য করা যায় না। 'হিন্দুরাজ্য-হিন্দুরাজ্য' এ রকম একটা সেন্টিমেন্ট মাত্র আছে। এখানে ইতিহাস চেতনার জয়। রূপকের দ্যোতনায় স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতার সুর যদি আধুনিক পাঠকের মনে বাজেও তা খুবই মৃদু। এ দিক থেকে আধুনিকতার বোধ বইয়ে সুঙ্কুচিত। চন্দ্রশেখরে প্রতাপের ভাবনায় সেকালের মধ্যে একালের যতটা ছায়া পড়েছিল এই উপন্যাসে তা মিলছে না। আবার আনন্দমঠের সন্তানসংঘে যেমন আধুনিক তরুণ বাঙালির মানস উত্তেজনা দেহধারণ করেছিল সীতারামের জনতা তা থেকে জাতে আলাদা। মধ্যযুগের চৌহাদ্দীতে তাদের হুজুগ, উত্তেজনা ও সহানুভূতি বাঁধা।

১. উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 'বঙ্কিম রচনাবলী' থেকে গৃহীত।

সীতারাম উপন্যাসে অনুশীলনতত্ত্ব মুখ্যত নিষ্কাম কর্মের আদর্শরূপে দেখা দিয়েছে, অন্য দুটি উপন্যাসের সঙ্গে এইসূত্রে সীতারামের বেশ স্পষ্ট পার্থক্য।

১. আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণীতে রাজনৈতিক ভাবনা ও স্বদেশপ্রীতির উনিশ শতকী বোধ অনুশীলনতত্ত্ব-নিষ্কাম ধর্মের বিশিষ্ট বঙ্কিমী ভাবনার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। সীতারামের রাজনীতি মধ্যযুগীয় ইতিহাসসম্মত। তার পিছনে তত্ত্বের ঠেকনা নেই।

২. আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণীতে জীবনবাসনা ও তাত্ত্বিকতায় সংঘাত ঘটেছে চরিত্রগুলির ভেতর থেকে। ভবানন্দ জীবানন্দ প্রফুল্ল তার নিদর্শন। এখানে সীতারামের সঙ্গে তত্ত্বের কোনো সম্বন্ধ নেই। তত্ত্ব জয়ন্তী-গঙ্গাধর স্বামী বাইরে থেকে সীতারামের উপর ছুঁড়ে দিয়েছে, কিন্তু যে ব্যক্তির মোড়কে সেই শ্রী সীতারামের কামনার সামগ্রী। তাই সমস্যা অন্তর্লীন হয়ে উঠতে পেরেছে।

জনৈক সমালোচক শ্রীর আচরিত ধর্মকে (স্বামীসহবাসে বিরাগ) বেদ-বিরোধী বলেছেন। অথর্ববেদোক্ত সূক্ত উদ্ধৃত্ত করে পত্নীর কর্তব্য নির্দেশ করেছেন, সেই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট বলেই এই অপঘাত[৩]। হিন্দুর ধর্মীয় আদর্শের বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্য খোঁজ কোনো সাহিত্য-সমালোচনার লক্ষ্য নয়। বিশেষত এই বইয়ে বঙ্কিম ও রকম কোনো জায়গায় আঙুল দিতে চাননি। নিষ্কাম কর্মের তাত্ত্বিক আদর্শের সঙ্গে প্রবল প্রবৃত্তির সংঘাত এই রচনায় আলোচিত। তার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিচিত্তের রহস্যে অবগাহন শিল্পীর উদ্দিষ্ট। ঔপন্যাসিক তত্ত্বের আক্রমণকে বহিরাগত শক্তি থেকে অভ্যন্তরীণ করে তুলেছেন। গঙ্গাধর স্বামী দূর থেকে এবং জয়ন্তী কাছে থেকে শ্রীকে নিষ্কাম ধর্মের মন্ত্রপূত অস্ত্রের মতো সীতারামের দিকে নিক্ষেপ করেছে। শ্রীর স্বাধীন ব্যক্তিত্ব তথা ভাগ্যের সঙ্গে ঐ মন্ত্র মিশেছে, এবং সীতারামের কাম্য জীবনের পরম বিরোধী শক্তি হয়ে উঠেছে। সীতারামের ধ্বংসে এই তত্ত্বের ভূমিকা খুব বেশি।

শ্রীর দুর্বলতা ঐ তত্ত্বাদর্শকে আয়ত্ত করতে পারেনি, তাই এ বিপর্যয়–এমন চুক্তি দেখিয়ে লাভ নেই। সে তো প্রতিক্ষণ জয়ন্তীর দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। জয়ন্তী পূর্ণসিদ্ধ নয়, একথা বলা অর্থহীন। দেখা যাচ্ছে শ্রী দ্বিধাগ্রস্ত এবং দেবোপম জয়ন্তীর সিদ্ধিতে লোকলজ্জার ফাঁক আছে। তাই যদি হয় তবে এ তত্ত্ব মানবজীবনে সত্য হতে পারে না–উপন্যাস এরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছে দেয়। এমন কি সিদ্ধ মহাপুরুষ গঙ্গাধর স্বামীও মানবজীবন সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ–শ্রীকে স্বামীর কাছে পাঠিয়ে তিনিই মূল বিপর্যয়ের হেতু হয়েছেন।

সম্ভবত সীতারাম প্রথম প্রকাশের সময়ে বঙ্কিম পূর্বোল্লিখিত সত্যটি লক্ষ্য করে (যা তাঁর শিল্পীপ্রতিভা সমকালীন তত্ত্ব বিশ্বাসকে অস্বীকার করে গড়ে তুলেছে) উপন্যাসের শেষে নিচের অংশটুকু যোগ করেছিলেন, 'এখন যাও জয়ন্তী। প্রফুল্লের পাশে গিয়া দাঁড়াও। প্রফুল্ল গৃহিণী, তুমি সন্ন্যাসিনী। দুইজনে একত্রিত হইয়া সনাতন ধর্ম সম্পূর্ণ কর।'

৩. সুধাকর চট্টোপাধ্যায় ঃ কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র।

দেবীচৌধুরাণীতে প্রফুল্লকে নিয়ে অন্যরূপ মন্তব্য আছে। প্রফুল্লের জীবন-কাহিনী শেষ করে ঐ কথা বলা হয়েছিল, তাই তাকে অপ্রাসঙ্গিক বলা যাবে না। সীতারামে বঙ্কিমচন্দ্র জয়ন্তীকে জোর করে নানারূপ গুরুত্ব দিতে চাইলেও তার প্রধান কাজ শ্রীর মনের উপর প্রভাব বিস্তারে। এ তার কাহিনী নয়–সীতারামের। শ্রীকে কেন্দ্র করে তার চিত্তের বিক্ষার ও আত্মার ধ্বংসের কাহিনী। শেষে হঠাৎ জয়ন্তীবন্দনা জোর করে যোগ করা। আর উপন্যাসমধ্যে জয়ন্তীর তাত্ত্বিক প্রভাব সামগ্রিক কল্যাণে যেমন, মানুষের সামনে আদর্শ প্রতিষ্ঠায়ও সমান ব্যর্থ।

একথা বুঝেই বঙ্কিম পরে পূর্বোক্ত অংশ যোগ করেন।

চার

চিনবার সুবিধা হবে তাই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের দুটি বর্গে এবং কয়েকটি করে উপবর্গে ভাগ করা হলো।

প্রথম বর্গ :

১. নায়ক সীতারাম।
২. নায়কের স্ত্রী–শ্রী, নন্দা, রমা।
৩. নায়কের কাম্য প্রেয়সী–শ্রী।
৪. নায়কের অমাত্য–চন্দ্র চূড়, মৃন্ময়, গঙ্গারাম।
৫. নায়কের ভৃত্য–মুরলাদাসী, পাঁড়ে দারোয়ান, চণ্ডাল, কসাই।
৬. সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী–শ্রী, জয়ন্তী, গঙ্গাধর স্বামী।
৭. ফকির–চাঁদশাহ, শাহসাহেব।
৮. নায়কের মিত্র–চন্দ্রচূড়, চাঁদশাহ, মৃন্ময়, গঙ্গারাম (প্রথমে), স্ত্রীগণ, সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী।
৯. নায়কের শত্রু–
   ক. বহিরঙ্গ–তোরব, শাহসাহেব, কাজী, গঙ্গারাম (পরে), রমা (বেশি ভয়ে সীতারামের পরাজয় কামনা করত।)
   খ. অন্তরঙ্গ–সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা, প্রধানত শ্রী।
১০. জনমণ্ডলী
   ক. ভূষণার জনতা
   খ. মহম্মদপুরের নাগরিকবৃন্দ
   গ. ওড়িয়া গ্রামবাসী
   ঘ. ভগ্নাবশিষ্ট বিশ্বাসী সেনাবৃন্দ
   ঙ. গণপ্রতিনিধি রামচাঁদ-শ্যামচাঁদ।

দ্বিতীয় বর্গ :

১. ক. ভালো মানুষ–চাঁদশাহ, নন্দা।
   খ. মন্দলোক–শাহসাহেব।
   গ. ভালো-মন্দে মেশানো এবং ভালোমন্দের বাইরে বাকি সবাই।
২. ক. একান্ত সরল-শাহসাহেব, গঙ্গাধর, কসাই প্রভৃতি।
   খ. সরল কিন্তু একটু বাঁক আছে–নন্দা, চাঁদশাহ, চন্দ্রচূড়, জয়ন্তী, মুরলা, চণ্ডাল।
   গ. যথার্থ জটিল ও অন্তর্দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ– সীতারাম, শ্রী গঙ্গারাম, রমা।
৩. ক. বিবর্তমান–সীতারাম, শ্রী, গঙ্গারাম, রমা
   খ. স্থির–অন্য পাত্রপাত্রী।

সীতারাম, তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের লোকেরা এবং রাজা সীতারাম ও তার রাজ্য, প্রজামণ্ডলী–এইসব নিয়ে উপন্যাস। বিশিষ্ট পাত্রপাত্রীর সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু রচনাকৌশলে সর্বদাই এ বইকে জনবহুল মনে হয়। বহু জনতাদৃশ্যের অবতারণা, একাধিক যুদ্ধের বর্ণনা, নগর ভাঙায় বা গড়ায় অধিবাসীদের যৌথ আচরণ ও ভাবনার প্রসঙ্গ বিশালতার সুর বাজিয়েছে।

লক্ষণীয়, চরিত্র হিসেবে যথার্থ গুরুত্ব আছে চারজনের। সীতারাম শ্রী গঙ্গারাম রমা। তাদের মধ্যে যথার্থ জটিলতা আছে, আছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাদের স্বভাবে রয়েছে ক্রমিক বিবর্তনের ছবি। তবে সীতারাম-শ্রীর তুলনায় গঙ্গারাম-রমার গুরুত্ব এবং জটিলতা অনেক কম।

এদের মধ্যে মিল আছে। তবে অমিল অনেক বেশি। যেমন, মিল–

১. সীতারাম এবং গঙ্গারাম দুজনের ধ্বংস কামনায়, নারীর প্রতি তীব্র আসক্তিতে।
২. দুজনেরই কাম্য নারী অপ্রাপণীয়া।
৩. দুজনেই কাম্য নারীর প্রেম পায়নি।

আর অমিল–

১. গঙ্গারামের ন্যায় সীতারামের কামনা অবৈধ নয়, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে অবৈধপ্রেমের ন্যায়।
২. সীতারাম গঙ্গারামের তুলনায় অনেক বড় মাপের মানুষ, অনেক জটিল, তার পতনে ট্র্যাজেডির মহিমা আছে। সীতারাম পাপে ও পতনে এ বইয়ের নায়ক, গঙ্গারামের পাপের ফলে খলের ভূমিকায় পতন।

৩. রমার কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না গঙ্গারামের প্রতি। শ্রী সীতারামের আসক্ত। প্রেম ও সন্ন্যাসধর্মের অন্তর্দ্বন্দ্ব তার মধ্যে। রমার তুলনায় শ্রীর স্বভাবে জটিলতা বেশি।

পাঁচ

মুখ্য চারজনের কথা স্থগিত রেখে বাকি লোকদের পরিচয় বেশ সংক্ষেপেই নেওয়া যায়।

শাহসাহেব। উগ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ধর্মান্ধ এই ব্যক্তি মুসলমান ফকির মাত্রের প্রতিনিধি এরূপ মনে করার কারণ নেই। লেখকের যে এ ধরনের কোনো অভিপ্রায় ছিল না তার নিদর্শন আছে পাশাপাশি চাঁদশাহ চরিত্রের পরিকল্পনায়। শাহসাহেব মধ্যযুগের এক শ্রেণীর ফকিরের প্রতিনিধিস্থানীয় এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর সম্ভাব্যতা স্বীকার্য। অতি দুষ্টবুদ্ধি হিংস্র স্বভাব তার। হিন্দু-মুসলমানে অকারণে বিভেদ সৃষ্টি করায় সেকালে ও একালে যারা দায়ী এই ব্যক্তি তাদেরই একজন।

চাঁদশাহ ফকির। শাহসাহেবের রূপ তৈরি করা হয়েছে চাঁদশাহের মধ্যে। বইয়ের প্রথম সংস্করণে তার অসাম্প্রদায়িক চরিত্র ফুটিয়া তোলার জন্য তাকে আরও কিছু আলাপ আলোচনা করতে দেখা দিয়েছিল সীতারামের সঙ্গে। পরে উপন্যাসে অপ্রয়োজনবোধে তা বর্জন করা হয়েছে, কিন্তু তাতে মানুষটির অভিপ্রেত চরিত্র কিছু বদলায়নি। বঙ্কিমের উদ্দেশ্য যে সঙ্কীর্ণ হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতা নয় তার একটা বড় প্রমাণ চাঁদশাহ। ফকির শাহসাহেব যেমন সর্বাংশে মন্দ লোক, ফকির চাঁদশাহ তেমনি সম্পূর্ণ ভালো মানুষ। সে হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী। সীতারামের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপনে তার সমর্থন ছিল। কিন্তু মুসলমান ফৌজদারের সঙ্গে বিবাদের ফলে এর উদ্ভব, –এ কারণে যাতে রাজ্যটি শুধু হিন্দুরাজ্য বলে গণ্য না হয় চাঁদশাহের পরামর্শে তাই এর নাম হলো মহম্মদপুর। বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী ফকির সীতারাম এবং তোরাব খাঁ দুয়ের সঙ্গে সদ্ভাব রেখেছে এবং নিরপেক্ষ থেকেছে। প্রয়োজনে গঙ্গারামের পাপ সে ফাঁস করেছে। সীতারামের পাপ যখন চরমে পৌঁছল সে হতাশ চিত্তে রাজ্য ছেড়ে চলে গেল। চরিত্রটি উপস্থাপনায় উদ্দেশ্যমূলক হলেও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছে।

নন্দা। সীতারামের দ্বিতীয় পত্নী, কার্যত জ্যেষ্ঠা। শান্ত সুধীর কর্তব্যনিষ্ঠ এই চরিত্রকে নানা সদ্‌গুণের আধার করে তোলা হয়েছে। সপত্নী হলেও রমার প্রতি সস্নেহ। বিপদে সে ব্যাকুল নয়, রাজ-কর্মচারীদের উপরে নির্ভরশীল। রমার সঙ্কটকালে সে তাকে সাহস যুগিয়েছে। পাতিব্রত্য এবং মর্যাদাবোধ তার স্বভাবের অঙ্গ। রমার কলঙ্কস্খালনে আমদরবার বসাতে যখন সীতারাম রাজি হয়নি, তার স্থৈর্য একবার বিচলিত হয়েছিল, 'নন্দা। মহারাজ! যখন পঞ্চাশ হাজার লোক সামনে শ্রী গাছেল ডালে চড়িয়ে নাচিয়াছিল, তখন কি তোমার বুক দশ হাত হইয়াছিল?'

যে মহিষীর মর্যাদা পেয়েও প্রেম পায়নি তার চাপা ক্ষোভের এই ক্ষণিক প্রকাশ। নন্দা একবার মাত্র কর্মতৎপর হয়ে রাজার প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ করেছে, জয়ন্তীর লাঞ্ছনার

সময়ে। নন্দা বলিলেন, 'মহারাজ! আমি পতিপুত্রবতী। আমি জীবিত থাকিতে তোমাকে কখনও এ পাপ করিতে দিব না। তাহা হইলে আমার কেহ থাকিবে না।'

শুধু পাপ থেকে স্বামীকে নিবৃত্ত করার জন্য নয়, নারীত্ব ও মনুষ্যত্বের দাবিও কিছু কম ছিল না। 'আমার কেহ থাকিবে না'–এই কেহ–মানুষ্যত্ব–নারীত্ব।

চণ্ডাল। খুব ছোট চরিত্র। এক পলকের দেখা। জয়ন্তীকে নগ্ন করে বেত্রাঘাতের দায়িত্ব তার। নির্বিবেক কঠোরচিত্ত বলেই তাকে এই ভাব দেওয়া। কিন্তু সে প্রথম দ্বিধা করেছে এবং পরে রাজদণ্ডের ভয় উপেক্ষা করেছে, 'শেষে বেত আছাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।' অতি সাধারণ একটা লোক এই বাঁকটুকুর জোরে বিশিষ্ট মানুষ হয়ে উঠল।

কসাই। পশুমাংসবিক্রেতা লোকটি সম্পূর্ণ বিবেকহীন। নগ্ন নারীদেহ এবং দোকানে বিক্রির জন্য ঝুলানো ছাগাদি পশুর শবে কোনো পার্থক্য নেই তার কাছে। তার ভাষা 'কাপড়া উতার–তেরি গোশ্‌ত টুক্‌রা টুক্‌রা করকে হাম দোকানসে বেচেঙ্গে।' এই একটি বাক্যে কসাই স্বরূপে প্রকাশ পেয়েছে।

সীতারামের একদিকে চণ্ডাল অন্যদিকে কসাইকে দাঁড় করিয়ে লেখক তিনের পারস্পরিক তুলনায় একটা বিশেষ মাত্রা আনতে চেয়েছেন।

দাসী মুরলা। রমা-গঙ্গারাম কাহিনীর সম্পর্কে আত্মপ্রকাশ করেছে। রমার আতঙ্কবিকার এবং বিচারমূঢ়তা, গঙ্গারামের মনে লালসার ক্রমিক বিস্তার সে লক্ষ্য করেছে। মনিব রমার আদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে সে সাহস করেনি। কিন্তু গঙ্গারামের মনের আগুন উসকে দিতে কিছু ভূমিকা নিয়েছে। অনুমান করা যায় চতুর ও বিবেকহীন মুরলা ভবিষ্যতের লাভের হিসেব করেছে এবং তার জন্য ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থেকেছে। কিন্তু রমার চিত্তে দৃঢ়তা ফিরে আসায় তার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। মুরলাকে প্রত্যক্ষত কুটনিবৃত্তির চেষ্টা করতে দেখি না, কিন্তু আচরণের মধ্যে চাপা দুষ্টবুদ্ধি ও একটা পাপপঙ্কিল ছলাকলার ইঙ্গিত দিয়েছেন লেখক।

পাঁড়ে দারোয়ান। মুরলাতে বা মুরলাজাতীয়া যে-কোনো নারীতে তার আসক্তি এবং তার ফলে কর্তব্যে অবহেলার পরিচয় আছে। গঙ্গারাম খোলা দরবারে বিচারার্থে নীত হলে, সে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বুদ্ধি বের করেছে। গঙ্গারামের সত্য পরিচয় তার আর অজ্ঞাত নয়। কিন্তু আগে সে নগররক্ষককে চিনত তার সামান্যতম ইঙ্গিত মেলে না।

ফৌজদার তোরাব খাঁ। রাজনৈতিক ও রণনৈতিক দিক থেকে অল্প দেখা গিয়েছে। বিপক্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টায় তার ব্যক্তিগত চবিত্রভঙ্গি কিছু প্রকাশ পায়নি। আলোর উল্টাদিকেই সে থেকেছে, তার মুখবয়ব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

কাজী। গঙ্গারামের বিচারে বা শাস্তি দেবার সময়ে, সীতারামের সঙ্গে কথায় ও আলোচনায় কাজীর ন্যায়বিচার বিমূখতা, উগ্র হিন্দু-বিরোধিতা, ফকির সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও ভীতি, সরকারী মর্যাদাবোধ প্রতিফলিত।

মৃন্ময়। বড় যোদ্ধা, বিশ্বাস সেনাপতি। প্রধানত কাহিনীর অন্তরালে থেকেছে।

চন্দ্রচূড়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। কিন্তু চতুর মন্ত্রী। সীতারাম রাজা হবার আগে তার জমিদারি রক্ষায় লাঠিবাজি পরিচালনা করেছে। নতুন রাজ্য-স্থাপনে এবং শাসনে, গুপ্তচর নিয়োগে তার দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রথম দিকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশের চকিত পরিচয় মেলে। রাজ্য-প্রতিষ্ঠার পরে অবশ্য তার আর নিদর্শন নেই। বরং চাঁদশাহ ফকিরের সঙ্গে তার সহাবস্থান তাৎপর্যপূর্ণ। রাজ্যরক্ষার চেষ্টা সে শেষ পর্যন্ত করেছে। হয়ত জয়ন্তীঘটিত অনাচার না ঘটলে রাজা ও রাজ্যের সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যেতে তার আপত্তি ঘটত না। পুঁথিপড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের তুলনায় তার চরিত্রের পার্থক্য লক্ষণীয়, তবে তা ঘটেছে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ মন্ত্রীদের আদর্শে। পরিকল্পনার ঋণ সেখানে।

গঙ্গাধর স্বামী। তাকে অল্পই দেখেছি। সংসার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ সিদ্ধপুরুষ। জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। কিন্তু মানবস্বভাব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। শ্রীকে তার স্বামী বা হিন্দুরাজ্য বা তাবৎ মানবসমাজের (কার কে জানে?) শুভের জন্য পাঠিয়েছিল সন্ন্যাসী। ফলে সীতারাম এবং হিন্দুরাজ্য ধ্বংস হয়েছে। মানবসমাজের কোনো মঙ্গল হয়েছে এমন প্রমাণ মেলে না। চূড়ান্ত তত্ত্বজ্ঞতা-সিদ্ধাই-জ্যোতিষচর্চা এবং জীবন সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী থেকেছে। গঙ্গাধর স্বামীকে সামনে রেখে মানবপ্রবৃত্তির সর্বাতিশয়ী শক্তি সম্বন্ধে একটি নিগূঢ় পরিহাস ব্যক্ত করেছেন বঙ্কিম।

জয়ন্তী। জয়ন্তীর ভূমিকার বিস্তার এবং গুরুত্ব রয়েছে এই উপন্যাসে। জয়ন্তী সিদ্ধ সন্ন্যাসিনী। মানবজীবনের মায়ামোহ সে অতিক্রম করেছে। দেহধর্মের কোনো মূল্য তার কাছে নেই। নিষ্কাম চিত্তে সে অন্যের কল্যাণে ব্রতী।

জয়ন্তী কাহিনীর মুখ্য নারীচরিত্র শ্রীকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। তারই সাহচর্য ও শিক্ষায় শ্রী নিষ্কামকর্মব্রতী সন্ন্যাসিনী হয়ে উঠেছে। গঙ্গাধর স্বামীর নির্দেশ ছিল শুধুই ইঙ্গিত। তাকে বাস্তব কার্যে অনুবাদ করে নিয়েছে স্বামীর যোগ্য শিষ্যা জয়ন্তী। তারই নির্দেশে শ্রী সীতারামের সঙ্গে দেখা করে, তারই পরামর্শে চিত্তবিশ্রাম থেকে সে পালিয়ে গেছে। সীতারামের এবং হিন্দুরাজ্যের চূড়ান্ত সর্বনামের একটা বিরাট দায়িত্ব জয়ন্তীর।

জয়ন্তী শ্রীর অনুরোধ রাজনৈতিক এবং নৈতিক বিচারে অপরাধী গঙ্গারামের প্রাণরক্ষা করেছে। শেষ যুদ্ধেও বিশ্বাসঘাতক পাপিষ্ঠ গঙ্গারামের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছে শ্রীর কথা ভেবেই। সিদ্ধ সন্ন্যাসিনীর এই আচরণ তার সখী-শিষ্যার প্রতি প্রণয় সূচিত করে, আদর্শ থেকে স্খলনেরও ইঙ্গিত দেয়।

শুধু শ্রীর মাধ্যমে নয়, জয়ন্তী সরাসরি জীবন ও কার্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। গোলাবারুদ যোগাড় করে দিয়ে সে সীতারামের রাজ্যরক্ষার ব্যবস্থা করেছে। গঙ্গারামকে দিয়ে অপরাধ স্বীকার করিয়ে রমার মর্যাদা রক্ষা করেছে। অর্থাৎ হিন্দুরাজ্য এবং সীতারামের পারিবারিক গৌরব সংরক্ষণ নিষ্কাম সাধকের দৃষ্টিতে সামাজিক শুভ অনুষ্ঠানরূপে করণীয়। এই দুই কর্মের মধ্য দিয়ে তার চরিত্রকে দেবীর মহিমা দেওয়া

হয়েছে। উচ্চনীচ-নির্বিশেষে প্রায় সর্বস্তরে এই বিশ্বাস ও ভক্তিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে হঠাৎ বইয়ের শেষে জয়ন্তীবন্দনা যুক্ত হয়েছিল, আগেই তা উদ্ধৃত। উপন্যাসের তিন খণ্ডের মধ্যে একটা পুরো খণ্ড জয়ন্তী নামে আখ্যাত। উপন্যাসকার জয়ন্তীতে অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করে ফেলেছেন।

জয়ন্তী নিষ্কামধর্মের যথার্থ প্রতিনিধি হিসেবে গ্রন্থমধ্যে উপস্থিত। গঙ্গাধর স্বামীর সঙ্গে কাহিনীর যোগ নামমাত্র। সে কারণেই কি এতটা আরোপিত মাহাত্ম্য?

অলৌকিক উপায়ে সে গঙ্গারামের পাপ, রাজ্যের বিপদ বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সাধারণভাবে জয়ন্তী বুদ্ধিমতী, কর্মতৎপর, সাহসী। যদিও মানবিক। হৃদয়বৃত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে তার ধারণা প্রাথমিক রকমের। সীতারামকে বোঝা দূরে থাক শ্রীর এত ঘনিষ্ঠ সাহচর্য সত্ত্বেও তাকে সে বাইরে থেকে দেখেছে, ভেতরের জট কত দুশ্ছেদ্য জানেনি। সব কিছু সে সোজাসুজি বোঝে। শ্রী যখন বৎসরকালের চেষ্টায় সীতারামকে ভুলে তার মন্ত্রে দীক্ষিত ও সুস্থিত তারপরেও তার চিত্তে দৌর্বল্যের বীজ আছে শুনে সে আশঙ্কা বোধ করেছে, তাকে পালাতে বুদ্ধি দিয়েছে। কিন্তু দুর্বলতার অন্য নামই যে মনুষ্যধর্ম যা কোনো অন্ধকারে লুকিয়ে তাকে আত্মপ্রকাশের সুযোগ-সন্ধানে, –এই সত্য তাকে একটু বেশি মূল্য দিয়ে জানতে হয়েছে।

জনসমক্ষে বেত্রাঘাতের আদেশ যখন সত্যই কার্যকর হতে চলল জয়ন্তী হঠাৎ জানতে পারল তার দেহ নারীর দেহ, লজ্জায় সে যে কোনো সাধারণ নারীর তুল্য। তার সন্ন্যাস-সিদ্ধির ভেতরে কোথায় ছিল এ বোধ? আত্মাকে সে নাকি জেনেছিল? সহজ নারীধর্মকে জানেনি? এই বীতরাগ-ভয়-ক্রোধ সন্ন্যাসিনীর? সেই দুর্বলতা তাকে অন্য সত্য চিনিয়ে দিল। আরও একটা পুরো জীবনের সাধনায় কি এই দেহবন্ধন থেকে মুক্তি হবে? লজ্জা তো সামাজিক চরিত্র-অভ্যাস, যে সমাজ বদলায়। আর কাম-প্রেম দেহধারী নরনারীর অস্তিত্বের ব্যাধি। সমাজ-সংস্কারের নানা বদলের মধ্যে রূপে-রূপান্তরে এই রোগ থেকেই যায়–এ সত্য কি জয়ন্তী বুঝতে পারল? শ্রীর তুলনায় তার সিদ্ধি যে বেশি অটুট নয় একথা শিখল কি?

সীতারামের জনতার যৌথরূপ নিয়ে লেখকের কিছু নির্দিষ্ট ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। তা সূত্রাকারে নির্দেশ করছি–

১. ভূষণায় গঙ্গারামের জ্যান্ত কবর দেখতে যারা এসেছিল। হুজুগপ্রিয় শৃঙ্খলাহীন সাধারণ মানুষের দল। ঐ ভীষণ দৃশ্য দেখার উত্তেজিত আনন্দ তারা পেতে চায়। আবার ঘটনাচক্রে দাঙ্গা বেঁধে গেলে সাম্প্রদায়িক মত্ততায় অংশও নিতে আপত্তি নেই। কিন্তু সশস্ত্র সৈন্যদলের সামনে পালিয়ে বাঁচাকেই কর্তব্য মনে করে। কখনো উত্তেজিত, কখনো ভয়তাড়িত, হুজুগে উদ্দেশ্যহীন। মব-সাইকোলজির সরল কিন্তু বিশ্বাস্য ছবি।

২. মহম্মদপুরের জনসাধারণ যারা গঙ্গারামের বিচার ও জয়ন্তীর দণ্ডকালে আমদরবারে হাজির হয়েছিল। এই দুটি জনসমাবেশ ছাড়াও এদের দেখা গেছে–হিন্দুর রাজ্য তৈরি হচ্ছে শুনে এসে বসতি করতে এবং রাজ্যের বিপদে দলে দলে পালিয়ে অন্যত্র আবাস তৈরির ব্যস্ততায়। 'ইভাকুয়ি' জনতার এই রূপ ইতিহাসে সুপরিচিত,

একালেও আমাদের অভিজ্ঞতার সামগ্রী। রাজ্যের প্রতি কোনো মমত্ব বা স্বাদেশিক উদ্বেলতার নিদর্শন নেই, এটা অবশ্য মধ্যযুগের বেশি উপযোগী।

আমদরবারে যারা এসেছিল তারাও 'মব'। উত্তেজনা লাভ, দর্শনীয় কিছু দেখা এটাই তাদের উদ্দেশ্য। ভূষণার জনতার সঙ্গে তাদের মূলত প্রভেদ নেই। তবে মহম্মদপুরের আমদরবারে তারা যৌথভাবে কিঞ্চিৎ বিচারবুদ্ধি ও বিবেকের পরিচয় দিয়েছে। গঙ্গারামের বিচারকালে তারা মাঝ মাঝে সংশয় প্রকাশ করেছে, জয়ন্তীর দণ্ডে তারা কতক ক্ষোভও অনুভব করেছে।

৩. সৈন্যদলের ভগ্নাবশেষ, যারা শেষ লড়াই করল। লক্ষ্য করার, জনতার রাজ্যবিষয়ে দায় বা দায়িত্বের চিহ্নমাত্র নেই, এই পেশাদারী সৈন্যের দল কিন্তু মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও অপেক্ষা করেছে। কোনো আদর্শবাদের প্রেরণা এদের মধ্যে নেই, পেশাই এদের কাছে আদর্শ।

৪. রামচাঁদ ও শ্যামচাঁদ। এই দুই নিরীহ গৃহস্থ আসলে দুজন গৃহস্থমাত্র নয়, মহম্মদপুরের যাবতীয় গৃহস্থের প্রতিনিধি। জনতার যে রূপ (২নং সূত্র দ্রষ্টব্য) আগে দেখেছি, তাদেরই ভীড় থেকে এদের দুজনের উপরে লেখকের চোখ পড়েছে। যে স্বভাব 'মব'-এ, তারই ব্যক্তিরূপ এই দুজনে। এরা বিচারে ও বুদ্ধিতে নেহাৎ সমতলের, বিশ্বাসে ও সংস্কারে যুগসুলভ অশিক্ষাগ্রস্ত মূঢ়তার, এবং রাজ্যরাজনীতি প্রসঙ্গে প্রায় নিস্পৃহ–শুধু আত্মরক্ষায় সতর্ক।

রমা এবং গঙ্গারাম আগে ব্যাখ্যাত লোকজনদের তুলনায় বিস্তৃত ভূমিকা নিয়ে রয়েছে, কিছু জটিলও বটে এবং তাদের স্বভাবধর্মের কিছু বিবর্তনও লক্ষণীয়। কিন্তু ঐ জটিলতার মাত্রা অল্পই।

রমাকে আতঙ্কবিকারগ্রস্ত নারীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। যথার্থ ভয়ের কারণ ছিল না এমন নয়, সাধারণ মানুষের স্তরে সহজেই তা ব্যাপক আকার নিয়েছিল। কিন্তু রমার ক্ষেত্রে এটা বাতিকে পরিণত হয়েছিল, আধুনিক কালের ভাষায় যাকে বলা উচিত হিস্টেরিয়া। এর ফলে সে ক্রমে স্বামীর বিরাগের পাত্রী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নিজেকে সংশোধনের কথা ভাবেওনি। ব্যাধিগ্রস্ত লোকের মতোই সে একান্ত আত্মকেন্দ্রিক।

গঙ্গারাম সম্বন্ধে রমার অন্য কোনো মনোভাবই ছিল না। সে তাকে সন্তানের ত্রাণকর্তারূপে ভেবেছে। নিজের মনের দেখায়ই সে অন্ধ ছিল। গঙ্গারামের চিত্ত-বদলের খোঁজ রাখেনি। কিন্তু হঠাৎ মুরলার একটি কথায় সতীত্বের গভীর সংস্কার তাকে জাগিয়ে তুলল ভীতিবিকারের আচ্ছন্নতা থেকে। মুরলার কথা রমার মানসিক ব্যাধিতে শক্‌থেরাপির কাজ করল।

রমার মতো মেয়েকে বিরাট জনতার সামনে নিজের সতীত্বের প্রমাণ দিতে দাঁড়তে হলো। এই চূড়ান্ত পরীক্ষায় বঙ্কিম তাঁর স্বভাবসুলভ নম্র ভীরুতা বজায় রেখেও এক ধরনের মানসিক দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। রমার চরিত্র একটা ভারসাম্যের স্তরে এসে পৌঁছেছে। স্বামীর বিরূপতাকে আগে সে লক্ষ্যও করেনি, আপন চিত্তের বিকারে ডুবে

ছিল। এখন কঠিন আঘাতে সে মনের বন্দীত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে, এখন স্বামীর মমতা তার প্রয়োজন–বিশেষত, তার চারিত্রিক শুদ্ধিতে স্বামীর বিশ্বাসের প্রমাণ চাই তার।

রমার চরিত্রের এই বিকাশধারা মনস্তাত্ত্বিক ও বিশ্বাস্য, এর মূলে কিছু জটিলতাও আছে, যদিও তা প্রাথমিক ধরনের।

গঙ্গারাম সহজ সাধারণ মানুষ, প্রয়োজনে রেগে উঠতে জানে। জীবন্ত কবর নিশ্চিত জেনে সে শাহসাহেব ফকিরকে সব জ্বালা ক্রোধ নিয়ে পদাঘাত করেছে।

কোনো নীতির বা বিবেকের বালাই তার ছিল না। প্রমাণ হাতকড়ি খোলা পেয়েই তার ঘোড়া নিয়ে পালানো। নিজে বাঁচার সময়ে পরম উপকারী সীতারামের কি দশা হবে একবারও ভাবেনি। বঙ্কিম এখানে তার ভবিষ্যৎ পতনের বীজ রেখেছিলেন।

গঙ্গারাম নগররক্ষক হিসেবে যোগ্যতা দেখিয়েছিল। যাদের কর্মক্ষমতার নতুন রাজ্যের পত্তন সে তাদের একজন। শ্রীর ভাই বলে সীতারাম তাকে বিশেষ সময় দৃষ্টিতে দেখত এমন মনে করার কারণ আছে–শ্রীকে খুঁজে পাবার ব্যাপারে তাকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

রমার রূপ দেখে গঙ্গারাম মুগ্ধ হলো। ক্রমে মত্ত হয়ে উঠল। নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করল। এবং হেরে গেল। তার কৃতজ্ঞতাবোধ দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ বিনষ্ট হলো। পতন অতি দ্রুত ঘনিয়ে এল। সে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হলো।

কিন্তু তার নৈতিক চূড়ান্ত স্খলনের মধ্যেও প্রথমে একটুকু গৌরব ছিল। এক নারীর প্রতি আসক্তির তীব্রতায় সে ধর্ম কর্ম সব স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিতে বসেছিল–যা ঐ তীব্রতার মাত্রাই সূচিত করে। কিন্তু গঙ্গারাম যখন ধরা পড়ল, তার চরিত্রের নীচতা প্রকট হয়ে উঠল। রমার উপরে কলঙ্ক চাপিয়ে সে বাঁচতে চাইল।

গঙ্গারাম ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেল। সীতারামের প্রতি জাতক্রোধে সে শত্রু দলে যোগ দিয়ে তার উচ্ছেদের চেষ্টা করেনি। রমার মৃত্যুসংবাদ জানত না বলে এই সুযোগে ছদ্মবেশে তাকে হরণ করতে এসেছিল। গঙ্গারাম নিবীর্য তামসিকতায় অবনমিত হলেও তার চরিত্রে কাম-প্রেমের একটা ব্যক্তিগত বিশেষ রহস্য প্রকাশ পেয়েছে। তাতে অতল গভীরতা বা অনন্ত বিস্ময় নেই। কিন্তু নীচতা, কৃতঘ্নতা, যে কোনো মূল্যে যে কোনোভাবে রমাকে অধিকারের চেষ্টা, তার মনের উপরে কোনো জোর নেই জেনেও তাকে পাবার ইচ্ছা এবং সেজন্য মৃত্যুবরণ–সব মিলে তার স্বভাব মানবপ্রেমের বৈচিত্র্য নিয়ে একটা প্রশ্ন তুলে ধরে।

পাঁচ

উপন্যাসের মুখ্য নারী চরিত্র শ্রী। তার স্বভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং ক্রমিক পর্যায়গুলি নিচে সূত্রাকারে লেখা হচ্ছে–

১. রোমান্টিক প্রণয়তৃষ্ণা–লক্ষ্য স্বামী, কারণ সে অপ্রপণীয়।
২. আত্মমর্যাদাবোধ–নিগূঢ় অভিমানজাত।

৩. গাছের ডালে দাঁড়িয়ে তার আত্মহারা উল্লাস-গোপন কারণ, তারই জন্য স্বামীর প্রচণ্ড কর্মতৎপর নেতৃত্ব, মনের গভীরে এই প্রত্যয়।

৪. জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী শুনে পলায়ন-যে নিজের কাছে থেকে।

৫. জয়ন্তীর সংস্পর্শ এবং তার প্রভাবে ক্রমিক পরিবর্তন-
ক. প্রথমে প্রণয়বিহ্বলা কাতরা নারী
খ. এক বৎসর পরে প্রবৃত্তি-উৎসাদিতা সন্ন্যাসিনী।

৬. সীতারাম সংসর্গে সন্ন্যাসিনী শ্রীর আচরণ, তার ফল- চিত্তাভ্যন্তরে নারীপ্রবৃত্তির পুনর্জাগরণ। তাই পলায়ন।

৭. সীতারামে শ্রীর শেষ আত্মসমর্পণ যেন মুমূর্ষু রাজার মরীচিকাদর্শন-আসলে শ্রী তখন শুধুই এক ভৈরবী।

এই সূত্রগুলি কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

১. শ্রী জানত না যে সে স্বামীপরিত্যক্তা। সেকালের সামাজিক বিধিতে বাঙালি নারীর এ দুর্ভাগ্য অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু এই ঘটনাই শ্রীকে স্বামীর প্রতি রোমান্টিক প্রণয়ে তৃষিত করে তোলে, অন্যথায় সেও হয়ত গৃহধর্মে সুস্থিত এক গৃহিণীতে মাত্র পরিণত হতো, শ্রীর ক্ষেত্রে বঙ্কিম কালোচিত বাস্তবতা বজায় রেখে তাঁর নায়িকাকে আধুনিক রোমান্টিক মনোভাবের অধিকারী করে তুলেছিলেন।

২. শ্রী সীতারামের কাছে খুব বড় ধরনের বিপদে পড়েই গিয়েছিল-তার আত্মমর্যাদাবোধ কিন্তু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যদিও দম্ভের স্পর্শ ছিল না। পরিত্যক্তা বলে কোথাও কাতরতা ছিল না, কিন্তু একটা গূঢ় অভিমানবোধ প্রকাশ পেয়েছে। 'তখন শ্রী মুখের ঘোমটা তুলিল। সীতারাম দেখিলেন, অশ্রুপূর্ণ, বর্ষা-বারিনিষিক্ত পদ্মের ন্যায়, অনিন্দ্য-সুন্দর মুখ। বলিলেন, 'তুমি শ্রী। এত সুন্দরী!' শ্রী বলিল, 'আমি বড় দুঃখী। তোমার ব্যঙ্গের যোগ্য নহি।' শ্রী কাঁদিতে লাগিল।.... গদ্‌গদস্বরে অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্রী বলিতে লাগিল, 'আজ আমার মা মরিয়াছেন।' সীতারাম। সেই বিপদে পড়িয়া কি তুমি আজ আমার কাছে আসিয়াছ? শ্রী। না-আমার মার কাজ আমিই যথাসাধ্য করিব। সেজন্য তোমায় দুঃখ দিব না।'

গঙ্গারামের প্রাণের আশঙ্কা না থাকলে শ্রী সীতারামের সামনে আসত না।

৩. শ্রীর যে মূর্তি, যে উত্তেজনা জনতার দাঙ্গার সময়ে প্রকাশ পেয়েছে তা স্বাভাবিক নয়। শ্রী তখন আত্মবিস্মৃত। তাই গঙ্গারামের প্রাণরক্ষায় উল্লাস তো ছিলই, তার সঙ্গে মনের গূঢ় কিছু ভাবেরও অভিব্যক্তি ঘটেছিল। শ্রী অবশ্য ভুলতে পারেনি সীতারামের উক্তি-'তুমি শ্রী! এত সুন্দরী!' সীতারাম কেন বলিষ্ঠতা ও দৃঢ়চিত্ততা নিয়ে গঙ্গারামের উদ্ধারে ব্রতী সে কথা শ্রী অনুভবে বুঝেছিল। এটা তার পরম প্রাপ্তি। এ কথা স্পষ্ট সে জানেনি, কিন্তু আত্মহারা মত্ততা প্রকাশ করেছে।

৪. শ্রী সীতারামের কাছে শুনল কেন তাকে ত্যাগ করা হয়েছিল। কিন্তু স্বামী থেকে তাকে দূরে রাখার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। শ্রী আতঙ্কের সঙ্গে অনুভব করেছে তার প্রেম দূরে থাকায় তীব্রতর হয়েছে। বিশেষ করে এই মুহূর্তে তা তীব্রতম। সে নীরবে পালিয়ে

গিয়েছে। আগের অভিজ্ঞতায় সে জেনেছিল দূরে গেলেই অপ্রেম বাড়ে না, তার দুর্ভাগ্য-প্রেমই বেড়েছে। আসলে তার পালাবার চেষ্টা নিজের কাছ থেকে।

৫. কিন্তু মানুষ নিজের থেকে দূরে যেতে পারে না। এ ব্যাধির চিকিৎসা নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য নারীপুরুষ সবাই এই রোগের শিকার। এমন সময়ে জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা। জয়ন্তীর সাহচর্যে সে যুগপৎ ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় নিষ্কাম ধর্মের পথে চিত্তকে শাসিত করতে চাইল। এভাবে সন্ন্যাসিনী হয়ে ওঠার মধ্য দিয়েই, স্বামীপ্রেমকে অকর্তব্য বিধায় ভুলে সে সীতারামকে বাঁচাতে পারে। ভালোবাসে বলেই ভালোবাসা-ভোলা। এক বৎসরের সাধনায় শ্রী নিবৃত্তিমার্গে স্থিত সন্ন্যাসিনীতে রূপান্তরিত হলো। অন্তরের দিক থেকে বাধা সে দূর করেছে, বাইরে কোনো বিরোধী শক্তি দেখা যায় না- তার সাধনা সহজ ও নিরুদ্বিগ্ন হয়েছে। এক বছরেই সে ভৈরবীবেশে ত্রিশুল হাতে 'পথপার্শ্ববর্তী বন হইতে বন্য পুষ্প চয়ন করিয়া... তাহার দল কেশর রেণু তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে করিতে এবং পুষ্পনির্মাতার অনন্ত কৌশলের অনন্ত মহিমা কীর্তন' করতে শিখে গেল, সীতারামের কথা আর মনে বা মুখে রইল না।

৬. কিন্তু শ্রীর সিদ্ধি এত সহজে হলো না। চিত্ত-বিশ্রামে তার বাস অন্তর্দ্বন্দ্বর তীব্রতায়। মুখে স্বামীকে যে যত তত্ত্বকথাই শোনাক তার অন্তরের প্রতিরোধ ভেঙে পড়তে লাগল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বভাবসুলভ রীতিতে এই চিত্ত-সংঘাতের ছবি এঁকেছেন-তার চূড়ান্ত অবস্থা ধরে রেখেছেন শ্রীর সংলাপে।

'শ্রী। পলায়ন ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না। কেবল রাজার জন্য বা রাজ্যের জন্য বলি না। আমার আপনার জন্যও বলিতেছি। রাজ্যকে রাত্রিদিন দেখিতে দেখিতে অনেক সময় মনে হয় আমি গৃহিণী, উহার ধর্মপত্নী।

জা। তা ত বটেই।

শ্রী। তাতে পুরান কথা মনে আসে; আবার কি ভালোবাসার ফাঁদে পড়িব? তাই, আগেই বলিয়াছিলাম, রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করাই ভালো। শত্রু রাজা লইয়া বার জন।

জা। আর এগার জন আপনার শরীরে? ভারি ত সন্ন্যাস সাধিয়াছ, দেখিতেছি।...

শ্রী। রাজা বলেন, আমি পলাইলে তিনি আত্মঘাতী হইবেন।

জা। রাজা বাঁচিল মরিল, তাতে তোমার কি? তোমার স্বামী বলিয়া কি তোমার এত ব্যথা? এই কি সন্ন্যাস?

শ্রী। তা হোক না হোক-রাজা মরিলেই কোন্ সর্বভূতের হিতসাধন হইল?'

শ্রী আবার পালিয়ে গেল। তার সন্ন্যাসসাধনাও ব্যর্থ হয়েছে আবার গার্হস্থ্য-জীবনে ফিরবার পথ নেই, যদি বাসনাও থাকে স্বভাব বদলেছে, আর গাঢ় বাসনার শক্তিও আছে কি? এখানেই শ্রীর ট্র্যাজেডি। নিজের থেকে পালিয়ে বেড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা।

৭. মাত্র কয়েকদিন পরে আবার তাকে দেখা গেল জয়ন্তীর সাহচর্যে সীতারামের কাছে এসেছে। কোন্ যাদুতে এর মধ্যে তার অপরিবর্তনীয় স্বভাবমূল এতদূর বদলেছে যাতে সীতারামের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেছে এবং ভৈরবীত্বে অটলও থেকেছে? শেষ খণ্ডের একবিংশতিতম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। মনের দিক থেকে শ্রীর এই পরিবর্তন

আরোপিত। অথবা সীতারাম মৃত্যুকালে এই জাগ্রত স্বপ্ন দেখেছে–এ দৃশ্য তার মনোবিকারের প্রতিচ্ছায়া।

এই উপন্যাসের মতো বঙ্কিমের আর কোনো লেখা এতটা নায়ক-অভিমুখী নয়। রাজসিংহে বিশালতা আছে, চারিত্রিক গভীরতা নেই। সীতারামে এই দুই প্রান্ত মিলেছে। মূলত একেই আশ্রয় করে বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পগুণে এত উঁচুতে উঠেছেন–অন্যান্য উপাদান বেশির ভাগ মধ্য স্তরের হলেও।

সীতারাম চরিত্রের আলোচনা উপন্যাসকারের রচনার অনুসরণেই করা সম্ভব। কারণ নায়কের মনের প্রতিটি স্তর খুঁটিয়ে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, গোপন অংশগুলো সামনে ধরে দিয়েছেন, আভ্যন্তর দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন, পরিবর্তনের সূত্রগুলির জট খুলে দেখিয়েছেন। তার মধ্যে কতগুলি উত্তেজিত স্তরকে আবার নাটকীয় ঢঙে বিস্ফোরিতও করেছেন। লেখকের নিজস্ব প্রতিবেদন প্রায় নিটোল ও ছেদহীন বলে সমালোচকের দায়িত্ব সংক্ষিপ্ত ও সরল হয়ে পড়ে।

উপন্যাসের স্পষ্ট নির্দেশ মেনে নিয়ে পাঁচটি প্রসঙ্গে ভাগ করে সীতারামের চরিত্রের ভেতরের তাৎপর্য খোঁজ করা যাক। ক।। সীতারামে-চরিত্রের বহিরঙ্গ গুণাবলী, খ।। শ্রীর প্রতি প্রেমের স্বরূপ, গ।। সীতারামের চিত্ত ও কার্যের বিকাশধারা ও পরিণতি, ঘ।। রমা-প্রসঙ্গ, ঙ।। সীতারামের পরিণতি।

ক।। বহিরঙ্গ গুণাবলী

সীতারাম সুচতুর নেতা, কুশলী রাজনীতিজ্ঞ এবং দুঃসাহসী যোদ্ধা। গঙ্গারামকে উদ্ধার করার চেষ্টা থেকে প্রজাবিদ্রোহের সূচনা। এ তার ধারণার বাইরে ছিল। কিন্তু যখন ঘটলই, সীতারাম সে সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল, যোগ্য নেতৃত্বে নতুন রাজ্য গড়ে তুলল। দিল্লীতে বাদশাহের সনদ সংগ্রহ, একক বীরত্বে রাজ্যরক্ষা, ভূষণা-অধিকার, রাজ্যমধ্যে হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শিতা, ন্যায়সঙ্গত বিচার, যেমন গঙ্গারামকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া–এই সব ঘটনায় তার ব্যক্তিমহিমা একটা বিরাট আকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চারধারে জনতার ভীড়, সেনাবাহিনীর কোলাহল, নানা মাপের অনেক পাত্রপাত্রীর মাঝখানে সবাইকে অনেকটা ছাপিয়ে সীতারামের মাথা পাহাড়ের চূড়ার মতো উঁচু হয়ে আছে।

খ।। শ্রীর প্রতি প্রেমের স্বরূপ

চারটি পর্যায়ে এই প্রেমের মূল বিশিষ্টতা ধরা পড়েছে–

১. প্রথম দেখা শ্রী
২. প্রজাবিদ্রোহে শ্রী
৩. রমা-নন্দার তুলনায় শ্রী
৪. চিত্তবিশ্রামে শ্রী

অনেক দিন পরিত্যক্তা শ্রীকে সীতারাম ভুলে গিয়েছিল। তারপরে যখন দেখল সে মুহূর্তে রূপে বিহ্বল হলো। 'তুমি শ্রী! তুমি এত সুন্দরী!' অথচ এই নারী তার ধর্মসঙ্গত পত্নী।

শ্রীকে সীতারাম প্রজাবিদ্রোহের সময়ে উত্তেজিত অবস্থায় দেখেছে। শ্রীর সেই উল্লাসে নায়ক আপন হৃদয়ের মত্ততার প্রতিবিম্বন দেখেছে। তার নিজের স্ত্রী, এত সুন্দরী, গার্হস্থ্য বন্ধনের সব সঙ্কীর্ণতা ডিঙিয়ে এক স্বপ্নপ্রাপ্ত উজ্জ্বল বহ্নি।

ধর্মের বাধা নেই, কিন্তু আরও অনেক বড় বাধা আছে। এই পরম কাম্য রমণী তার ধর্মপত্নী প্রিয়প্রাণঘাতিনী–ভাগ্যের এই লিখন। কিন্তু প্রবল কামনা অনায়াসে মৃত্যুভীতিকে অস্বীকার করল। এই নারীকেই তার চাই।

কিন্তু কোথায় শ্রী? অপ্রাপনীয়া বলেই সে আরও লোভনীয়, চিত্ত আরও অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল।

নন্দা-রমা ভিন্ন চরিত্রের নারী। গৃহে স্থিত হলে শ্রী এদেরই আর-একজন হয়ে উঠত, রমা না হলেও নন্দারই কোনো উন্নত সংস্করণ। কিন্তু সে ঘরে এল না। তাই কল্পনার সব রঙ ঐ পলায়িতার চারধারে বিকীর্ণ হতে লাগল।

চিত্তবিশ্রামে বাসকালে শ্রী যখন কাছের, তখন সে আসলে আরও দূরের। কাছে থেকেও দূরে বলেই নায়কের অধীরতা আরও বেশি, রোমান্টিক ব্যাকুলতা অনেক যন্ত্রণা-মিশ্র।

গ।। সীতারামের চিত্ত ও কার্যের বিকাশধারা–

চিত্ত	কার্য
১. শ্রীর প্রতি মোহের সঞ্চার	রাজ্যস্থাপনের সূচনা
১-২. পলায়িতা শ্রীর সন্ধান–রোমান্টিক অচরিতার্থ রাজ্যগঠন প্রেম হৃদয়ে লালন	
২. শ্রী-প্রাপ্তি	একক বীরত্বে শত্রুদলন ও রাজ্যরক্ষা
২-৩. চিত্তবিশ্রাম অধ্যায় –কামনায় ও অপ্রাপ্তিতে ও মানস-অবক্ষয়ে	রাজ্যের ক্রমিক অবনতি, ধ্বংসমুখিতা
৩. শ্রীকে হারানো	জয়ন্তীর দণ্ড
৩- শেষ আত্মধ্বংসের ব্রত	রাজ্যনাশ

চিত্তভাব অনেক সময়ে কার্যের উৎস, অনেক সময়ে ফল, কখনও বা দুই-ই। উপরের ছক থেকে একটি বিশেষ অংশের তাৎপর্য খোঁজা যাক।

জয়ন্তীর দণ্ডবিষয়টি শুধু সীতারামের প্রচণ্ড ক্রোধ, বিবেকহীন দানবোচিত নীচাশয়তা তো সহজেই প্রমাণ করে। কিন্তু ব্যাপারটা প্রায় প্রতীকের দ্যোতনা এনেছে। সন্ন্যাসিনীকে নগ্ন করা–নিবৃত্তিমার্গকে, সন্ন্যাস-ধর্মকে ভেঙে নিরাবরণ করে কোনো খাঁটি সত্য লুকিয়ে আছে কিনা খুঁজে দেখা। সঙ্গে সঙ্গে, জয়ন্তীকে দণ্ড দেবার মধ্যে নায়কের আত্মধ্বংসের উদ্বোধন–পরবর্তী পর্যায়ে নিচুস্তরের লাম্পট্যে যার গ্লানিকর অভিব্যক্তি।

ঘ।। রমাপ্রসঙ্গ

সীতারামের মনের উপরে রমাসংক্রান্ত দুটি বিষয় প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছে। আতঙ্কবিকারগ্রস্ত রমা রাজ্যস্থাপনের প্রথম পর্যায় থেকেই সীতারামকে বিরূপ করে তুলেছিল। কিন্তু তার জীবনের দুই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিস্থলে রমা গভীরতর প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে–

১. গঙ্গারামের বিচার
২. রমার মৃত্যু

গঙ্গারামের বিচার প্রসঙ্গে রমার সতীত্বেরও বিচার জনসমক্ষে হয়ে গেল। রমা নিষ্কলঙ্ক বলে মর্যাদা পেল, কিন্তু পুরো ঘটনাটার মধ্যে একটা ক্লেদাক্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সীতারাম তখন সদ্য একটা বিরাট যুদ্ধজয় করেছে একেবারে একক চেষ্টায়। জয়ন্তীর প্রতিশ্রুত পুরস্কার শ্রী-প্রাপ্তির আশায় উদ্গ্রীব। এই সময়ে রমাঘটিত এই মানসিক চাপ তাকে রমা সম্বন্ধে আরও বিরূপ করে তুলল; পরিবারজীবনে শান্তি-তৃপ্তি-চিত্তের আশ্রয় বিষয়ে সংশয়ী করে তুলল। 'চিত্তবিশ্রাম' একরূপ অপরিহার্য হয়ে উঠল।

রমার মৃত্যুর একটি বড় কারণ সীতারামের অবহেলা। সীতারাম চিত্তবিশ্রামে শ্রীর সংসর্গে তখন স্বপ্নমোহগ্রস্তবেদনাবিদ্ধ কামনাতুর ও ভীষণ অতৃপ্ত। এ অবস্থায় রাজ্যপাট যখন ভাঙছে রমার মৃত্যু তার কাছে বিবেকের চাবুক হয়ে উঠল। এরই প্রতিক্রিয়ায় সে শ্রীর শর্ত ভেঙে তাকে দেহেমনে পুরো অধিকারের প্রতিজ্ঞায় মত্ত হয়ে উঠল।

ঙ।। সীতারামের পরিণতি

শত্রুসৈন্যের আক্রমণ এবং মৃন্ময়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে সীতারাম আত্মবিস্মরণের বিলাস-কলুষতা থেকে জেগে উঠল। তার উক্তি, 'তবে আজ শেষ। ভোগবিলাসের শেষ; রাজ্যের শেষ; জীবনের শেষ।'

এরই জন্য যেন সে অপেক্ষা করে ছিল। মৃত্যুর আহ্বানে শেষ জাগরণ। বীর্যে সাহসে সীতারামের এই ক্ষণকালের সুপ্তিভঙ্গ তার পতনের গভীরতা মেপে দেখায়। প্রবৃত্তি-শৃঙ্খলিত মানুষের দুর্ভাগ্যে এক বিমূঢ় শঙ্ক অসহায়তা, বিপন্ন বিস্ময় পাঠককে ভীত করে।

শেষ সময়ে শ্রী-জয়ন্তীর সঙ্গে সীতারামের সাক্ষাৎ বিশেষ অর্থবহ। শ্রী যেন তার নিয়তি, হাত ধরে পথ দেখিয়ে চরম বিনষ্টিতে সমাপ্তি ঘটাতে এসেছে। শ্রীর (এবং জয়ন্তীরও) 'তমাদিদেবঃ' গানে সীতারাম আপনার শ্মশান-সঙ্গীত শুনেছে।

১৪ ইন্দিরা : ছুটি-লঘু হাস্যে

এক

ইন্দিরা শেষ সংস্করণে অনেক বড় হয়ে উপন্যাসোপম হয়েছে। সে কারণে সীতারামের পর এর আলোচনা করা হচ্ছে। আসলে ছোট কাহিনী হিসেবে এটি অনেক আগে লেখা হয়েছিল–বিষবৃক্ষ-চন্দ্রশেখরের মতো ভারী উপন্যাসের সমকালে। ঔপন্যাসিকের মন যখন ভাবগভীরতায় তলিয়ে, ব্যক্তি-রহস্যের জটিলতায় বিমূঢ়, সৃষ্টির সব তারগুলো যখন টান করে বাঁধা ঠিক সে-সময়ে ইন্দিরায় ছুটি করে নেওয়া। অনেককাল পরে মৃত্যুর অল্প আগে, উপন্যাস থেকে যখন বিদায় নিয়েছেন সীতারাম লিখে–হঠাৎ রাজসিংহকে এক বিশাল মহৎ রূপ দেবার দায়িত্ব নিচ্ছেন স্বেচ্ছায়, পুরোনো ইন্দিরাকে বাড়িয়ে লঘুহাস্যের বিস্তারে সরল তরল দায়িত্বহীন জীবনভোগ–শেষবারে মতো।

রাধারাণী-যুগলাঙ্গুরীয়-সুবর্ণগোলকের মতো ছোটগল্প-কাহিনীর দলে না ফেলে ইন্দিরাকে–বড় ইন্দিরাকে উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলেছি এর আকার ও ঘটনাগত বিস্তারের জন্য, নানা প্রসঙ্গে রচনাটি শাখায়িত হয়ে ওঠার জন্য। কোনো চরিত্রের এমন কি নায়িকারও স্বভাবের বদল এ লেখায় প্রকাশ পায়নি, যদিও ইন্দিরার জীবনের পরিবর্তন নিয়েই কাহিনী।

কাহিনীর উপসংহার কিছুটা ফেনিয়ে তোলা, না হলে সবটাই সরস ও বুদ্ধিদীপ্ত, যেখানে কিঞ্চিৎ প্রলম্বিত সে শৈথিল্যটুকুও স্বাদ ও মেজাজের অনুগামী।

বাংলা উপন্যাসে ব্যঙ্গপ্রাণ রচনা কিছু দেখা গিয়েছে, কিন্তু হাস্যপ্রধান লেখা এই প্রথম। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই কিছু কমেডি উপন্যাস লিখেছিলেন। দুর্গেশনন্দিনী। মৃণালিনী। রজনী। দেবীচৌধুরাণী। এগুলি সবই গম্ভীর গাঢ়। দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষার এবং রজনীতে অমরনাথের বেদনা সে কমেডিকে বিষণ্ণ করেছে; মৃণালিনীতে পশুপতির ট্র্যাজেডি তাকে ম্লান করেছে; দেবীচৌধুরাণীতে তত্ত্বভাবনায় তা ভারাক্রান্ত। ইন্দিরার কমেডি গম্ভীর নয়, ব্যঙ্গাত্মকও নয়। তাতে হাস্য অবাধ এবং প্রচুর এবং সর্বদা কমেডির সঙ্গে তা ওতপ্রোত।

ইন্দিরা উপন্যাস অভিনব–বিষয় এবং রচনারীতির জন্য। নায়িকার মুখ দিয়ে পুরো গল্পটা বলা। ফলে যাবতীয় বিবরণে ও ভাবনায় সুরসিকা যুবতীর চাতুর্য মাধুর্য জড়িয়ে আছে। মেয়েলি কৌতুকের একটা পৃথক মাত্রা এর সম্ভোগ্যতা বাড়িয়েছে।

দুই

এই হাল্কা মেজাজের লেখাটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন বাঙালি পরিবারজীবনের কিছু ছবি এঁকেছেন। এদের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর জীবনধারা রুচি শিক্ষা প্রভৃতির পরিচয় যেমন আছে, তেমনি পুরোনো আদর্শ ও প্রথার অনুবর্তনের প্রসঙ্গও মিলছে। যেমন–

ক. ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিচয়।

১. সুভাষিণীদের পরিবার। কলকাতাবাসী, আধুনিক পেশায় (যেমন এটর্নিগিরি) ধনাঢ্য ও ইংরেজি শিক্ষিত।

২. উ-বাবুর সলিসারিয়েটে চাকরি করে অর্থবান হওয়া।

৩. ডাকাতের হাতে পড়লেও ইন্দির সহজেই শ্বশুরবাড়িতে গৃহীত হলো– এ রকম উদারতা নতুন কালের বোধ ছাড়া সম্ভব হতো না।

খ. পুরোনো সামাজিক আদর্শ ও প্রথা।

১. সেকালের পথঘাট যানবাহন, ডাকাতি ইত্যাদি।

২. ধনীর সঙ্গে পরিচারিকা শ্রেণীর নারীর অবৈধ সম্পর্ক–রক্ষিতারূপে তার অবস্থান।

৩. বাসরঘরে অন্তঃপুরিকাদের রঙ্গ-রসিকতার বিবরণ।

এইসব পুরোনো ব্যাপার ঊনবিংশ শতাব্দীতে অচল হয়ে যায়নি। তাই সাধারণভাবে সমকালীন জীবনে গল্পটিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এরূপ মনে করা যেতে পারে।

কিন্তু উনিশের শতকের বহিরঙ্গ ছাপে বঙ্কিম তাঁর গাঢ়গম্ভীর সামাজিক উপন্যাসগুলিতে তৃপ্ত হতে পারেননি। সে সময়ের জীবনজিজ্ঞাসার কোনো গভীর সুর বেজে ওঠার সুযোগ যদি এ ধরনের কাহিনীতে নাও থাকে, কোনো আভ্যন্তর তাৎপর্য তাকে স্পর্শ করা গিয়েছে কি?

আসলে গৃহস্থকন্যা গৃহস্থবধূ ইন্দিরার চরিত্রমূলে যে ভাবনা কাজ করেছে তা একান্তই আধুনিক। মধ্যযুগে তার আচরণ বারবণিতার মতো বলে নিন্দিত হতো। দাম্পত্য বন্ধনের পবিত্রতায় এ জাতীয় ' সেক্সো-রোমান্টিক অ্যাপিল'- এর স্থান ছিল না। লেখক নারীচিত্তের মুক্তির সঙ্গে নারীদেহের গৌরবকে অনেক হাসিতে সাজিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে এর ইতিহাসঘটিত তাৎপর্য ছিল অনেক, আজ অবশ্য তা বুঝবার উপায় নেই। কারণ আধুনিক সমাজজীবনে ঐসব ব্যাপারের সহজ স্বীকারণ ঘটেছে।

তিন

ছোট বই। কিন্তু কুশীলব কম নয়। গল্পের ও রসের নানা প্রয়োজন এরা মিটিয়েছে। সকলেই ঠিকঠাক মাপসই মানুষ। লেখকের অতন্দ্র দৃষ্টির বাইরে কেউ নয়।

গল্পের তিনটি অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাত্রপাত্রীদের ভূমিকাগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। তাদের তিন পর্যায়ে ভাগ করে দেখা যাক।

ক।। ডাকাতি থেকে শুরু করে সুভাষিণীদের বাড়িতে ইন্দিরার আশ্রয় পাওয়া পর্যন্ত গম্ভীর বিপন্ন অংশ। তার মধ্যে হাল্কা খুশি আছে 'বাজিয়ে যাব মল' অধ্যায়। এ পর্যায়ে ডাকাতের দল, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, সস্ত্রীক কৃষ্ণদাসবাবুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় অথবা নেহাৎ উল্লেখ। এরা কৌতুকের ফ্রেমে আঁটা নয়। ঠিক যেমন হবার কথা তেমনি সব মানুষ। তবুও বড় লেখকের হাতে কলম, তার চিহ্ন মিলছে। যেমন–

১. প্রাচীন দস্যু। দলের সর্দার। নেতৃত্ব করার হুকুম দেবার ক্ষমতা আছে। নিরাপত্তায় সতর্ক দৃষ্টি। ইন্দিরার বস্ত্র-সম্পদ হরণে নির্দয়, কিন্তু তার বিপদে কিঞ্চিৎ সকরুণ 'প্রাচীন দস্যু সকরুণভাবে বলিল' ইত্যাদি।

২. যুবা দস্যু। রূপমোহে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। তার উক্তি, 'আমি ইহাকে লইয়া ফাটকে যাই সেও ভাল, তবু ইহাকে ছাড়িতে পারি না।'

৩. গ্রামের বৃদ্ধা। সদয় কিন্তু নির্বোধ। দিকের জ্ঞান নেই। উল্টো পথ দেখিয়ে নায়িকার বিপদ বাড়িয়ে দেয়।

৪. ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। সরল দয়ার্দ্র গ্রাম্য লোক। ব্রাহ্মণ কিন্তু নির্বোধ নয়। অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে সুন্দরী যুবতীকে দূরের পথে পাঠাবার বিপদ বোঝে।

৫. গঙ্গার ঘাটে যারা গান গাইছিল। অনেক দুঃখের মধ্যেও নিসর্গ-সংস্পর্শে সহজ প্রফুল্ল ইন্দিরার যুবতী-মনের অকারণ আনন্দোচ্ছ্বাস–ঐ মেয়েগুলির মধ্যে তা-ই যেন মূর্তি ধরেছে।

৬. সস্ত্রীক কৃষ্ণদাস বসু। ভদ্রলোক দয়ার্দ্র। স্ত্রী নয়, 'বসু মহাশয়ের পরিবারকর্তৃক অনাদৃত হাইয়াও')। কিন্তু দুজনেই, বেশি অবশ্য গিন্নি দায় এড়াতে ব্যস্ত।

খ।। রামরাম দত্তের পরিবারে কাহিনীর অনেকটা কেটেছে স্ত্রী-পুরুষের, বয়সী-শিশুতে লোকও অনেক। তারা সবাই অল্প-বেশি হাস্যশ্রয়ী চরিত্র। কারুর চরিত্রমূলে কৌতুক, কেউ-বা ঈষৎ ব্যঙ্গের বিষয়–অবশ্য স্বভাবে হাস্যকর অসঙ্গতি আছে বলেই ব্যঙ্গ। 'ক' বর্গের লোকদের তুলনায় এরা সবাই বিস্তৃত, ঘটনায় এবং স্বাদসঞ্চারে এদের ভূমিকা অনেক ব্যাপক। তবে মানুষ হিসেবে এরা সকলেই সরল–এমন কি সুভাষিণীও। কিন্তু এরা বিচিত্র-স্বভাব। এদের পরিচয়–

১. গিন্নি। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত। বাড়িতে যুবতী পরিচারিকা রাখতে চায় না। ভয় কর্তাকে, যদিও আকারণ। নিজে কুরূপা। ঐ বাতিক মনস্তাত্ত্বিক। নিজের বয়স কম দেখাবার ইচ্ছা আছে। সাদা চুলে কলপ দিলে নিন্দা হবে, কিন্তু কলপ না হয়ে আরকে আপত্তি নেই অর্থাৎ আপত্তি নামে– মনকে না জেনেই চোখ-ঠারা। পুত্র-পুত্রবধূ স্নেহবশ। তার জন্য বাতিকে ছাড়তেও রাজি।

২. রামরাম দত্ত। ধনী বয়স্ক ভদ্রলোক। স্ত্রীর বাতিক অবহিত। তা নিয়ে ক্বচিৎ রসিকতাও করে। সুভাষিণীর লেখা চিঠিতে আছে, ইন্দিরার কাহিনী শুনে 'কর্তা' গৃহিণীকে কৃত্রিম কোপের সহিত তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন–তুমি ছল ছুতা করিয়া সুন্দর রাঁধুনিটাকে বিদায় করিয়া দিয়াছ।'

৩. সুভাষিণীর ছেলেমেয়ে। বঙ্কিমে শিশুর ছবি কম। যে দু-একটি আছে কলহাস্যমুখর সদানন্দ পূর্ণ বাৎসল্য-স্নাত। মেয়েটি কথায় কথায় ছড়া-কাটার মজা, ছেলেটির আধ-সাধ উচ্চারণ, এবং সঙ্গত-অসঙ্গত পরিস্থিতিতে নির্বিচারে উচ্চহাস্য কাহিনীকে আরও সরস করে তুলেছে।

৪. হারানী। অনুগত পরিচারিকা। অলুব্ধ, বিবেকসম্পন্ন। মনিব সুভাষিণীর উপরে পূর্ণ আস্থা–কোনো অন্যায় তার সমর্থন পেতে পারে না এই বিশ্বাসে অভিসারিকা ইন্দিরাকে সাহায্য করার ব্যাপারে সুভাষিণীর আচরণ তাকে নিয়ে কিছু কৌতুক-পরিস্থিতি তৈরি করেছে।

৫. রাঁধুনী। তার ঈর্ষা-ক্রোধ, মনিবকে ভয়, বোকামি মুহুর্মুহু মত-বদল ও কথা ঘোরানো তাকে রঙ্গ ও ব্যঙ্গের বিষয় করে তুলেছে।

৬. রমণবাবু। সুভাষিণীর র-বাবু। ইন্দিরার কাহিনীতে সে বেশ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে; অবশ্য স্ত্রীর ইচ্ছায়। অত্যন্ত পত্নীপ্রেমিক, এমন কি পত্নীবশ এই যুবক সুভাষিণীর কথায়ই কৌশলে মায়ের মত করিয়ে ইন্দিরাকে বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেছে, তার স্বামীর খোঁজ করে তাকে কলকাতায় এনে ওদের দুজনের যোগাযোগ ঘটিয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে মিলে এই ব্যাপারে সে চক্রান্ত করেছে–এই চক্রান্তে মনে হয় সে মজাও পেয়েছে। ছলনাজাল বিস্তার করার মধ্যে যে কৌতুক তা র-বাবুর স্বভাবের অংশ বলে মনে হয়। লেখক তাকে এমনভাবে গড়েছেন যাতে এ কাহিনীর সঙ্গে তাকে দিব্যি মানিয়ে যায়।

৭. সুভাষিণী। ইন্দিরার পরেই সবচেয়ে গুরুত্ব সুভাষিণীর। চরিত্রটি সম্পর্কে অনেক কিছু বলবার নেই, কারণ বিবিধ লক্ষণ বা একাধিক মাত্রা আনার প্রয়োজন উপন্যাসকার বোধ করেননি। তবে প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ, সদা হাস্যময়, চতুর মধুর সস্নেহ এই তরুণী বধূ সহজেই পাঠককে সম্পূর্ণ বশ করে ফেলে। প্রায় সমবয়সী নিরাশ্রয় ইন্দিরাকে সে প্রথম থেকেই পছন্দ করেছে। ক্রমে তা ভালোবাসায় পরিণত। আসলে সে যে ভদ্র ও ধনী ঘরের মেয়ে– এ রকম আন্দাজ সুভাষিণী প্রথমেই করেছিল, কারণ সে বুদ্ধিমতী। ইন্দিরার কাহিনী শুনে সে আরও গভীর মমতা বোধ করেছে এবং সখী হিসেবে তাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে।

সহজেই কৌতুকপ্রাণ এই বধূ র-বাবুকে সহকারী করে প্রথমত তাকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ায় (শাশুড়িকে রাজি করিয়ে), পরে তার সঙ্গে স্বামীর মিলন ঘটাবার চেষ্টায় বিস্তৃত চক্রান্তের জাল পেতেছে। ছদ্ম ছলনার মধ্য থেকে সে আনন্দের রোমাঞ্চ আদায় করে নিয়েছে। এটুকু তার উপরি-পাওনা। কিন্তু এর মধ্যেই তার মনের পরিচয় থেকে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত র-বাবুর সাহায্যে ইন্দিরার স্বামীকে উদ্ব্যস্ত করে রাখায় প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি দুষ্ট বুদ্ধি কিছু কম ছিল না।

সুভাষিণীর পূর্বরূপ বিষবৃক্ষের কমলে দেখেছি, কিন্তু সুভাষিণীতে কমলের পূর্ণরূপ। সুভাষিণী-রমণবাবুর সম্বন্ধ লেখক আভাসে ব্যক্ত করেছেন। তাতে অপ্রকাশিত থাকেনি যে ভদ্রলোক একটি মাত্র বর্ণে (র-বাবু) সংহত হয়ে স্ত্রীর সম্পূর্ণ করতলগত ছিল। ওদের দুজনের সংলাপের একটু উদ্ধৃত হল–

সুভার স্বামী একটু হাসিলেন। বলিলেন, 'তা আমায় কি করিতে হইবে?

সু। ওকে রাখিয়ে দিতে হবে।

স্বামী। কেন?

সুভাষিণী তাঁহার নিকট গিয়া, আমি না শুনিতে পাই, এমন স্বরে বলিল, 'আমার হুকুম।'

কিন্তু আমি শুনিতে পাইলাম। তার স্বামীও তেমনই স্বরে বলিলেন, ' যে আজ্ঞা'।

প্রাপ্তি ও পূর্ণতা থেকে তার হৃদয় চতুর্দিকে প্রীতি ও আনন্দ বিকীর্ণ করেছে, বুদ্ধি ও চাতুর্যের মিশ্রণ থাকায় তা আবেগবিহ্বল না হয়ে কৌতুকোজ্জ্বল হয়েছে।

গ।। হরমোন দত্তের বাড়িতে গল্পের শুরু, প্রকৃত সমাপ্তিও। উপসংহারটুকু সংযোজনমাত্র। ভূমিকায় চকিতে ইন্দিরার বাবার পরিচয় পাই। শেষ দিকে কামিনী প্রাধান্য পেয়েছে। প্রতিবেশিনী রমণীকুলের ছবি আছে। গল্পের শেষ আগেই হয়েছে, এদের ভূমিকা সরসতা সৃষ্টির জন্য মাত্র যুক্ত।

১. হরমোন দত্ত। বনেদী বড়লোক। অতি অহঙ্কারী। বেহাইয়ের তুলনায় আপনার ধনাঢ্যতা নিয়ে বিজয়গর্বে আত্মমগ্ন। যুবতী মেয়ের সুখ বা কামনা সম্বন্ধে ভাবার অবকাশ বা বুদ্ধি কিছুই তার ছিল না। একটি মাত্র উক্তিতে বঙ্কিম আশ্চর্য নিপুণতায় মানুষটিকে ধরে দিয়েছেন। জামাই বাড়ির পাল্কী-বেহারা দারোয়ান-দাসী প্রভৃতির জাঁকজমক দেখে 'আমার পিতা হরমোহন দত্ত, বুনিয়াদি বড়মানুষ, হাসিয়া বলিলেন, 'মা ইন্দিরে, আর তোমাকে রাখিতে পারি না। এখন যাও, আবার শীঘ্র লইয়া আসিব। দেখ, আঙুল ফুলে কলাগাছ দেখিয়া হাসিও না।'

২. প্রতিবেশিনী রমণীকুল। জামাই নিয়ে মেয়েদের দঙ্গল বেঁধে রসিকতার ছবিতে একটা দলগত রূপই ধরা পড়েছে। তার মধ্যে দু-একজন সামনে এলেও ব্যক্তি-স্বভাবে স্পষ্ট নয়। তার প্রয়োজনও ছিল না। নানা বয়সের নারী একটা লঘু উদ্দেশ্যে মিলেছে মজা করতে। সেই মোটা দাগের হাস্যকে কিছুটা ভাষাশ্রয়ী করে 'ভার্বাল হিউমারে'র পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

৩. কামিনী। সুভাষিণীর সাহচর্যের অভাব কিছুটা কামিনীকে দিয়ে পূরণ করানো হয়েছে। ইন্দিরার সমস্যা মিটে যাবার পরে প্রলম্বিত উপসংহারে কামিনী কৌতুকসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছে। বাঙালি-সংসারে শালিকা-ভগ্নীপতির রসিকতার সম্বন্ধকেই লেখক ব্যবহার করেছেন। তার ব্যক্তিত্বকে কোথাও বিশিষ্ট করে তোলা যায়নি।

ঘ।। কৌতুক-কমেডির নায়ক-নায়িকা ইন্দিরা ও উপেন্দ্র। নায়কের ভূমিকা গৌণ। নায়িকার সর্বাতিশয়ী প্রাধান্য। গুরুত্বের ক্রম-অনুসারে ইন্দিরা এবং সুভাষিণীর পরে উপেন্দ্রকে সাজাতে হয়।

উপেন্দ্রকে ঘিরে মজা করেছে র-বাবু এবং সুভাষিণী, কামিনী এবং প্রতিবেশিনীরা। আর স্বয়ং ইন্দিরা–সেখানে অবশ্য ভালোবাসা, এবং ভালোবাসা আকর্ষণ করা যুক্ত ছিল। উপেন্দ্রর সক্রিয়তা কম–ইন্দিরার বিদ্যুৎ বিকীর্ণ ঔজ্জ্বল্য ও বুদ্ধির বিচিত্র খেলার মুখে তাকে আরও নিষ্ক্রিয় বোধ হয়। উপেন্দ্র রূপবিহ্বল এবং প্রণয়-ব্যাকুল। কিছুটা বোকাটেও। চারদিকের নারীকুলের নানারূপ আক্রমণে তার অন্যরকম হবারও বড় উপায় ছিল না।

উপন্যাসের আসল পাত্রী ইন্দিরা। প্রেমে-কৌতুকে-চাতুর্যে-দুষ্টবুদ্ধিতে-যৌবনের লাবণ্যে ও বাসনায় সে সর্বক্ষণ ঝলমল করেছে। ডাকাতের হাতে পড়ার আগে বাপের বাড়িতে অল্পক্ষণই তাকে দেখা গিয়েছে। কিন্তু তার দু-একটি উক্তিতে স্বভাবের মূল প্রবণতা মুদ্রিত হয়েছে।

ক. একদিন মাকে বলিলাম, 'মা, টাকা পাতিয়া শুইব।' মা বলিলেন, 'পাগলী কোথাকার!' মা কথাটা বুঝিলেন।

খ. বোনের কাছে শ্বশুরবাড়ি কেমন, তার ব্যাখ্যা দিয়েছে–' সে নন্দনবন, সেখানে রতিপতি পারিজাতফুলের বাণ মারিয়া লোকের জন্ম সার্থক করে। সেখানে পা দিলেই স্ত্রীজাতি অপ্সরা হয়, পুরুষ ভেড়া হয়। সেখানে নিত্য কোকিল ডাকে, শীতকালে দক্ষিণে বাতাস বয়, অমাবস্যাতেও পূর্ণচন্দ্র উঠে।'

ডাকাতের হাতে বিপন্ন হয়ে পড়ার স্বভাবতই তার মনের এই বিশিষ্টতা বিমূঢ়, হতাশ ও বেদনাভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার মধ্যেও গঙ্গার ঘাটে মেয়েদের মল বাজাবার গান শুনে তার চিত্ত অকারণ আনন্দে ফুটে উঠতে চায়। সুভাষিণীদের বাড়িতে আশ্রয় মেলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সে নানা ছোটখাটো কাজে-কথায় চারদিকে হাসি-মজার ঢেউ তুলতে থাকে। নিজের দুর্ভাগ্যের দুঃখ হয় করার মানসিক শক্তির অফুরন্ত ভাণ্ডার ছিল তার স্বভাবে–ওসব তারই প্রমাণ।

স্বামীকে পাবার পর থেকে বহিরঙ্গ কৌতুকের স্থানে এল চাতুর্য ও মাধুর্যের মিশ্রণে তার মন জয় করার অন্তরঙ্গ সাধনা। ব্যাপারটা কঠিন ছিল না। কারণ নিরীহ হরিণশাবকের মতো ব্যাধের প্রথম তীরেই উ-বাবু হত হয়েছিল। কিন্তু উপেন্দ্রের মোহকে সর্বগ্রাসী করে তুলতে চেয়েছিল ইন্দিরা। যদি স্ত্রীর অধিকার সুনিশ্চিত নাও হয়, প্রেমিকার রাজত্ব উপেন্দ্রের চিত্তে সার্বভৌম করে সামাজিক সমস্যা জয় করবে ভেবেছিল। এটুকু তার প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজন ছাপিয়ে নারীস্বভাবের উল্লাসে যৌবনধর্মের প্রাবল্যে কৌতুকে সে এই খেলায় মত্ত হয়েছে–আপন রূপের মোহবিস্তারী শক্তিতে সচেতন সুখ পেয়েছে। ভালোবাসার সুখ। ইন্দিরার ভাবনা, 'পুরুষকে দগ্ধ করিবার যে কোনো উপায় বিধাতা স্ত্রীলোককে দিয়াছেন, সেই সকল উপায়ই অবলম্বন করিয়া আমি অষ্টাহ স্বামীকে জ্বালাতন করিলাম। আমি স্ত্রীলোক–কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া সে সকল কথা বলিব।... যদি আমার কোনো পাঠিকা নরহত্যার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং সফল হইয়া থাকেন, তবে তিনিই বুঝিবেন। যদি কোনো পাঠক কখন এইরূপ নরঘাতিনীর হস্তে পড়িয়া থাকেন, তিনিই বুঝিবেন।

ইন্দিরা যে ছলনাজাল বিস্তার করেছে, তাকে অপ্রয়োজনেও প্রসারিত করেছে। সে সবই তার প্রণয়সম্ভোগ। স্বামীকে পেয়ে যে দাম্পত্য জীবনের নৈমিত্তিকতা তাতে এই কল্যাণী বর্ণাঢ্যতার সুযোগ থাকে না। প্রাপ্তির জন্য রোমান্টিক কামনা ও প্রয়াস আর সংসারজীবনের অনুবর্তন জাতে আলাদা। গল্পের উপসংহারের ইন্দিরা এ বিষয়ে তার ভাবনা প্রকাশ করেছে, 'একটা কবির কাব্য, অপরটা ধনীর ধন। ধনীর ধন কবির কাব্যের সমান কি?'

ইন্দিরা চতুরতা ও মাধুর্যে, ছলনায় প্রেমে মোহবিস্তারে 'কবির কাব্য' রচনা করেছে, তার স্বাদ পেয়েছে।

১৫ রাজসিংহ : ইতিহাস না হৃদয়?

এক

১৮৭৮ সালে রাজসিংহ ধারাবাহিক ভাবে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হতে থাকে। ছয় মাস ধরে প্রকাশের পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। গল্প অসম্পূর্ণ থাকে। তিন বৎসর পরে ১৮৮২ সালে পুস্তকাকারে এটি প্রকাশিত হল। বঙ্কিমচন্দ্র তখন এটিকে উপন্যাস না বলে বলেছিলেন 'ক্ষুদ্র কথা'। প্রথম সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮৩। তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত এর মধ্যে যে সব সামান্য পরিবর্তন ঘটল তাতে দাঁড়াল ৯০ পৃষ্ঠা। এ সব পরিবর্তন এমন কিছু নয়। ১৮৯৩ সালে রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হলো। এবারে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩৪। আসলে চতুর্থ সংস্করণ একটি সম্পূর্ণ নতুন গ্রন্থ। এটিই বর্তমানে প্রচলিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারামে'র প্রকাশকাল ১৮৮৭ সালে। চতুর্থ সংস্করণ রাজসিংহই তাঁর শেষ উপন্যাস।

১৮৮২ থেকে ১৮৯৩ পর্যন্ত এই এগারো বছরে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম এই তিনখানা পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখলেন। 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং 'ধর্মতত্ত্ব' প্রকাশ করলেন। এ ছাড়াও ধর্ম ও দর্শনবিষয়ক অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখলেন 'প্রচার' ও 'নবজীবন' পত্রিকায়। পুরাতন প্রবন্ধগুলির নির্বাচিত রচনা প্রকাশ করলেন দুইভাগে 'বিবিধ প্রবন্ধ' নামে। ১৮৯৪ সালে যে মৃত্যু তাঁকে দর্শন দেবে পূর্ব থেকে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই তা জানতে পারেননি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র দ্রুততার সঙ্গে অনেকগুলি কাজ শেষ করে ১৮৯৩ সালে যেন নির্জনে নিজেকে নিয়ে একা বসলেন। অন্তরের গভীরে ক্লান্তি জড়িত বিদায়ের সুর বেজেছিল কিনা কে বলবে? কিন্তু ১৮৮১ সাল থেকে ধর্ম ও দর্শন-চেতনার যে নব স্থিতি তাঁকে কঠিন কর্মব্রতে ও জ্ঞানসাধনায় নিয়োজিত রেখেছিল, এমন কি উপন্যাস-শিল্পেও যা এনেছিল গুরুতর পরিবর্তন তার কঠিন মুষ্ঠি যেন শিল্পীর মনের উপর থেকে স্খলিত হয়ে পড়ল। নতুন উপন্যাস রচনার উৎসাহ নেই, পরিকল্পনা করে নতুন রচনায় হাত দেবার মতো যৌবন-সতেজ মন আর নেই। কিন্তু শিল্পীপ্রাণের সৌন্দর্যস্বপ্ন নেভেনি। ১৮৯৩ সালে তিনি যেসব রচনার নতুন সংস্করণে হাত দিয়েছেন সেখানেই এই স্বপ্নের স্পর্শ লেগেছে। 'রাধারাণী' রচনা হিসেবে উল্লেখযোগ্য নয়। 'ইন্দিরা'র আয়তনে বিস্তার স্বপ্নকল্পনার লঘুতরল দিক কৌতুকরস বিকীর্ণ করেছে, কিন্তু রাজসিংহে তা সুগভীর লিরিক বেদনার মূর্ছনা এনেছে। মোহিতলাল মজুমদারের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, 'দুর্গেশনন্দিনী যেমন তাঁহার কবিজীবনের প্রথম রোমান্স, রাজসিংহও তেমনই তাঁহার swan-song। ইহাতে সর্বজিজ্ঞাসা সর্বজীবন-সমস্যার সর্বভাবনামুক্ত হইয়া, কবি বঙ্কিম তাঁহার কল্পনার উপাধানে ক্লান্ত ললাট ন্যস্ত করিয়া আপন কবিজীবনের একটি বিষামৃত-মধুর রমণীয় স্বপ্ন দেখিয়াছেন,–সেই মবারক-জেবউন্নিসার প্রেমকাহিনী। রাজসিংহ উপ্যাসে সেই প্রেমের

যে অপূর্ব গীতি মূর্ছনা আছে, তাহার তুলনায় উহার বৃহত্তর কাহিনী ম্লান হইয়া গিয়াছে, এই সুবৃহৎ উপন্যাসের অন্তঃশ্রুত কাব্যধারা শেষে সেই যে একটি পরিচ্ছেদে যেন উদ্বেলিত হইয়া নিঃশেষ হইয়াছে, তাহাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের কবিপ্রাণের শেষ স্বপ্ন এবং কবি-জীবনের শেষ প্রয়াস সমাপ্ত এবং সার্থক হইয়াছে।[১]"

মোহিতলালের এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ গ্রহণ করা কঠিন হলেও পূর্ণাঙ্গ রাজসিংহ রচনার পেছনে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীপ্রাণের প্রবণতার কিছু গুরুতর ইঙ্গিত এখানে মিলবে।

রাজসিংহ (৪র্থ সংস্করণ) বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। সমাপ্তির এই সৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের পুরাতন পরিচয় নতুন করে মিলল।

প্রথমত, মৃত্যুর আগের বছরে, কর্মক্লান্ত বঙ্কিমের আগের ঔপন্যাসিক প্রতিভায় ন্যূনতা আসেনি। সীতারাম এবং রাজসিংহ শেষ দুই উপন্যাসে সুপ্ত শিল্পী-প্রাণ নতুন করে জাগরিত হয়েছে। সীতারামে শিল্পচেতনা ধর্মবুদ্ধির সঙ্গে সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজসিংহে শিল্পী বঙ্কিম ধর্ম ও দর্শন-বিষয়ে ভ্রূক্ষেপহীন।

দ্বিতীয়ত, ১৮৮২ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত যে ধর্মতত্ত্ব ও দার্শনিক প্রত্যয়ের রাজ্যে তিনি বাস করছিলেন, তাতে সাধারণ উপন্যাস রচনা তাঁর কাছে মনে হয়েছিল অর্থহীন, গল্পকথা যদি ধর্মপ্রচারের 'কলে' পরিণত হয় তবেই তাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন বঙ্কিম। শিল্পী বঙ্কিমের কাছে এসব বোধ আবরণের অধিক ছিল না, সীতারামে তার পরোক্ষ প্রমাণ থাকলেও রাজসিংহ তাকে নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠিত করল। তাঁর শিল্পীসত্তা বিশুদ্ধিতে মুক্তি পেল।

তৃতীয়ত, রাজসিংহ মাত্র লিরিক স্বপ্ন-সৌন্দর্যের মোহবিস্তারই করেছে, জীবনের কোনো সমস্যার তীক্ষ্ণতা সেখানে ঘটেনি, কিন্তু চিরকালীন মানবসমস্যা স্থান পেয়েছে, শিল্পীর জীবনদৃষ্টির বিশিষ্টতা ও উপন্যাসেও প্রতিফলিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্থ সংস্করণে উপন্যাসটিকে প্রায় পাঁচ গুণ বাড়ালেও প্রথম সংস্করণের খুব কম অংশই বর্জন করেছেন। ১৮৭৮ সালে বঙ্কিমের রচনাশক্তির এতই পরিণত ছিল যে পনের বৎসর পরে তাকে উন্নত করার কোনো সুযোগই তিনি আর পাননি। প্রায় অবিকৃত ভাবে এই অংশটি গৃহীত হওয়ার ঘটনাটি উল্লেখযোগ্য।
তিনি উপন্যাসটিকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য দুটি পথ ধরে কাহিনী ও চরিত্রগুলিকে বিকশিত করে তুললেন। চঞ্চলকুমারীর প্রসঙ্গকে অবিকৃত রেখে দিল্লীর প্রতিক্রিয়া ও প্রস্তুতির দিকে একটি শাখা বিস্তারিত করলেন। তারই সঙ্গে নানা সূত্রে দিল্লীর পথঘাটের বিবরণ, বাদশাহের হারেম, গুপ্তচরবৃত্তির বর্ণনার মধ্য দিয়ে জেবউন্নিসা-মবারক-দরিয়ার এক উপকাহিনীর সংযোগ ঘটালেন। মূলগল্পের মবারককে এই কাহিনীতে স্থান দেওয়ায় চঞ্চলকুমারীর গল্পের সঙ্গে এর একটা প্রাসঙ্গিক যোগসূত্রও থেকে গেল। দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল যেখানে কাহিনীটি শেষ হয়েছিল তার পরেও একে বিস্তারিত করে দেওয়া। সে সুযোগ মূল ক্ষুদ্র কাহিনীটিতে ছিল।

১. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : মোহিতলাল মজুমদার

এই কাহিনীটি ১৮৯৩ সালের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসটিকে পূর্ণাঙ্গ করবার কালে পূর্বলিখিত প্রথমাংশের মাঝখানে স্থানে স্থানে এ কাহিনীকে সুকৌশলে বিন্যস্ত করেছেন। তবে সব জায়গায় জোড় বেমালুম মেলেনি।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্র বইয়ের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় দাবি করলেন, 'আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।'

এই বিষয়টি বিবেচনায় যোগ্য। ঔরঙ্গজেবের শক্তি, ঐশ্বর্য ও কূটনীতিতে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য অধিকার বিস্তারে শীর্ষে উঠেছিল। বাধাহীন হিন্দুবিদ্বেষে, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্য ও সামন্তদেব সম্পূর্ণ উচ্ছেদে তিনি যে পরিমাণ সাফল্য লাভ করেছিলেন তাকে একদিক থেকে চরম বলা যেতে পারে। তেমনি চরম পতনের পূর্বাভাসও পাওয়া যায়; মোগল সাম্রাজ্যের পতনের দুরাগত কিন্তু সুনিশ্চিত পদধ্বনি এই কালপর্বেই শোনা যায়। যদুনাথ সরকার লিখেছেন, 'এইরূপে আওরঙ্গজেবের রাজপুতানা আক্রমণ ব্যর্থ হইল, এবং এই রাজনৈতিক দুষ্কর্ম ও ধর্মান্ধতার ফলে পরবর্তী শতাব্দীতে 'সোনার দিল্লী' সাম্রাজ্যও ধ্বংস হইল।... ঠিক এইরূপ একজন ধর্মান্ধ ওম্মায়াদ খলিফার চরিত্র ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এক কথায় আঁকিয়েছেন, আওরঙ্গজেবের পক্ষে সেকথা অক্ষরে অক্ষরে খাটে : 'The throne of an active and able prince was degraded by the useless and perncious *virtues* of a bigot.' (Gibbon)."

রাজসিংহ কিংবা শিবাজীর সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের সংঘর্ষ তাঁর শাসনকালের অন্যান্য বহু ঘটনার তুলনায় অনেক বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক ঐতিহাসিক লক্ষণাক্রান্ত। এই সংঘর্ষের মধ্যে যুগপরিবর্তনের দামামা-ধ্বনি শোনা যায়। শত শত বৎসর নির্যাতিত হিন্দু শক্তি যে লাঞ্ছনা বুকে বহন করেছে তা-ই এই দুই সংঘর্ষে বিস্ফোরিত তেজ নিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করল। মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত ধ্বংসের সূত্রপাত হলো ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের প্রান্ত থেকেই।

বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাস রচনাকালে যে বিশেষ আদর্শের প্রেরণা অনুভব করেছিলেন গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে সে-কথা তিনি লিখেছেন, 'ব্যায়ামের অভাবে মনুষ্যের সর্বাঙ্গ দুর্বল হয়। জাতি সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনও কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।'

বলা যেতে পারে, বঙ্কিম এই উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে বিকৃত করেননি। কিন্তু বঙ্কিমের শিল্পীমন শুধুমাত্র উপরে বিবৃত উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হলে তিনি উপন্যাসের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়ে প্রবন্ধ রচনায়ই উৎসাহ বোধ করতেন। শিল্পী রাজসিংহের কাহিনীর মধ্যে দুটি জাতির জীবনকল্লোল ক্রান্তিকালে যে সংক্ষুব্ধ গর্জন তুলেছিল তা কান পেতে শুনেছেন—এবং তাতেই মুগ্ধ হয়েছেন। রাজপুত-শক্তির মধ্যে সেদিন নব প্রাণতরঙ্গের যে চাঞ্চল্য জেগেছিল তার মধ্যে বিস্ময়কর দীপ্তি ছিল। দীর্ঘকাল পরে প্রতাপসিংহের

বংশধর রাজসিংহকে আশ্রয় করে যে চিত্তবিত্তের সমগ্র জাতীয় জীবনে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা বঙ্কিমচন্দ্র ব্যর্থ হতে দেননি। বর্ণনা চরিত্র-চিত্রণ ও কাহিনী-বিন্যাসে এই রাজপুত দৃষ্টিকোণটি উপন্যাসের একপ্রান্ত অধিকার করেছে। সচেতন ইতিহাসযোদ্ধা ও হিন্দুপুনরভ্যুত্থানবাদী বঙ্কিমের চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা এই রাজপুত দৃষ্টিকোণের সঙ্গে আপন মানসসামীপ্য অনুভব করেছিলো একথা ঠিক। কিন্তু এই বোধ বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীব্যক্তিত্বের নিরপেক্ষতায় বিঘ্ন ঘটায়নি। ঔরঙ্গজেবের অবগুণ্ঠিত ব্যক্তিচরিত্র তথা বিলাসিনী জেবউন্নিসার দীর্ণ হৃদয়লোকের গভীরে সেই দৃষ্টির প্রবেশ ঘটেছে।

রাজপুতদের মধ্যে নব্য জাতীয় চেতনার যে উন্মেষ ঘটেছিল তার বিস্তৃত বিবরণ বঙ্কিমচন্দ্র দেননি। শুধু চঞ্চলকুমারীর চরিত্রের মধ্যে তারা পরোক্ষ ছায়াপাত করে সেই জাতীয় উদ্বেলতাকে ব্যঞ্জিত করেছেন। যে মনোভাব নিয়ে সে ঔরঙ্গজেবের চিত্রদলন করতে সাহসী হয়েছে, মোগল সম্রাজ্ঞীর লোভনীয় সিংহাসন হেলায় প্রত্যাখ্যান করেছে বেশিবয়স্ক কিন্তু বীর ও জাতীয় নেতা রাজসিংহকে বরণ করেছে তা একটা যুগ-মানসিকতার ব্যক্তিক প্রকাশ রূপে গ্রহণীয়।। মাণিকলালের মধ্যেও সুপ্তোক্ষিত আরাবল্লীর পার্বত্য মানুষদের প্রতিনিধিত্ব। হীন দস্যুতা থেকে তার সুচতুর সেনানায়কে সমুন্নতি দীর্ঘদিনের জড়ত্ব ঝেড়ে ফেলে মেবারীদের মুক্তির সুতীব্র বাসনার রূপক হয়ে উঠেছে। নির্মলকুমারীর মতো সামান্য পরিচারিকা যে সাহসে ও তীক্ষ্ণতায় ভারত-সম্রাটের মুখের সামনে দাঁড়িয়েছে তার মধ্যে একটি মাত্র বালিকা নয়, যুগব্যাপী লাঞ্ছনার মধ্য থেকে রাজপুতানার নারীকুলের বিদ্রোহী চিত্তের আবরণমুক্তি দ্যোতিত হয়েছে। রাজপুত জাতির এ এক মহা জাগরণ। বিক্রম সোলাঙ্কি পরাধীনতা থেকে অকস্মাৎ বীরত্বের ও গৌরবের শীর্ষে আরোহণ করেছে, এমন কি সম্রাটমহিষী যোধপুরী বেগম পর্যন্ত জাতির মুক্তির এই তরঙ্গ পৌঁছেছে। রাজপুতের ঔদার্য মোগল বীর মবারকের সাহায্যও সহজেই আহ্বান করে এনেছে।

অপরপক্ষে মোগল ইতিহাসের দিক থেকেও সময়টা ক্রান্তিকাল। ঐশ্বর্য ও শক্তির উচ্চতম শিখর থেকে নিচের খদগুলি দেখা গিয়েছে। ঔরঙ্গজেবের রাজধানী, ঐশ্বর্যের দীপ্তি, মণিমাণিক্য বিকীর্ণ অন্তঃপুরের শোভা মোগল সাম্রাজ্যের শক্তির পটভূমি রচনা করেছিল-তার মধ্যেই ধ্বংসের বীজ লক্ষ্য করেছেন শিল্পী। রাষ্ট্রনীতি-যুদ্ধনীতি এই পতন আহ্বান করেছে, অন্যদিকে ঐশ্বর্য ও শক্তির অন্তরালে মানব-আত্মার বুভুক্ষা অনিবার্য করে তুলেছে এই বিপর্যয়কে। জেবউন্নিসার কাহিনীও এই সত্যই উজ্জ্বল করেছে। ঐশ্বর্য এ শক্তির মত্ততায় সে হৃদয়কে উপেক্ষা করেছিল, গভীর দুঃখের আঘাতে সেই সত্য উপলব্ধি করতে করতেই তাকে বিপর্যয় বরণ করতে হল। মোগল রাজনন্দিনীর এই কাহিনী মোগল রাজশক্তির ঐতিহাসিক নিয়মিতরই এক ব্যক্তিগত প্রকাশ। আর ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিচরিত্র-তার সুপ্রকাশিত বাহির এবং অবগুণ্ঠিত অন্তর মোগল ইতিহাসের সর্ব এশ্বর্য ও যন্ত্রণা, শক্তির দম্ভ ও সর্বনামের পূর্বাভাসকে ধরে রেখেছে।

রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের জাতীয় জীবনের একটি পর্বের ক্রান্তিচেতনাকে ব্যাপক গাম্ভীর্যে ও সমুন্নত উল্লাস-আর্তনাদের মধ্যে ধরে রেখেছেন।

তিন

রাজসিংহ উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রের ভীড়। দুটি জাতির সংঘর্ষ এবং সামগ্রিক জীবন-কলরোলকে স্থান দিতে বহু মানুষকে আনতে হয়েছে। গুরুত্বের দিক থেকে এদের কয়েকটি শ্রেণীতে রাখা যায়-

১. জনতার যৌথ স্বভাব-মোগল এবং রাজপুত। এদের কথা আগেই বলা হয়েছে।

২. জনতার প্রতিনিধি, ছোট চরিত্র-সেনাপতি হাসান আলি, সিপাহী মহম্মদ খাঁ, তসবিরওয়ালী, রসিকা পানওয়ালী, পুরোহিত অনন্ত মিশ্র, মাণিকলালের পিসি প্রভৃতি।

৩. কাহিনীর ভেতরে স্থান কিন্তু ভূমিকা গৌণ-বিক্রম সোলাঙ্কি, উদিপুরী, যোধপুরী বেগম।

৪. প্রধান চরিত্র, যাদের ভূমিকা বড়-রাজসিংহ, চঞ্চলকুমারী, ঔরঙ্গজেব, নির্মলকুমারী, মাণিকলাল, জেবউন্নিসা, মবারক, দরিয়া।

এই সব লোকজনের পরিচয় নেবার আগে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ মন্তব্যের কথা উল্লেখ করব। 'রাজসিংহ প্রথম পড়িতে মনে হয়, সহসা এই উপন্যাস-জগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণের শক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে যেখানে কষ্টে চলিতে হয়, এই উপন্যাসের লোকেরা সেখানে লাফাইয়া চলিতে পারে।.... আধুনিক ইংরেজি নভেলে পদে পদে বিশ্লেষণ .... একটা সামান্যতম কার্যের সহিত তাহার দূরতম কারণপরম্পরা গাঁথিয়া দিয়া সেটাকে বৃহদাকার করিয়া তোলা হয়।.... সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহি না। কিন্তু সত্যকে সম্যক প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে ভারের আবশ্যক, সেটুকু ভারে কেবল সত্য ভালোরূপে অনুভবগম্য হইয়া হৃদয়ে উৎপাদন করে; কল্পনাজগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় স্পর্শযোগ্য ও চিরস্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভাবেরও কিয়দংশ যেন বাদ দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যে টুকু কম পড়িয়াছে গতির দ্বারায় তাহা পূরণ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রত্যেক অংশ অসন্দিগ্ধরূপে সম্ভবপরও প্রশ্নসহ করিয়া তুলেন নাই, কিন্তু সমস্তটার উপর দিয়া এমন দ্রুত অবলীলার ভঙ্গিতে চলিয়া গিয়াছেন যে প্রশ্ন করিবার আবশ্যক হয় নাই।'[১]

রবীন্দ্রনাথ যত রমণীয় কৈফিয়ত দিন এর মধ্যে যে অভিযোগের বীজ আছে আধুনিক বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনার আঙুল সেখানে পড়বেই। ঔপন্যাসিক ইতিহাস-ঘটনার দ্রুত গতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এতে অন্তত দুটি মুখ্য অবিকশিত থেকেছে, চঞ্চলকুমারীর সম্ভাবনা পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়নি, রাজসিংহ ইতিহাসের ধূসরলোক থেকে মানবিক বৃত্তিতে নিশ্চিত প্রতিষ্ঠা পায়নি।

চার

জনতার ভীড়ের মধ্য থেকে কয়েকটি মানুষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাদের স্বভাবে ব্যক্তি-লক্ষণের স্পর্শ সামান্যত মিলছে।

---

১. রাজসিংহ : আধুনিক সাহিত্য- রবীন্দ্রনাথ

মোগল সেনাপতি হাসান আলি খাঁ প্রকাশ পেয়েছে দরিয়া বিবির সংযোগে। সেনাপতি হিসেবে সে অপদার্থ অকর্মণ্য ছিল না। কিন্তু মেহেরজানের ছদ্মবেশে দরিয়া রূপে ও নৃত্যে অল্পায়াসে তাকে সেনাপতির নিয়মানুবর্তিতা থেকে ভ্রষ্ট করল।

নূর মহম্মদ খাঁ মোগল সৈন্যদের চরিত্রের একটা টাইপ। একটা অংশের প্রতিনিধি। যুদ্ধে সে সম্ভবত কৃতি ছিল, কিন্তু ইন্দ্রিয়শিথিল লোলুপতায় সে স্থূলবুদ্ধি ও সম্পূর্ণ বিচারবিমূঢ়।

তসবিরওয়ালীর রসিকতা বক্র ও মার্জিত, উচ্চবংশের অন্তঃপুরে দোকানদারির অঙ্গ। চঞ্চলকুমারীর সৌন্দর্য দেখে 'বুড়ী তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। এ প্রণাম রাজকুলকে নহে–এ প্রণাম' সৌন্দর্যকে।' এই মন্তব্যে লেখকের আত্মভাব কিঞ্চিৎ প্রতিফলিত, কিন্তু রাজপরিবারে ছবি বিক্রি-করা যার ব্যবসা তার পক্ষে সৌন্দর্য দেখার এই চোখও অস্বাভাবিক নয়।

রসিকা পানওয়ালী এক ধরনের পণ্যা নারী। তার রূপের বর্ণনায়, দোকানদারির বিশিষ্ট ঢঙে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু কিছু বেশি ক্রেতা আকর্ষণ করেই তৃপ্ত নয়। তার হাসিতে, তার দোকানের আদিরসাত্মক চিত্রের সজ্জায়, মাণিকলালের প্রস্তাবে সেই আদিরসযুক্ত রঙ্গরসের ভোজে যোগ দেবার আগ্রহে তার স্বভাবের ভেতরটা পুরোই প্রকাশ পেয়েছে।

নায়িকার প্রণয়দৌত্যে নিযুক্ত পুরোহিত অনন্ত মিশ্র বিক্রমসিংহের কাছ থেকে কৌশলে পরিচয়পত্র সংগ্রহে এবং লুব্ধা স্ত্রীকে নিবৃত্ত করায় মোটামুটি বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে পরিচিতি পেল। যার স্বভাবে কৌতুকবোধের কিছুটা মাত্রা আছে। কিন্তু দস্যুদলের সামনে তার সব বুদ্ধি লোপ পেয়েছে, কৌশল স্তব্ধ হয়েছে, ভীতিবিহ্বল পলায়নপরতা পাঠকের কৌতুকের উপাদান হয়ে উঠেছে।

মাণিকলালের পিসি দরিদ্র ও অর্থবশ গ্রাম্য রমণী। তবে প্রাণবন্ত এবং কিছু হাস্যের বিষয়।

রাজসিংহ উপন্যাসের এইসব ছোট চরিত্রগুলি মোটামুটি জীবন্ত এবং প্রায়ই কিছু কৌতুক এদের ঘিরে খেলা করেছে। উপন্যাসের ভেতরের গাম্ভীর্য, যুদ্ধ, মানসিক ভার ও চাপের উপরে এরা লঘু তুলি ছুঁইয়ে গেছে।

পাঁচ

বিক্রম সোলাঙ্কি, যোধপুরী বেগম এবং উদিপুরীর গুরুত্ব আছে উপন্যাসে, স্বভাবেও কিছু বিশিষ্টতা আছে–যা এক কথায় সেরে দেওয়া যায় না।

বিক্রম সোলাঙ্কি নায়িকা চঞ্চলের বাবা, ছোট রূপনগরের অল্পশক্তি রাজা, এবং মোগলপদলেহী সামান্য মানুষ। স্বাধীন চিত্ততার চিহ্ন তার মধ্যে নেই। দিল্লীশ্বর চঞ্চলকে বিয়ে করতে চাইলে সে সম্মানিত বোধ করেছে। 'রূপনগরে আর আনন্দের সীমা রহিল না।... বাদশাহের বাদশাহ– যাহার সমকক্ষ মনুষ্য-লোক কেহ নাই–তিনি জামাতা হইবেন,– চঞ্চলকুমারী পৃথিবীশ্বরী হইবেন ইহার অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে?' চঞ্চলকে বিয়ে করার জন্য রাজসিংহের প্রস্তাব সে রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ওটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু রাজসিংহের হাতে ঔরঙ্গজেবের পরাজয়ের পরে বিক্রম সোলাঙ্কির নবজন্ম ঘটল। মোগল-বিরোধী যুদ্ধে তার ধূর্ততা, রণনৈপুণ্য ও বীর্যবত্তার যে পরিচয় মিলল তাকে এ চরিত্রের নতুন সূত্র বলে গ্রহণ করা যায়। এ-বদল অসঙ্গত নয়, কিন্তু কিছু সুপ্ত; পূর্বগামী ইঙ্গিতের অভাব রয়েছে।

আসলে পনের বছর আগে রাজসিংহ গল্পে বিক্রম সোলাঙ্কি চরিত্রের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, এখন উপন্যাসকে পূর্ণ রূপ দিতে গিয়ে তাতে বড় রকমের বদল ঘটেছে। কিন্তু বহুকাল আগে লেখা অংশের সঙ্গে তাকে মিলিয়ে দেওয়া যায়নি।

যোধপুরী চরিত্রে বঙ্কিমের হিন্দু আদর্শবাদের প্রতিফলন ঘটেছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। যোধপুরী প্রতিনিয়ত তার বেগম-জীবনকে ধিক্কার দিয়েছে, রাজনীতির যূপকাষ্ঠে তার জীবন, তার একাগ্র ধর্মচেতনা সব কিছু বিসর্জিত বলে সে মনে করেছে। ধর্মদ্বেষ তার পত্নীত্ব– তার নারীত্বকে নিঃশেষে আবৃত করে ফেলেছে। চঞ্চলকুমারী প্রসঙ্গে ঔরঙ্গজেবের আদেশ শুনে সে বলেছিল, ' হে ভগবন্। আমাকে বিধবা কর। এ রাক্ষস আর অধিক দিন বাঁচিলে হিন্দুনাম লোপ পাইবে।' হৃদয়হীনা এই রমণীকে কিছু অস্বাভাবিক চরিত্রের বলেই মনে হয়। বঙ্কিম কি হিন্দু আদর্শ প্রচার করতে গিয়ে এই অস্বাভাবিক অবস্থিতিকে নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন? অথবা এই পরিকল্পনার পিছনে কিছু গুরুতর শিল্পগত উদ্দেশ্য আছে?

ঔরঙ্গজেবের হারেমের একদিকে উদিপুরী-জেবউন্নিসা অন্যদিকে যোধপুরী। উদিপুরী-জেবউন্নিসার চরম উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগবিলাসে এ হারেমের যে শান্তিহীন তৃপ্তিহীন কলুষ প্রকট, হৃদয়হীনা যোধপুরীর জ্বলন্ত অভিসম্পাত তাতে শ্মশানের রক্তিমাভা সঞ্চার করেছে। উদিপুরীর নিষ্ঠাহীন পত্নীত্বের বিপরীতে বঙ্কিম যোধপুরীর হিন্দু নারীত্বের সংস্কারধন্য পাতিব্রত্যের মহিমা দেখাননি। পত্নীত্ব ও নারীত্ব থেকে ভ্রষ্টা এক নারীর ব্যর্থ জীবনের জ্বালা যেন তার মধ্যে মূর্তি ধরেছে।

উদিপুরীর চরিত্র প্রায় এক রঙে রাঙানো। অবশ্য তার মধ্যে কিছু আলোছায়ার খেলা আছে। উদিপুরীর লালসা, বিলাস, মদ্যাসক্তি সব মিলে কোথাও মাহাত্ম্যের কিছু নেই। বঙ্কিমের ভাষায় 'উদিপুরীর যেমন অতুল্য রূপ, তেমনি অতুল্য মদ্যাসক্তি।... উদিপুরীর বামহাতে সটকা, নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত, অপরবাহুলীর উপর মাছি উড়িতেছে; ঝটিকাবিভিন্ন ভূপতিত বৃষ্টিনিষিক্ত পুষ্পরাশির মতো উদিপুরী বিছানায় পড়িয়া আছে।'

উদিপুরী দেহসর্বস্বা, হৃদয়হীনা। জেবউন্নিসার বিলাস-ঐশ্বর্যের অন্তরে যে হৃদয়াবেগ সুপ্ত ছিল, উদিপুরীতে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির যে অসিধার জেবাউন্নিসার উচ্ছৃঙ্খলতা ও লালসাধিক্যকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল উদিপুরীতে তা ছিল না। সে আকণ্ঠ ভোগে মজ্জিত, কিন্তু সুপ্রচুর ভোগেও অতৃপ্ত। নির্মলকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে মদ্যপানে হতচেতন উদিপুরী বলেছে, 'না, না, তুমি ফার্স মুলুকের বাদশাহ। মোগল বাদশাহের হাত হইতে আমাকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছ। নির্মলকুমারী হাসি সামলাইয়া চঞ্চলের পত্রখানি উদিপুরীর হাতে দিল। উদিপুরী তাহা পড়িবার ভান করিয়া বলিতে লাগিলেন, কি লিখিতেছে? লিখিতেছে, অয় নজ্‌নী! পিয়ারে মেরে! তোমার সুরৎ ও দৌলৎ শুনিয়া আমি একেবারেই বেহোস ও দেওয়ানা হইয়াছি। তুমি শীঘ্র আসিয়া আমার কলিজা ঠাণ্ডা করিবে। আচ্ছা, তা করিব। হুজুরের সঙ্গে আলবৎ যাইব। আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি একটু শরাব খাইয়া লই...'

এ কি শুধুই অসংযত অসংলগ্ন প্রলাপ, না অতৃপ্ত ভোগাকাঙ্ক্ষার অশান্ত আর্তনাদ?

ছয়

রাজসিংহই বর্তমান উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। অন্তত বঙ্কিমচন্দ্র তাকে প্রধান ভূমিকা দিতে চেয়েছেন। হিন্দুর বীরত্ব ও রণকৌশল দেখাবার উদ্দেশ্যে তিনি বহু বীরপুরুষের মধ্য থেকে রাজসিংহকে বিশেষ করে বেছে নিয়েছেন। রাজসিংহের বীরত্বে সসাগরা ভারতের অসপত্ন অধীশ্বর মোগলসম্রাট মহাবীর আলমগীর কিরূপ পর্যুদস্ত হয়েছিলেন তাই-ই উপন্যাসের মূল বিষয়। রাজসিংহ এ উপন্যাসের প্রধান পাত্র। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, 'ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরঙ্গজেব রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ। উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কিনা জানি না। নায়িকা জেবউন্নিসা।'

কিন্তু এই উপন্যাসের ঐতিহাসিক এবং উপন্যাস-অংশকে এমনি স্পষ্ট দুভাগ করা যায় না। রাজসিংহ ঐতিহাসিক ঘটনার কর্তা হয়েও যদি ঔপন্যাসিক চরিত্র রূপে প্রাধান্য না পায় তবে এ রচনা একটা দ্বিধাগ্রস্ত শিথিল বই হয়ে পড়ে। তা কিন্তু হয়নি।

এ উপন্যাসে ঘটনার প্রধান নিয়ন্ত্রা রাজসিংহ। সে ঘটনাকে শুধু ইতিহাস-ঘটনা বলব না। তা হলো উপন্যাসের কাহিনী। তবে তা ঐতিহাসিক উপন্যাসের। ঐতিহাসিক ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে গিয়ে রাজসিংহ পৃথক চেষ্টা না করেই সেই উপন্যাস-কাহিনীকেও পরিচালিত করতে পেরেছে আপন অভীষ্ট পথে।

রাজসিংহ সাহসী স্বাধীনতাকামী দেশনেতা ; বীরত্বে ও রণকৌশলে তার দোসর খুঁজে পাওয়া কঠিন। দয়া ও প্রজাহিতৈষণায়ও তার তুলনা নেই। চরিত্র-লক্ষণগুলি কতকগুলি রাজনৈতিক সাধারণ গুণ; ইতিহাসের গতিতে এ জাতীয় চরিত্র-বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন নৃপতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কোথায়? বিখ্যাত ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের মনের গভীরে প্রবেশ করে তার ইতিহাস-পরিচিত স্বভাবধর্ম, মতামত প্রভৃতিতে উল্লেখযোগ্য বিকৃতি না ঘটিয়ে, বা ঘটিয়েও কল্পনার সাহায্যে তার ব্যক্তি-হৃদয়ের কি চিত্র সৃষ্টি করতে পারলেন ঔপন্যাসিক সেখানেই তাঁর পরীক্ষা।

চঞ্চলকুমারীকে উদ্ধার করতে যাওয়ায় রাজসিংহ কিছু রাজনৈতিক তথা রণনৈতিক হঠকারিতার পরিচয় দিয়েছিল। চঞ্চলকুমারীর পত্র তাকে রোমান্টিক প্রেমাকুলতায় যথেষ্ট বিচলিত করেনি, এ কথা বিশ্বাস করবার কারণ আছে। রাজসিংহ তরলবুদ্ধি তরুণ নয়। কোনো অ্যাড্‌ভেঞ্চারের নেশা তাকে রূপনগরের পাহাড়ের দিকে আকর্ষণ করেনি। তবু সে বুদ্ধি-বিবেচনা-যুক্তির বন্ধন ছাড়িয়ে উঠেছিল। অথচ প্রবল ভাবাবেগে আলোড়িত হবার লক্ষণও বাইরে প্রকাশ পায়নি। কিন্তু ভাবাবেগের জন্ম হয়েছিল। তা না হলে ঐ জাতীয় হঠকারিতায় সে ঝাঁপিয়ে পড়ত না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রৌঢ় নৃপতির সে ভাবাবেগকে সংহত ও গূঢ়চারী করে রেখেছেন, তরল হয়ে উঠতে দেননি। রাজসিংহ অপরিচিতা বালিকার আহ্বানে সাড়া দিলেন–কোনো রাজপুত বীরই এ জাতীয় হঠকারিতা থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারে না, রাজপুত কুলপতি তো নয়ই। রাজসিংহ উপন্যাসে রাজপুতদের জাতীয় চরিত্রের যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে তাতে এক্ষেত্রেও অন্যথা ঘটবার নয়। বিশেষত চঞ্চলকুমারীর পত্র রাজসিংহের রাজনৈতিক

চরিত্রকে কতটা আলোড়িত করল? তার রাষ্ট্রনৈতিক অস্তিত্বের অন্তরালের মানবমনকে কতটুকু প্রকাশ করল?

চঞ্চলকুমারী-হরণকালে মবারকের সঙ্গে রাজপুতদের এক সংঘর্ষ ঘটেছিল। তখনই মাত্র চঞ্চলকুমারীকে প্রথম দেখল রাজসিংহ। চঞ্চলের এক প্রশ্নের উত্তরে রাজসিংহ বলেছে, 'তোমারই জন্য এতদূর আসিয়াছি–তোমাকে অদেয় কিছুই নাই–কি চাও, রূপনগরের কন্যে?'

এ ভাষায় রাজপুত শিভালরি এবং মোগলবিরোধী স্বাদেশিকতা মাত্র নয়, অন্য কোনো সুরও বেজেছে। প্রৌঢ় নৃপতির রূপমুগ্ধতা অতি সংযতভাবে হৃদয়াবেগকে সামান্যতম স্পর্শ করেছে।

উদয়পুরের প্রাসাদে রাজসিংহের ব্যক্তিসত্তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে চাইছিল। চঞ্চলকে সে বলেছে, 'তোমার মতো লোকমনোমোহিনী সুন্দরী যে রাজার মহিষী, সকলেই তাহাকে ভাগ্যবান বলিবে। তুমি এমন অদ্বিতীয়া রূপবতী বলিয়াই তোমাকে মহিষী করিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি।'

এখানেও বঙ্কিম-কল্পনার সেই কেন্দ্রবিন্দু–সুতীব্র রূপমোহ। একান্ত সংযত এবং সংক্ষিপ্ত হলেও রাজসিংহের ব্যক্তিপরিচয় মিলছে এই রূপমোহেই। কিন্তু 'শ্রী, তুমি এত সুন্দরী!'–সীতারামের কণ্ঠে নিয়তির এই আর্তরব–এখানে ধ্বনিত হয়নি। রাজসিংহের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ও আদর্শবাদের তা আচ্ছন্ন হয়েছে। এবং যতখানি তা আচ্ছন্ন ততখানিই উপন্যাসের চরিত্ররূপে রাজসিংহের উৎকর্ষ ব্যাহত।

চঞ্চলকুমারী এ উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র। নানা কারণে জেবউন্নিসা আমাদের অনেক বেশি আকর্ষণ করলেও কাহিনীকেন্দ্রে তার স্থান নয়–তার অবস্থান মূল গল্পের প্রান্তে। চঞ্চলের বালিকা-চাপল্য ও স্বজাতিচেতনার ফলে ঔরঙ্গজেবের চিত্রদলন ঘটল। তাকে উদ্ধার করতে এসে রাজসিংহের সঙ্গে মোগলদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সূত্রপাত। চঞ্চল একটি বারের জন্যও কাহিনীকেন্দ্র থেকে অপসৃত নয়। কিন্তু তবু এ অভিযোগ অস্বীকার করবার উপায় নেই যে ইতিহাসের প্রয়োজনেই চঞ্চলের সম্ভাবনাপূর্ণ চরিত্রটি বিকশিত হতে পারেনি।

চঞ্চলের চরিত্রের মধ্য দিয়ে গোটা রাজপুত জাতির নবজাগরণ তরঙ্গিত হয়েছে। চঞ্চলকুমারী ঔরঙ্গজেবের চিত্র পদদলিত করেছে। ঘটনাটির মধ্যে বালিকার উত্তেজনা আছে। কিন্তু রূপনগরের অন্তঃপুরে, বিক্রম সোলাঙ্কির মোগলপদলেহনের অপমান ভেদ করে এক তরুণীর হৃদয়ে এই স্বাজাত্যভিমান ও মোগল-বিরোধিতা অন্য কোনো ধরনের বাস্তব পন্থায় ক্রোধ ও উত্তেজনা প্রকাশ করতে পারত না।

চঞ্চলের যে স্বজাতিপ্রীতি ঔরঙ্গজেবের চিত্রদলনে তাকে উত্তেজিত করেছে তাই-ই আবার প্রৌঢ় নৃপতি রাজসিংহের প্রতি তাকে প্রেমাসক্ত করে তুলেছে। এ প্রেমও এক ধরনের আদর্শবাদ। প্রৌঢ় রাজসিংহের প্রতি তরুণী চঞ্চলের প্রেম। বারবার বয়সের পার্থক্যের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু নায়িকার হৃদয়রাজ্যে এর কিছুমাত্র প্রতিক্রিয়ার সংবাদ মেলেনি। অথচ চঞ্চলের চরিত্রে আদর্শবাদের চড়া রঙ ছাপিয়েও মানবিক জীবনকামনা একাধিক বার প্রকাশিত এবং এ জন্যই এই নারী-চরিত্র গভীরতর পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে।

রাজসিংহের কাছে লেখা পত্রে চঞ্চল বলেছিল, 'প্রয়োজন হইলে প্রাণ বিসর্জন করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।' এটুকু রাজপুত আদর্শবাদের কথা। কিন্তু পরের পংক্তিতেই সে বলেছে, 'কিন্তু তথাপি এই অষ্টাদশ বৎসর বয়সে এ অভিনব জীবন রাখিতে বাসনা হয়।' এই 'তথাপি'টুকুর পত্রান্তরাল থেকে চঞ্চলের মনের ইঙ্গিত মিলেছে, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বিকশিত করে তোলেননি। ঔরঙ্গজেবের সেনাবাহিনীর সঙ্গে চলে যাবার আগে চঞ্চল বলেছে, 'ফুলের মালা পরাও সখি–আমি চিতারোহণে যাইতেছি।....পরাও! পরাও! নির্মল! কুৎসিত হইয়া কেন মরিব? রাজার মেয়ে আমি, রাজার মেয়ের মতো সুন্দর হইয়া মরিব।' এই চঞ্চলের কথা বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে শোনাননি।

ঔরঙ্গজেব চরিত্রের যে পরিচয় এই উপন্যাসে ফুটেছে তাঁর সঙ্গে প্রকৃত ঐতিহাসিক তথ্যের দ্বিমত নেই। এ বিষয়ে আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখ পণ্ডিতদের মতামত অনুসরণযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র ঔরঙ্গজেবের কুটবুদ্ধি, হিন্দুবিদ্বেষ, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি রাজনৈতিক চিত্তধর্মগুলিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন, 'ঔরঙ্গজেব জগৎপ্রথিত বাদশাহ। তিনি জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। নিজেও বুদ্ধিমান, কর্মদক্ষ, পরিশ্রমী এবং অন্যান্য বহু গুণে গুণবান ছিলেন। এই সকল অসাধারণ গুণ থাকিতেও সেই জগৎ প্রথিতনামা রাজাধিরাজ আপনার জগৎপ্রথিত সাম্রাজ্য একপ্রকার ধ্বংস করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিলেন। ইহার একমাত্র কারণ, ঔরঙ্গজেব মহা-পাপিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার ন্যায় ধূর্ত, কপটচারী, পাপে সঙ্কোচশূন্য, স্বার্থপর, পরপীড়ক দুই একজন মাত্র পাওয়া যায়। এই কপটচারী সম্রাট জিতেন্দ্রিয়তার ভান করিতেন, কিন্তু অন্তঃপুর অসংখ্য সুন্দরীরাজিত মধুমক্ষিকা পরিপূর্ণ মধুচক্রের ন্যায় দিবারাত্র আনন্দধ্বনিতে ধ্বনিত হইত।'

ঐতিহাসিকের এই বিবরণ মানবরূপে ধরে রাখা হয়েছে। চঞ্চলকে বিয়ে করে শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত, মবারকের সপর্দংশনে মৃত্যুর আদেশ-দান,মবারক-জেবউন্নিসার বিবাহকে শেষ পর্যন্ত গোপনে স্বীকার করে নিয়েই জামাতার গুপ্তহত্যার ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি রাজসিংহের কৌশলে পর্বতরন্ধ্রে বন্দী হয়ে ক্রোধে অপমানে, পরাজয়ের গ্লানিতে, আসন্ন মৃত্যুর ভীতিতে সব আভিজাত্য ও সংযমের আবরণ ছিন্ন করে 'শাহন শাহ বাদশাহ, হীরকমণ্ডিত শ্বেত উষ্ণীয় মস্তক হইতে খুলিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জানু পাতিয়া, পর্বতের কাঁকর তুলিয়া আপনার মাথায় দিলেন।'– বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস-কথিত ঔরঙ্গজেবকে এইভাবে প্রাণবন্ত মূর্তিতে রূপান্তরিত করতে সমর্থ হয়েছেন।

কিন্তু ঔরঙ্গজেবের চরিত্রে একান্ত ব্যক্তিগত একটি সুপ্ত গভীর স্তর বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনার সাহায্যে আবিষ্কার করেছেন। মোগল সম্রাটের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার [illegible] ঘটেছে। সাম্রাজ্যের শক্তি-সম্পদ, চরম প্রাচুর্য ও গৌরবের মধ্যেই আসন্ন বিশ্বর্যয়ের অনিবার্য অঙ্গুলিসঙ্কেত। এই কুট-কৌশলী স্বার্থান্ধ, বিপুল সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা, ঐশ্বর্য ও রাজকীয় দম্ভের শীর্ষে যার আসন তার ব্যক্তিত্বের গাঢ় দীর্ঘশ্বাস শোনা গিয়েছে এই উপন্যাসে।

ঔরঙ্গজেবের হারেমে বিলাস, সম্পদ ও ভোগের সমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু হৃদয় নামক বস্তুটির ছিল একান্ত অভাব। উদিপুরী বেগমের বিলাস-ব্যসনে, উচ্ছৃঙ্খলতায় ও ভোগমত্ততায় যেমন প্রেম নেই, তেমনি যোধপুরীর হিন্দু-অভিমান ও বিলাস-বিহীন

ধর্মনিষ্ঠায়ও নেই স্বামীর প্রতি ভালোবাসার সামান্য চিহ্ন। নিজ হারেমের মতোই সম্রাটের হৃদয় শুষ্ক কঠোর কপট রাজনীতিচর্চা করেই দিন কাটিয়েছে, শক্তি ও ঐশ্বর্যের মদিরা তাকে নেশাগ্রস্ত করে রেখেছে। সম্রাটের এই চিত্তশূন্যতা যদি দীর্ঘস্থায়ী বিশ্লেষণের বা স্বগত চিন্তার মধ্য দিয়ে বঙ্কিম প্রকাশ করতেন, তাকে নায়করূপে উপস্থিত করতে হতো। ট্র্যাজেডির নায়করূপে–বড় মাপের ট্র্যাজেডির। বঙ্কিমচন্দ্র তাকে পরোক্ষ ব্যঞ্জনায় মাত্র ব্যক্ত করেছেন।

নির্মলকুমারী সঙ্গে তার সাক্ষাৎ এদিকে আলো ফেলে। নির্মলকে সম্রাট কিছু রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্যে সিদ্ধির জন্য অন্তঃপুরে আটক করে রাখে। কিন্তু ক্রমে সে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাপিয়ে ঔরঙ্গজেবের চিরঅবগুণ্ঠিত হৃদয় নিজেকে প্রকাশ করে ফেলেছে। উদয়পুরে রন্ধ্রযুদ্ধের মুখে ঔরঙ্গজেব নিজের মনের কথা স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করেছে, 'ঔরঙ্গজেব একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, 'যদি তুমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর–যদি সে স্বামী ত্যাগ কর–তবে উদিপুরী অপেক্ষা তোমাকে গৌরবে রাখিব।' নির্মল একটু হাসিয়া অথচ সসম্ভ্রমে বলিল, 'তাহা হইবে না, জাঁহাপনা!' ঔ। কেন হইবে না? কত রাজপুত কন্যা ত মোগলের ঘরে আসিয়াছে। নি। তাহারা কেহ স্বামী ত্যাগ করিয়া আসে নাই। ঔ। যদি তোমার স্বামী না থাকিত, তাহা হইলে আসিতে? নি। একথা কেন? ঔ। কেন, তাহা বলিতে আমার লজ্জা করে, আমি তেমন কথা কখনও কাহাকেও বলি নাই। আমি প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু কখন কাহাকেও ভালোবাসি নাই। এ জন্মে কেবল তোমাকেই ভালোবাসিয়াছি। তাই, তুমি যদি বল যে, তোমার স্বামী না থাকিলে তুমি আমার হইতে, তাহা হইলে এ স্নেহশূন্য হৃদয়–পোড়া পাহাড়ের মতো হৃদয় একটু স্নিগ্ধ হয়। দুনিয়ায় বাদশাহ হইলেও কেহ সুখী হয় না–কাহারও সাধ মিটে না। এ পৃথিবীতে আমি কেবল তোমায় ভালোবাসিয়াছি–কিন্তু তোমাকে পাইলাম না। তোমায় ভালোবাসিয়াছি, অতএব তোমায় আটকাইব না–ছাড়িয়া দিব।' নির্মলকুমারীর প্রতি তার এই অসম আকর্ষণের কারণ খুঁজবার চেষ্টাও ঔরঙ্গজেব করেছে, 'তুমি সুন্দরী বটে, কিন্তু সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইবার বয়স আমার নাই। আর তুমি সুন্দরী হইলেও উদিপুরী অপেক্ষা নও। বোধ করি আমি তোমার কাছে ভিন্ন আর কোথাও সত্য কখন পাই নাই, সেজন্য। বোধ করি তোমার বুদ্ধি, চতুরতা আর সাহস দেখিয়া তোমাকেই আমার উপযুক্ত মহিষী বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছে।'

এই সব কারণ একেবারে মূল্যহীন নাও হতে পারে, কিন্তু এদের পর্যাপ্ত বলে মেনে নেওয়া যায় না। আসলে ঔরঙ্গজেব নিজের মনের এই অভিনব ইচ্ছার ঠিকঠাক কারণ খুঁজে পায়নি। নিজ চরিত্রের এই রহস্য তাকে কিঞ্চিৎ বিমূঢ় করেছে। আর তারই মধ্য দিয়ে গোটা জীবন-সাধনায় ব্যর্থতার উপলব্ধি (এ শুধু রাজনৈতিক ব্যর্থতা নয়, মানুষ হিসেবে জীবনধারণের সামগ্রিক বিফলতা) তার চরিত্রে গভীর ট্র্যাজেডির আকস্মিক দীপ্তি এনেছে। কিন্তু এ সম্ভাবনা উপন্যাসের প্রতিনায়কে পূর্ণবিম্বিত হবার সুযোগ পেল না।

নির্মলকুমারীর চরিত্রের যে অংশ মাণিকলালের সংস্পর্শে প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে একটি নির্মল কৌতুকরস ছড়িয়ে আছে।

নির্মলকুমারীর যে পরিচয় চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে সখীত্বে ধরা দিয়েছে তাও মামুলি। ঔরঙ্গজেব প্রসঙ্গে তার একটি উক্তি পাঠককে চমকে দেয়। 'বদজাতকে বশ করিতেই আমার আনন্দ। তোমার মনে নাই, আমি বাঘ পুষিতাম? আমি একদিন না একদিন ঔরঙ্গজেবকে বিবাহ করিব ইচ্ছা আছে। আমি ঔরঙ্গজেব ভজিয়াছি, যেমন বেড়াল ইন্দুর ভজে। আমি যদি ঔরঙ্গজেবকে না পাই, তা নয় আমার বেড়াল খেলাটা এ জন্মের মতো রহিয়া গেল।'

এই সব মন্তব্যকে তার মনের বাহির-মহলের কৌতুকজড়িত কটূক্তি মাত্র মনে করা যেত। যে শক্তিমানের প্রতি কঠিন ক্রোধ, তাকে নিরাপদ দূরত্ব থেকে যদৃচ্ছ নিন্দা করার তৃপ্তি নির্মলের এই সব উক্তিতে–সেই কথা ভেবে প্রথম দিকে পাঠক নিশ্চিত থাকে। কিন্তু ঘটনাচক্রে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে নির্মলের ঘনিষ্ঠতা হলো আর তার ওই সব লঘু মন্তব্য তাৎপর্যবহ হয়ে উঠল।

ঔরঙ্গজেবের প্রতি নির্মলের প্রকৃত মনোভাব কিছু জটিল। কিন্তু এই মনোভাবই নির্মলকে গৌণ চরিত্রের সামান্যতায় সীমাবদ্ধ রাখেনি। এ কি প্রেম? কি ধরনের প্রেম? ঔরঙ্গজেবের শত্রু-শিবিরের মানুষ সে, তার ধ্বংসেই নির্মলের আনন্দ। সম্রাটের অন্তঃপুরে বসেও সে আনন্দ প্রকাশে তার বাধেনি। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের প্রতি সে যে আকর্ষণ অনুভব করেছে, তা বেড়লের ইঁদুর শিকারের আনন্দ নয়; তা একটা অনির্বাচ্য হৃদয়ানুভূতি–প্রেম ছাড়া আর কি–যা শত্রুমিত্রের ভেদ ভুলে যায়, যার প্রতি সচেতন চিত্তের চরম বিদ্বেষ তাকেও হৃদয়রস বর্ষণে কার্পণ্য করে না। সম্ভবত প্রবল শক্তিধর ও দেবকল্প ঐশ্বর্যের অধিকারী ঔরঙ্গজেবের হৃদয়ের দিক দিয়ে কি পরিমাণ দেউলিয়া সেই উপলব্ধিই (বেশ কিছুকাল হারেমে সম্রাটের ও মহিষীদের নিকটে বাস করার ফলে) হয়ত এই মনোভাবের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু একটি দুটি প্রাসঙ্গিক কথায় মাত্র এই অভিনব হৃদয়বৃত্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। 'নির্মল ঔরঙ্গজেবের জন্য কিছু দুঃখিত হইয়া বলিল....' 'দুঃখিত' শব্দটি তাৎপর্যবহ। সে আরও বলেছে, 'আমার ভাগ্যবশতঃই অবিবাহিত অবস্থায় আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। আমি যে দীন দরিদ্রকে স্বামীত্বে বরণ করিয়াছি, তাহাতেই আমি সুখী।'

মাণিকলালকে নিয়ে তার দাম্পত্যজীবন অসুখের নয়, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের প্রতি তার এই বিচিত্র আকুতি সুখের প্রত্যাশী নয়। সুখের নিশ্চিন্ততা মানবজীবনের একমাত্র কাম্য নাও হতে পারে–নির্মলের মতো নারীর পক্ষে বলা একান্ত অসম্ভব নয়– 'ক্ষুদ্র সুখে ভরে নাক ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা।'

মাণিকলালের সঙ্গে নির্মলের সম্বন্ধ কৌতুকের। তাদের প্রণয় তথা বিয়েও একরূপ কৌতুক বই কি। আসলে মাণিকলাল বুদ্ধিতে অতিমাত্রায় শান দিয়ে চাতুর্যের শীর্ষে তুলেছে, হৃদয়ের ক্ষেত্রে সে অভাবী। তাকে পারিবারিক জীবনের পটভূমিতে উপস্থিত করলে হৃদয়াবেগের পরিচয় পাওয়া যেত এরূপ যুক্তি দেখানো যেতে পারে। কিন্তু তাকে বহুবারই নবপরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গে দেখেছি। তারা পুরুষ-স্ত্রী উভয়েই এই উপন্যাসের বিশিষ্ট পাত্র-পাত্রী। তাদের হৃদয়াবেগ প্রকাশের অবকাশ কোথাও কিছুমাত্র ছিল না, একথা স্বীকার্য নয়। আসলে মাণিকলাল হৃদয়াবেগের দিক থেকে খর্ব।

মাণিকলালের দস্যু থেকে সেনাপতিতে রূপান্তরিত হবার স্তরগুলি খুব বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত কিনা এ বিষয়ে প্রশ্ন জাগতে পারে। তবে এখানে সমস্যা ততটা অন্তর্জগতের নয়। বিশেষত রোমান্সের পরিবেশের কথা মনে রেখে বড় ধরনের আপত্তি চলে না। মাণিকলালের চাতুর্য প্রধানত কর্মমুখী। তার বুদ্ধিচর্চাকে বলা উচিত পুরোপুরি প্র্যাকটিকাল। কোনো তাত্ত্বিক চেতনার দ্বারা তার বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ নয়। তার বুদ্ধি তাকে গতি দিয়েছে। চতুর মাণিকলাল কর্মতৎপরতায় বিদ্যুৎগতি। মাণিকলালের চাতুর্য তার বীরত্বকেও অনেকটা আবৃত করেছে। তার সাহসের অভাব না থাকলেও কৌশলকে প্রধান অস্ত্র রূপে গ্রহণ করেছে, তরবারিকে নয়।

মাণিকলালের চরিত্রাঙ্কনে সহজ উপকরণে বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থকতা ত্রুটিহীন।

দরিয়া চরিত্রে কিছু অতিনাটকীয় উপাদান আছে। এবং সর্বদা তা প্রাসঙ্গিকও নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে নর্তকীর ছদ্মবেশে সৈন্যদের সাহচর্য এবং সেনাপতিকে মুগ্ধ করে ঘোড়সওয়ারের স্থান লাভ করা পাঠকের যুক্তির কাছে কিছু অধিক দাবি করে। এরূপ দু-একটি সংশয়কে বাদ দিলে দরিয়া যে সুঅঙ্কিত সার্থক চরিত্র একথা মেনে নিতে হয়।

দরিয়া চরিত্রের মূলকথা মবারকের প্রতি গভীর ভালোবাসা। মবারকের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু বহ্নিবিভুক্ষু পতঙ্গের মতো মবারক জেবউন্নিসার রূপে মুগ্ধ। গৃহের শান্ত প্রেমের দ্যুতি তাকে ধরে রাখতে পারল না। দরিয়া পরিত্যক্ত হলো। কিন্তু সে চতুর বালিকা নাগরিক বুদ্ধির দীপ্তি আয়ত্ত করেছিল। মোগল হারেম ছিল তার নখদর্পণে। মবারককে হারিয়েও সে তার আশা ছাড়েনি। বাদশাহজাদীর কাছ থেকে তাকে ফিরিয়ে আনবার স্বপ্ন তার ছিল। জেবউন্নিসা কঠিন আঘাতে সে স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছিল। দরিয়া বাদশাহজাদীর প্রণয়ের পরিমাপ জানত। সেখানে কৃপা ও মৃত্যু হাত ধরে চলে। রূপনগরে মৈত্রী-সেনাদলের সঙ্গে মবারকযাত্রা করলে ছদ্মবেশে সেও সঙ্গ নিল। শেষ পর্যন্ত কৌশলে ঘোড়সওয়ারের রূপ ধরে সে মবারকের পাশে স্থান করে নিল। আমাদের বিশ্বাসকে আঘাত করলেও দরিয়ার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, দুঃসাহসিকতা এবং মবারকের প্রতি গভীর প্রেমে এই অতিনাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়েও আত্মপ্রকাশ করেছে; যুদ্ধক্ষেত্রে শাহজাদীর ক্রোধ অবশ্য মবারককে আঘাত করেনি। কিন্তু এ জাতীয় গুপ্তহত্যার পথ ধরেই মোগল রাজকুমারীরা প্রেমের খেলায় আপনাদের নিষ্কলঙ্ক আভিজাত্য বজায় রাখত, প্রেমখেলার সাক্ষীকে ধরাতল থেকে অপসারিত করত। দরিয়ার সতর্কতার ফল ফলল অন্যদিক থেকে। আকস্মিক বিপদ থেকে সে মবারককে উদ্ধার করল। অবহেলা পেয়েও মবারকের প্রেমকে সে বুদ্ধি ও কর্মতৎপরতায় এবং অনির্বাণ ভালোবাসার মূল্যে জয় করে নিল।

জেবউন্নিসার রোষে এই নবপ্রতিষ্ঠিত প্রেমনীড় যখন নষ্ট হলো দরিয়া পাগল হয়ে গেল। মবারকের অবহেলা পেয়েও সে আশায় বুক বেঁধে থেকেছে; মবারকের ভালোবাসার উত্তাপ কিছুকাল ভোগ করার পরে মৃত্যু এল। আশার কিছু রইল না।

দরিয়া এর পরে দীর্ঘকাল উপন্যাস-কাহিনীতে অনুপস্থিত। শেষে সে প্রিয়তম স্বামীর হত্যাকারীরূপে দেখা দিল। যে হত্যা মার্ডার অফ প্যাসান অথবা সে-ই মবারকের প্রেমিক-জীবনের নিয়তি, মৃত্যুরূপা নারী–যেখানে দরিয়া ও জেবউন্নিসা একাকার।

মবারক চরিত্রটিকে পরম যত্নে বঙ্কিমচন্দ্র নির্মাণ করেছেন। তার চরিত্রে সাহস ও বীরত্বের চমৎকার মিলন ঘটেছিল। বহু মোগল সৈন্যের মধ্যে রণনীতি ও কৌশলের দিক থেকে সে বিশিষ্ট স্থানের দাবি করতে পারে। চঞ্চল-হরণ সূত্রে রাজসিংহের ক্ষুদ্র বাহিনীর প্রতিরোধে বিপুল মোগল সেনাদলের মধ্যে সে আপন শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ রেখেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার রাজানুগত্য। এমন কি ঔরঙ্গজেবের আদেশে সর্পদংশনে মৃত্যু হবার পরেও মোগল বাহিনীতে ফিরে যাবার জন্য সে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। মোগলের বিরুদ্ধাচরণ করে জীবনধারণ তার পক্ষে অর্থহীন। কিন্তু জীবনদাতা মাণিকলালের অনুরোধে সে সম্রাটের বাহিনীকে মিথ্যে সংবাদ দিয়ে পর্বতরন্ধ্রে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এই কার্য অবশ্য সম্রাটের প্রতি তার বিশ্বাসঘাতকতা। ঔরঙ্গজেবের অন্যায় আদেশে তাকে সর্পদংশনে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। জীবনলাভ করে জীবনদাতার সহায়তার উদ্দেশ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজ প্রতিশোধবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য সে যদি তীব্র বাসনা অনুভব করে তবে চরিত্রের একটা সহজ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু মবারক চরিত্র কিছু জটিল। ঔরঙ্গজেবের প্রতি শ্রদ্ধা বা প্রীতির জন্য নয়, রাজানুগত্যকে সে নিজের কর্তব্য বলেই মনে করত। আবার অধর্মী ঔরঙ্গজেব-জেবাউন্নিসা তাদের কৃতকর্মের কিছু ফল ভোগ করুক এরূপ মনোভাব জন্ম নিয়েছিল। মাণিকলালের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং জেবউন্নিসার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ-বাসনা তাকে ঐ কাজে প্ররোচিত করেছিল। জেবউন্নিসার প্রতি ঘৃণা-ক্রোধ-আসক্তি সমভাবে তাকে বিচলিত করেছে। মবারকের মনে বিপরীতমুখী বৃত্তিগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার একটি সংহত ও ইঙ্গিতধর্মী চিত্র বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন উপন্যাসের এই অংশে। রাজসিংহ বলিলেন, '...তুমি যে পুরস্কার চাহিবে, আমি তাহাই তোমাকে দিব' মবারক কহিল, 'মহারাজ! বেআদবী মাফ হৌক। আমি মোগল হইয়া মোগলের রাজ্য ধ্বংসের উপায় করিয়া দিয়াছি। আমি মুসলমান হইয়া হিন্দু রাজ্য স্থাপনের কার্য্য করিয়াছি। আমি সত্যবাদী হইয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়াছি। আমি বাদশাহের নেমক খাইয়া নেমকহারামী করিয়াছি। আমি মৃত্যুযন্ত্রণার অধিক কষ্ট পাইতেছি, আমাকে তোপের মুখে রাখিয়া উড়াইয়া দিবার আদেশ করুন। আমার বাঁচিবার ইচ্ছা নাই।'

কৃতজ্ঞতা ও প্রতিহিংসা, ধর্মবোধ ও রাজানুগত্য মবারকের চরিত্রে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। জেবউন্নিসার প্রতি ঘৃণা ও আসক্তির দ্বন্দ্বে তার আর্তচিত্ত আত্মপ্রকাশ করেছে মাণিকলালের সঙ্গে কথোপকথনে।–'মানিকলাল মবারককে নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সাহেব। যদি আপনার মরিবার ইচ্ছা, তবে শাহজাদীকে ধরিতে আমাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন কেন?' মবারক বলিল, 'ভুল! সিংহজী ভুল, আমি আর শাহজাদী লইয়া কি করিব? মনে করিয়াছিলাম বটে যে, যে শয়তানী আমার ভালোবাসার বিনিময়ে আমাকে কালসাপের বিষদন্তে সমর্পণ করিয়া মারিয়াছিল, তাহাকে তাহার কর্মের প্রতিফল দিব। কিন্তু মানুষ যাহা আজ চাহে, কাল তাহা তাহার ইচ্ছা থাকে না। আমি এখন মরিব নিশ্চয় করিয়াছি–এখন আর শাহজাদী প্রতিফল পাইল না পাইল, তাহাতে আমার কি? আর একবার তাহাকে আমার দেখিতে ইচ্ছা আছে। একবার জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা আছে যে জগতে ধর্মাধর্মে তাহার কিছু বিশ্বাস আছে কিনা? একবার শুনিবার ইচ্ছা আছে যে, সে আমায় দেখিয়া কি বলে? একবার জানিবার ইচ্ছা আছে যে, আমাকে দেখিয়া সে কি করে?'

মবারক দরিয়াকে নিয়ে সহজ শান্ত প্রেমের নীড় রচনা করেছিল। কিন্তু জেবউন্নিসার সৌন্দর্যবহ্নির আকর্ষণে তার পতঙ্গহৃদয় দাম্পত্য শান্তিকে ভেঙ্গে ফেলেছিল। জেবউন্নিসার পাপাচরণের সঙ্গী হওয়ার যন্ত্রণা প্রতিমুহূর্তে তাকে বিদ্ধ করলেও সে নিজেকে মুক্ত করতে পারত না। তার পৌরুষ বিদ্রোহ করত, কিন্তু হৃদয়ের কাছে পৌরুষ বা ধর্মচেতনার প্রতিনিয়ত অনিবার্য পরাজয় ঘটত। ঔপন্যাসিক রূপনগর যুদ্ধ থেকে ফেরার পরে তাকে দরিয়াকে নিয়ে দাম্পত্য শান্তির নীড় রচনা করতে দেখালেন। এই পর্ব জেবউন্নিসার ক্রোধে দ্রুত সমাপ্ত হলো কঠিন মৃত্যুতে। না হলেও কি এর স্থিতি দীর্ঘ হতো? জেবউন্নিসা শুধু বাইরে থেকে সর্পাঘাতের ব্যবস্থা করে নি, সে বিষ সঞ্চারিত করে দিয়েছিল মবারকের সমগ্র ব্যক্তিত্বে। মৃত্যু না এলে মবারক নিজ হাতে দুদিনে সেই ঘর ভেঙ্গে দিত। ঔপন্যাসিক মৃত্যুর ব্যবধান রচনা করলেন মবারক-জেবউন্নিসার মধ্যে। এই ব্যবধান জেবউন্নিসার প্রেমহীন অমানবিক নিষ্ঠুরতা এবং তারই প্রতিক্রিয়াজাত মবারকের ক্রোধ ও ঘৃণায় পূর্ণ। কিন্তু এর মধ্যেও সেই তীব্র আসক্তি নিবৃত্ত হয়নি। জেবউন্নিসা যে মুহূর্তে মবারকের কাছে ক্ষমা চেয়েছে মবারক তাকে সতৃষ্ণ হৃদয়ে গ্রহণ করেছে। এই মিলনের অপর নাম মৃত্যু। মোগল সম্রাটের কন্যার বিরাগভাজন হলে সর্পদংশনে প্রাণ যায়, তাকে গ্রহণ করলে সম্রাটের নির্দেশে গুপ্তঘাতকের হাতে জীবন হারাতে হয়। মবারক তা জানে। জেবউন্নিসাকে ভালোবেসে সে মৃত্যুকে আহ্বান করেছে, একবার মৃত্যুর অভিজ্ঞতাও তার হৃদয়কে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

ঐতিহাসিক জেবউন্নিসা রচিত এবং সত্যেন্দ্রনাথ অনূদিত একটি কবিতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে–

যখন আমি ঘোমটা তুলি নয়ন পরে,
পাণ্ডুর হয় গোলাগুলি ঈর্ষা ভরে;
বিদ্ধ তাদের বক্ষ হতো ক্ষণে ক্ষণে,
ক্রন্দনেরি ছলে মধুর গন্ধ ক্ষরে!
কিম্বা যদি সুগন্ধি কেশ আচম্বিতে
এলায়ে দিই মন্দ বায়ে আনন্দেতে,
চামেলি ফুল নালিশ করে ক্ষুণ্ন মনে,
গন্ধটি তার লুকায় চুলের সুগন্ধিতে!
যখন আমি দাঁড়াই একা মোহন সাজে,
এখন শোভা হয় যে, তখন অমনি বাজে,
শতেক শ্যামা পাখীর কণ্ঠে কলস্বনে
বন্দনা গান, স্পন্দন তুলি কুঞ্জ মাঝে।

উপন্যাসের জেবউন্নিসাও এই কবিতা লিখতে পারত।

রবীন্দ্রনাথ জেবউন্নিসার চরিত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা উদ্ধারযোগ্য, কারণ তারপরে বলার বেশি কিছু থাকে না। 'বিলাসিনী জেবউন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাটদুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একেমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্মের মস্তকে আপন জরিজহরৎজড়িত পাদুকাখচিত সুন্দর বাম

চরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল তখন কোনো অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কূপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাহার মর্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখ মন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মতো তাহাকে দগ্ধ করিল–তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল, দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিল, তাহার পরে আর সুখ পাইল না, কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেবউন্নিসা সম্রাটপ্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্তজগৎবাসিনী রমণী।

জেবউন্নিসার চরিত্রে বুদ্ধির দীপ্তি, ভোগাসক্তি ও রাজনৈতিক কুট-কৌশলের সঙ্গে আভিজাত্য মিলেছে। এ সব কিছুর সঙ্গেই নারীজনোচিত বিশিষ্টতা যুক্ত। প্রেমকে সে ভোগের উপকরণরূপে গ্রহণ করেছিল, খেলার সামগ্রী বলেই মনে করেছিল। দুঃসাহসী নীতিহীনতা এবং আকাশস্পর্শী ক্ষমতালোভ একটা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব দিয়েছে তার চরিত্রকে। সর্পাঘাতে মবারকের মৃত্যুর ব্যবস্থা করায় আকস্মাৎ সেই ব্যক্তিকে অন্তরালে সুপ্ত দ্বিতীয় মানুষটির মনের আবরণ মোচন হল। এতকাল যে জীবনাদর্শকে সে পরম কাম্য বলে মনে করেছিল তাকে নিঃসংশয়ে বর্জন করল, আর যে প্রেমকে খেলনা বলে স্থির জেনেছিল তার দিকেই চিত্ত ছুটে চলল। মবারকের প্রথম মৃত্যুর পরে তার চোখে বঙ্কিম অশ্রু দেখেছেন, হৃদয় বিদীর্ণ করে উচ্ছ্বসিত রতিবিলাপ শুনেছেন মবারকের দ্বিতীয় মৃত্যুর পরে। মবারকের সর্পদষ্ট মৃত্যুর মুহূর্তেই জেবউন্নিসা চরিত্রের সর্বোত্তম কাল। তারপর দীর্ঘবিলম্বিত অশ্রুতে জেবউন্নিসার চরিত্রের ট্র্যাজিক উপসংহার। মাঝখানে উদয়পুরে মবারকের সঙ্গে তার গোপন মিলন কয়েকটি মুহূর্তের সুখস্বপ্ন; চিরকালীন বিচ্ছেদ-বেদনায় তলিয়ে যাবার পূর্বে ক্ষণিক আলোকসম্পাত।

রাজসিংহ ইতিহাস ও মানবহৃদয়ের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটেনি। মুখ্য চরিত্র দুটির অপুষ্টির ক্ষতি অন্য কিছু পাত্রপাত্রীর উচ্চাঙ্গের সাফল্যেও পূরণ হবার নয়। তবু বঙ্কিমের এই শেষ উপন্যাসে বাঘের থাবার পুরো ছাপটা মেলে, মাঝারি ক্ষমতায় এ জিনিস তৈরি হবার নয়।

নির্ঘণ্ট

অঙ্গুরীয় বিনিময় ৮০
অপূর্বোপাখ্যান ৩৯
অবদানশতক ৩৭
অভেদী ৭৮
আইভ্যান হো ১২৭
আত্মজীবনী ১০
আধ্যাত্মিকা ৭৯
আনন্দমঠ ২১৬
আরব্যরজনী ৩৬
আলালের ঘরের দুলাল ৬৬
'ইন্ডিয়ান ফীল্ড' ১০৩
ইন্দিরা ২৫৪

উপন্যাস–
–সংজ্ঞার বিতর্ক ১
–শ্রেণীপরিচয় ১১
–খাঁটি ঐতিহাসিক ১৪
–ঐতিহাসিক রোমান্স ১৪
–শুদ্ধ রোমান্স ১৪
–পারিবারিক ১৪
–সামাজিক ১৪
–ব্যক্তিসূত্রে ধৃত চিত্রাত্মক ১৫
–সমাজ-চিত্রণমূলক ১৫
–ত্রিভুজাকার ১৫
–বহু কাহিনীর মালা ১৫
–চিত্র-কাহিনীর মিশ্ররূপ ১৫
–কাব্যধর্মী ১৬
–নাট্যধর্মী ১৬
–কাব্য-নাট্য-মিশ্র ১৬
–মহাকাব্যিক ১৬
–খণ্ডোপন্যাস বা ক্ষুদ্রোপন্যাস ১৬
–ঘটনা প্রধান ১৬
–চরিত্র প্রধান ১৬
–মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী ১৬
–চেতনা-প্রবাহী ১৬
–আত্মজীবনীমূলক ১৬
নকশা ও কাহিনী ৫০
নববাবু বিলাস ৫১
–ভ্রমণোপন্যাস ১৭
–পত্রোপন্যাস ১৭
–ডায়েরিধর্মী ১৭
–নীতি-ধর্ম-তত্ত্ব প্রচারমূলক ১৮
–রাজনৈতিক ১৮
–জীবনীমূলক ১৮
–অ্যাডভেঞ্চারধর্মী ১৮
–গোয়েন্দা উপন্যাস ১৮
–প্রেমোপন্যাস ১৮
–ব্যঙ্গাত্মক ১৯
–ফ্যানটাসি ১৯
–ড্রামাটিক মনোলগধর্মী ১৯
–নিরপেক্ষ দৃষ্টি ১৯

কঙ্কাবতী ৩৫
কথাসরিৎসাগর ৩৭
কনটর (এইচ) ৮০
কপালকুণ্ডলা ১৩৫
কমেডি অফ এররস ৬৩
কাদম্বরী ৩৭
কৃষ্ণকান্তের উইল ২০২
ক্রিলভের গল্প ৩৯
গান ৯
গৃহদাহ ১৫
চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান ৯৬
চন্দ্রশেখর ১৮৪
চলচ্চিত্র ৯
চিঠি ৮
জাতক ও উপন্যাস ৩৭

ত্রৈলোকানাথ মুখোপাধ্যায় ৩৫
দশকুমারচরিত্র ৩৭
দীনবন্ধু মিত্র ৩৬
দুর্গেশনন্দিনী ১২৭
দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ ৮৭
দেবীচৌধুরাণী ২৩১
মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত ১৫
মার্ক্সীয় পদ্ধতি ২৩

শালদহপণ ৪৭
পারিয়া ৮৭
পঞ্চতন্ত্র ৩৮
পদ্মাবতী ৩৩
পিকউইক পেপার্স ৩৯
পিকারেস্ক নভেল ৩৯
পোড়া মহেশ্বর ৩৬
পৌলবজিনী ৩৯
প্রমথ চৌধুরী ৯
ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ৫৬
ফ্যানটাসি ৩৫
বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ৩৯
বত্রিশপুতুল ৩৮
বাসবদত্তা ৩৭
বাস্তবতা ১০
বার্টন (রিচার্ড) ৩৬
বামাতোষিণী ৩৬
বিচিত্রবীর্য ৯৪
বিবিধার্থ সংগ্রহ ৪৪
বিষবৃক্ষ ১৬৬-১৯৫
বিদ্যাসুন্দর ৩৫
ভারতচন্দ্র ৩৫
ভ্রমণ ৯
ভ্রান্তিবিলাস ৬৩
মঙ্গলকাব্য ও উপন্যাস ৩৩
মদখাওয়া বড় দায় ৭৩
মধুমল্লিকা বিলাস ৩৫
মধুসূদন ৪৭
মহাভারত ৩২
মৌখিক গল্প ও উপন্যাস ৩২-৩৫
মৃণালিনী ১৫২
মুচিরামগুড়ের জীবন চরিত ২১৪
যমালয়ে জীবন্ত মানুষ ৩৬
রজনী ১৯৬
রমেশচন্দ্র দত্ত ১৬
রহস্যসন্দর্ভ পত্রিকা ৪৪
রাজপুত জীবন সন্ধ্যা ১৬
রাজমোহন্‌স ওয়াইফ ১০৩
রাজসিংহ ২৫৯
রামায়ণ ৩২
রামারঞ্জিকা ৭৮
রাসেলাস ৪০
রূপকথা ও উপন্যাস ৩২
রোমান্স অফ হিস্টরী ৮০
লাস্ট ডেজ অফ পম্পে ১৯৭
লোকসাহিত্য ও উপন্যাস ৩৪
লোরচন্দ্রানী ৩৩
শকুন্তলা ৬২
শেকসপীয়র ৪০
সফল স্বপ্ন ৮০
সমাচার দর্পণ ৫০
সীতার বনবাস ৬৩
সীতারাম ২৪১
সুশীলার উপাখ্যান ৯৯
স্বর্ণলতা ১৪
হিতোপদেশে ৩৩